শ্রীপাঁচকড়ি দে।

মায়াবী

(ফুল সাহেব ।)

মায়াবী

উপন্যাস

শ্রীপাঁচকড়ি দে-প্রণীত

THE INDIAN PATRIOT PRESS.

CALCUTTA.

1901.

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দাস।

প্রিয় বন্ধুবরেষু।

বিজ্ঞাপন।

"মায়াবী" যে সময়ে বাহির হইবার কথা ছিল, তাহার অনেক পরে বাহির হইল। অনেকেই যে আমার উপর এজন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা যে আমি বুঝি নাই এমন নহে। এমন কি বৎসরেক সময়ের মধ্যে মায়াবীর জন্য প্রায় পাঁচ সহস্র গ্রাহকের আগ্রহপূর্ণ পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। এমন কি কেহ দুইবার তিনবার করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও মায়াবী প্রকাশের এই অযথা বিলম্বে তাঁহারা যে বিরক্ত হইয়াছেন, সেজন্য আমি দুঃখিত এবং তাঁহাদের নিকট অপরাধী রহিলাম।

আশা করি, আমার সহৃদয় অনুগ্রাহক পাঠক মহাশয়দিগের নিকট আমার অদ্যকার এই ক্ষুদ্র উপহার উপেক্ষিত হইবে না।

গ্রন্থকার।

উপক্রমণিকা

সর্পিণী—পদদলিতা

Mel. No, curse me
Thy curse would blast me less than thy forgivness
Pauline [laughing wildly], * * * * * *
O fool—O dupe—O wretch!—I see it all—
The by-word and the jeer of every tongue
In Lyons. Hast thou in thy heart one touch
Of human kindness?

Lytton—"*The Lady of Lyons*" **Act** *III*, *Scene II*.

অরিন্দম দুই হাতে ধরিয়া, সেই মৃতদেহ টানিয়া তুলিয়া সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। পার্শ্বের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া প্রভাতরবির রক্তাভ কিরণ সেই রক্তাক্ত মৃতদেহে পড়িয়া, সেই ভয়ানক দশা আরও ভয়ানক করিয়া তুলিল। উপক্রমণিকা ৩য় পরিচ্ছেদ।

মায়াবী।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নদীতটে।

মোহিনী ক্রমে আকুল হইয়া উঠিল। মোহিনী দিন রাত কাহার কথা ভাবে, মোহিনী নির্জ্জনে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে, মোহিনী কাঁদিবার সময় বুকে করাঘাত করে, এবং দুই হাতে চুল ছিঁড়িতে যায়। কখনও বা মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে হাসে, আবার হাসিতে হাসিতে কাঁদে, মোহিনী পাগল হইয়াছে, অথবা হইতে বসিয়াছে; মোহিনীর আর সে বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ নাই; মোহিনীতে মোহিনী আর নাই। মোহিনীর এত দুঃখ কিসের? বলিতেছি।

অন্ধকার রাত্রি—পোহাইতে আর বড় বিলম্ব নাই। অনেকক্ষণ পূর্ব্বে একবার বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তথাপি এখনও সমস্ত আকাশ মেঘ করিয়া রহিয়াছে, গগন ব্যাপিয়া মেঘ আরও নিবিড় হইতেছে; দেখিয়া বোধ হয় আর এক পশলা না ঢালিয়া এক পা নড়ি-

তেছে না। দুই একটি রবের জন্য এই নীরব রজনীকে একেবারে নীরব-নিস্তব্ধ বলিতে পারা যায় না; সম্মুখস্থ নদীটির কলকলনাদ—নিরন্তর; নদীতীরস্থ লক্ষ ঝিল্লীর সমবেত আর্ত্তনাদ (আর্ত্তনাদই বটে) ইহাও নিরন্তর; নীড়স্থ বিনিদ্র কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ—কদাচিৎ; পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয় হইতে কোন নিদ্রোত্থিত শিশুর করুণ ক্রন্দন—ক্বচিৎ; অতিদূরস্থ কুক্কুর-রব—ইহাও ক্বচিৎ। নদীবক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে যে মেঘের ছায়া ও অন্ধকার এক সঙ্গে নৃত্য করিতেছিল, তটে বসিয়া একব্যক্তি সেই দিকে অন্যমনে চাহিয়াছিল। তখন মেঘের সঙ্গে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া অন্ধকার নদীবক্ষ আরও মসীময় করিয়া তুলিতেছিল। বায়ু নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য এক একবার একটু একটু চেষ্টা করিতেছিল—চেষ্টা মাত্র।

নদীতটস্থ লোকটির পশ্চাতে, কিছু দূরে, মোহিনী শাণিত ছুরিকা হস্তে নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছিল এবং পিশাচীর চোখের মত তাহার চোখ দুটা উল্কাপিণ্ডবৎ সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে বড় ভয়ানক জ্বলিতেছিল।

যখন মোহিনী প্রায় তাহার নিকটস্থ হইয়াছে, তখন সেই লোকটি মুখ না ফিরাইয়াই মৃদু হাস্যে বলিল, "মোহিনী, আজ আবার জ্বালাইতে আসিয়াছ? আর নিকটে আসিয়ো না—আমাকে মারিবে কি? তাহা হইলে তুমি নিজেই মরিবে।"

হতাশ হইয়া নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় মোহিনী সেইখানে দাঁড়াইল। আর অগ্রসর না হইয়া বলিল, "আমি ত মরিয়াছি—এমন মরণ আর কি আছে? কিন্তু বিনোদ, আজও তুমি বড় বাঁচিয়া গেলে। একদিন এমন দিন আসিবে, সেই দিন দেখিবে এই ছুরিখানা তোমার বুকে আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে।"

বিনোদলাল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "পাঁচ বৎসরের ছেলেদের এমন ভয় দেখান অসঙ্গত নয়; আমাকে কেন, মোহিনি?"

সে কোথায় মোহিনী কোন উত্তর করিল না।

বিনোদলাল বলিল, "দেখ, মোহিনী, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, তুমি আমাকে হত্যা করিবে কি—কোন ক্রমে তুমি আমার গায়ে একটা আঁচোড়ও দিতে পারিবে না। কিন্তু আমি যদি একবার ইচ্ছা করি, তখনই তোমার জীবনের একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারি; সে ক্ষমতা আমার আছে কি না, তাহা যে তুমি না জান, এমন নহে। তোমাকে যদি আমার তেমনি একটা শত্রু বলিয়া বোধ হইত, তোমার দ্বারা আমার কোন একটা অনিষ্ট হতে পারে, তাহার এমন একটু সম্ভাবনাও থাকিত, তাহা হইলে বিনোদলাল এতদিন তোমার সকল অপরাধ উপেক্ষা করিয়া, তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিত না। তুমি জান, আমার সন্ধানে কত গোয়েন্দা ফিরিতেছে—জীবিত কি মৃত যেরূপ অবস্থায় হক্ তাহারা আমাকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে. আমি কি সে জন্য একটু ভয় করি—না একটু ভাবি? আর তুমি ত একটা স্ত্রীলোক—তোমাকে দেখিয়া—না তোমার হাতের ওই ছুরিখানা দেখিয়া আমি ভয়ে হতজ্ঞান হইব? সেই জন্য বলিতেছি; মনে করিয়ো না, আমি ভয় পাইয়া তোমাকে এ কথা বলিতেছি—তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই বলিতেছি। এখনও আমি তোমাকে আগেকার মত তেমনই সুখে রাখিতে প্রস্তুত আছি; সেইরূপ বড় বাড়িতে থাকিবে—দাস দাসী থাকিবে; আর যাহা চাহিবে, তাহাই তখনি পাইবে—কিছুরই অভাব তোমাকে অনুভব করিতে হইবে না। এরূপ পথে পথে ঘুরিয়া কত দিন কাটাইবে?"

মোহিনী এক একটী করিয়া বিনোদের সকল কথাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, আর ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক

ছিল—ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল; ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল, "পিশাচ, আবার প্রলোভন? মনে করিয়াছ, মোহিনী আবার তোমার প্রলোভনে ভুলিবে? এখনও কি তৃপ্ত হও নাই? এখনও কি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হয় নাই? কোন্ সুখের আশায় আবার আমি তোমার দয়া-ভিক্ষা করিব? যে ধর্ম্ম একবার হারাইলে আর তাহা ফিরাইয়া পাইবার নহে, তোমার কুহকে তাহাও গিয়াছে। মনে করিয়াছ, আবার তোমার মোহমন্ত্রে ভুলিয়া মুসলমানী হইব? কখনই না। তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছ? ধর্ম্মভ্রষ্টা রমণীর পরিণাম যে কি, তাহা আমি এখন দেখিতেছি, তুমিও দেখিতেছ, জগতের সকলেই দেখিতেছে। কিন্তু, তুমি যে একজন বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়াছ, ইহাতে কি তোমায় পাপের কোন ফল ভোগ করিতে হইবে না? আজ দশ বৎসরের কথা বলিতেছি, যখন আমার বয়স আঠারো বৎসর, যখন প্রবল পরাক্রমে যৌবন এ অসহায় হৃদয়ে কি এক আত্মবিস্মৃতির তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, যখন দিনান্তে একবার মনে করিতে পারিতাম না—যে আমি বালবিধবা; কবে বিবাহ হইয়াছিল, কাহার সহিত? কে তিনি? কেমন? এখন কোথায়? এ সকল স্মৃতি যখন সেই উদ্দাম যৌবনের আত্মবিস্মৃতিময় সেই তুমুল বিপ্লবের [illegible] হারাইয়া গিয়াছিল, মনে পড়ে কি তখন তুমি কোন্ নরকের [illegible] প্রলোভন লইয়া, আমার তৃষিত লালসাময় চোখের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে? সহজেই তুমি এ অসহায় হৃদয় করতলগত করিলে। ক্রমে আমায় নরকের দিকে টানিয়া আনিলে, নিতান্ত মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় আমি তোমার অনুসরণ করিলাম। তখন একবার জন্মদাতা পিতার মুখ চাহিলাম না—স্নেহময়ী জননীর মুখ চাহিলাম না—উপরে যে ধর্ম্ম রহিয়াছেন, সে কথাও একবার ভাবিলাম না—কুক্কুরীর ন্যায় তোমার

অনুসরণ করিলাম ; শেষে স্বামীদত্ত প্রায় সাত হাজার টাকার গহনা লইয়া তোমার সহিত কুলের বাহির হইলাম। তুমি একে একে দুই বৎসরের মধ্যে সে সকলই আত্মসাৎ করিয়া আমাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিলে। এমনই অর্থপিশাচ তুমি, কিছুদিন পরে অর্থলোভে মুসলমান হইলে, একটা মুসলমান-রমণীকে বিবাহ করিলে ; শেষে আমার যে দশা করিয়াছ, তাহারও সেই দশা করিলে। আমি পাপিনী—পাপের ফল ভোগ করিতেছি, সে মরিয়া বাঁচিয়াছে। তাহার পর তুমি আট বৎসরের জন্য কোথায় চলিয়া গেলে, আর সন্ধান পাইলাম না। যখন ফিরিয়া আসিলে, তখন দেখিলাম, আবার আর একটিকে অঙ্কশোভিনী করিয়া ফিরিয়াছ। তুমি যেমন, এখন ঠিক তেমনই মিলিয়াছে ; যেমন তুমি পিশাচ—তেমনি পিশাচী তোমার জুটিয়াছে ; এখন তুমি সুখী হইয়াছ ; কিন্তু বিনোদ, মনেও করিয়ো না আমার সুখ নষ্ট করিয়া তুমি সুখী হইবে—আর আমি দুঃখের ম্লানদৃষ্টিতে তোমার সুখশান্তির দিকে নিরীহ ভালমানুষটির মত শুধু দিন রাত চাহিয়া থাকিব। এই ছুরিতে ইহার একদিন ঠিক প্রতিশোধ হইবেই হইবে। আমাকে যতদূর সহজ মনে কর, ততদূর নয়—একদিন তোমার সে ভ্রম ভাল করিয়া ঘুচাইয়া দিব ; তখন দেখিবে, স্ত্রীলোক একবার ধর্ম্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠা হইলে, তাহারা সকলই করিতে পারে ; তাহাদের অসাধ্য এ জগতে তখন কিছুই থাকে না।”

ভ্রুকুটিকুটীলমুখে, সদর্প-পদবিক্ষেপে মোহিনী তখনই তথা হইতে চলিয়া গেল। হাতে সেই উন্মুক্ত দীর্ঘ ছুরিখানা যেন তেমনি দর্পের সহিত ঘন ঘন দুলিতে লাগিল।

বিনোদলাল নিতান্ত চিন্তিতের ন্যায় সেইখানে আপ্রভাত বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুম্ খুন।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন অরিন্দম বসু একজন প্রধান ডিটেক্টীভ বলিয়া হুগলী জেলার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তাহার আফলোদয় অনুসন্ধিৎসা ও উদ্যম, প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা এবং অসাধারণ আগ্রহ ও অধ্যবসায় তখনকার দস্যু, জালিয়াৎ, খুনে ইত্যাদির নিকট তাঁহাকে অরিন্দম বলিয়াই পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। আমাদিগের এই বক্ষ্যমান আখ্যায়িকায় তাঁহারই একটি ভীষণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব।

হুগলীজেলার অন্তর্গত কামদেবপুর গ্রামে অরিন্দম বসুর বাসাবাটী। একদিন অতি প্রত্যূষে স্থানীয় থানার অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অরিন্দম তাঁহার বাসাবাটীর বাহিরের একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ আসিতে তিনি তাঁহাকে হাত ধরিয়া, যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত বসিতে বলিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ না বসিয়া, দুই হাতে অরিন্দমের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "আপনি শীঘ্র আসুন—আসিয়াই যখন দেখা পাইয়াছি, তখন আর বিলম্ব করা হইবে না।"

অরিন্দম তাঁহার সেই উৎকণ্ঠিতভাব দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হইয়াছে? কোথায় যাইতে হইবে?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থানায়। আপনি আসুন, সেখানে গিয়া সকলই দেখিবেন—সকলই শুনিবেন, এখানে আমি কিছুই বলিব না।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া, থানার দিকে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন।

অরিন্দমের বাটী হইতে থানা বড় বেশি দূর নহে; অল্পক্ষণেই অরিন্দমকে লইয়া যোগেন্দ্রনাথ থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার একটি ঘর চাবিবন্ধ ছিল, যোগেন্দ্রনাথের নিকটেই চাবি ছিল, তিনি চাবি খুলিয়া, অরিন্দমকে সেই কক্ষমধ্যে লইয়া ভিতর হইতে কবাট বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই প্রকোষ্ঠের এক কোণে কাঠের একটী বড় সিন্দুক পড়িয়াছিল। সিন্দুকটী নূতন ঝক্ ঝকে; তথায় বসিবার উপযুক্ত আর কোন সামগ্রী না থাকায় অরিন্দম সেইটির উপর বসিতে যাইতেছিলেন; যোগেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেন; এবং অতি দ্রুতহস্তে সেই সিন্দুকটি খুলিয়া অরিন্দমকে দেখাইলেন। দেখিয়া অরিন্দম শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ অনেকক্ষণের জন্য সেই সিন্দুকের মধ্যে নির্নিমেষ হইয়া রহিল; রুদ্ধশ্বাসে নিঃসংজ্ঞবৎ অরিন্দম প্রস্তর গঠিতের ন্যায় নীরব নিঃস্পন্দ রহিলেন।

সেই সিন্দুকমধ্যে অন্যূন দ্বাদশবর্ষীয়া একটি বালিকার মৃতদেহ। সেই মৃতদেহ শতস্থানে অস্ত্রক্ষত রক্তসিক্ত এবং অনেক স্থানে হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে; বাম হস্ত একেবারে কাটিয়া লইয়াছে। কি ভয়ানক! কি ভয়ানক পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় এ বালিকাকে যে হত্যা করা হইয়াছে; ভাবিতে হৃদ্‌কম্প হইতে থাকে! সেই মৃতদেহের দিকে চাহিয়া কখনই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, কোন মনুষ্য হইতে ঐ কার্য্য সম্ভবপর। কে এমন নৃশংস নরপ্রেত এই ক্ষুদ্র বালিকার শিরীষকোমলদেহে শাণিত শত ছুরিকাঘাত করিতে কাতর হয় নাই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খুনী কে?

অরিন্দম দুই হাতে ধরিয়া, সেই মৃতদেহ টানিয়া তুলিয়া সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। পার্শ্বের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া প্রভাতরবির রক্তাভ কিরণ সেই রক্তাক্ত মৃতদেহে পড়িয়া সেই ভয়ানক দৃশ্য আরও ভয়ানক করিয়া তুলিল। অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "যোগেন্দ্র-বাবু, ব্যাপার কি!"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ব্যাপার কি—আমি কি বলিব? যাহা দেখিতেছেন তাহাই; এখন আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে এ ব্যাপার কি—সেই জন্যই আপনাকে আনিয়াছি।"

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, "সময়ে আমিই বুঝাইয়া দিব। এ খুন কে করিল?"

যোগেন্দ্র। আপনি জানেন, আপনি তাহা বলিবেন।

অরিন্দম। ভাল আমিই একদিন বলিব। এখন আপনি বলুন দেখি, এ লাস আপনি কোথায় পাইলেন?

যো। এইখানে—থানায়। কাল রাত দুইটার পর মুটেমজুরের মত একটা হিন্দুস্থানী লোক এই সিন্দুকটা মাথায় করিয়া আমাদের এই থানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। এত রাত্রে এতবড় একটা সিন্দুক লইয়া তাহাকে যাইতে দেখিয়া আমাদের রামদীন পাহারাওয়ালার সন্দেহ হয়—সে তখনই আমাকে খবর দেয়। আমি তখন রামদীনকে সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলাম। রামদীন লোকটাকে ধরিয়া আনিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কাছে

সেই সিন্দুকের চাবি আছে কি না ? তাহাতে সে বলিল, চাবি নাই। তখন চোর বলিয়া তাহার উপর আমারও সন্দেহ হইল ; সে লোকটীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথা হইতে সে আসিতেছে ? কোথা যাইবে ? কাহার সিন্দুক ? তাহাতে সে আপনার নাম করিয়া বলিল ; আপনার নিকটই সে এই সিন্দুক লইয়া যাইতেছিল।

অ। (সবিস্ময়ে) আমার নিকট !

যো। তার মুখে শুনিলাম, কলিকাতায় আপনার কে বন্ধু আছে তিনি আপনাকে এই সিন্দুকটি পাঠাইয়াছেন। লোকটির চেহারা দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া লোকটিকে ছাড়িয়া দিলাম না—আটক করিয়া রাখিলাম বটে, তবে আপনার লোক শুনিয়া আমি সে লোকটির উপর তেমন নজর রাখিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না। কেবল সিন্দুকটা এই ঘরে আটক করিয়া রাখিয়া দিলাম। তাহার পর দেখি রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সে লোকটী পলাইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া মনে করিলাম, সিন্দুকটি আপনার ওখানে পাঠাইয়া দিব ; সিন্দুকটি বাহির করিয়া দেখি, তলার কাঠখানার যোড়ের চারিদিকে রক্তের দাগ। তখন আমি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।

অ। যে লোক এই সিন্দুকটি বহিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে কেমন ? বয়স কত ?

যো। বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে। লোকটা হিন্দুস্থানী। আকৃতি যতদূর বিকট হইতে হয়। মুখখানা দেখিতে আরও বেশি বিকট ; তাহাকে দেখিলে মানুষ বলিয়া হঠাৎ বুঝায় না। নাকটা খুব মোটা, চোখ্ দুটা ছোট, ঠোঁট দুখানি এমন পুরু, যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে ; দেহ-খানা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ; রং এত কাল, তার মৃত্যুর পর গায়ের চামড়া খানা

পালিশ বেশ বার্ণিস করা এক যোড়া জুতা তৈয়ারি হইতে পারে। কপালে তিন চারিটি কাটা দাগ আছে।

অরিন্দম তখন সেই বালিকার মৃতদেহ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃত বালিকার শিথিল কবরীতে দুইটী রূপার তৈয়ারি মাথার কাঁটা ছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খুনীর বীরত্ব।

এমন সময় একজন পাহারাওয়ালা বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। যোগেন্দ্রনাথ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পাহারাওয়ালা একখানি পত্র লইয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিল। যোগেন্দ্রনাথ তখনই পত্র খানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্র পড়িবার সময়টুকুর মধ্যে, তাহার মুখের ভাব ক্ষণে ক্ষণে শত প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পাঠশেষে তিনি সেই পত্রখানি অরিন্দমের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন, অরিন্দম বাবু, কাণ্ড খানা দেখুন; সে যেই হোক সে বড় সহজ লোক নয়।"

"নতুবা কার এত সাহস, খুন করিয়া, থানায় লাস পাঠাইয়া রঙ্গ করে?" বলিয়া অরিন্দম পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ;—

"যোগেন্দ্র বাবু,

তুমি আমাকে জান, আমিও তোমাকে জানি। ইহাতেও যদি আমাকে ধরিবার জন্য তুমি কোন সুবিধাই না করিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলে পুলিসে চাকরী করা তোমার মতন একটী নিপুণ অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম নহে। সিন্দুকের মধ্যে তুমি যে একটী বালিকার

লায় দেখিতে পাইবে, সে আমারই হাতে ঐরূপ অবস্থায় মরিয়াছে, জানিবে। কে সেই বালিকা, কেন খুন হইল, কে আমি, আমিই বা কেন তাহাকে খুন করিলাম, ঐ সকলের একটিরও সন্ধান বোধহয় তুমি চিরজীবনেও করিয়া উঠিতে পারিবে না। আমি জানি, ইহার জন্য তুমি তোমার প্রিয়মিত্র অরিন্দমের সাহায্য লইবে, কিন্তু, স্থির জানিয়ো, সাতটা অরিন্দমেও কিছুই হইবে না। বর্ত্তমান বালিকাকে হিসাবে ধরিয়া আমার খুনের সংখ্যা আঠারো। কখন কোথায়, কি ভাবে থাকিয়া, আমি এই সব খুন নির্ব্বিঘ্নে করিতেছি, সে পরিচয় তোমাকে দিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

এই বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যে যাহাতে আমার খুনের সংখ্যা পুরো-পুরি কুড়িটি হয়, তাহা করিব; আগে অরিন্দমকে খুন করিব, তাহার পর তোমায় খুন করিব। তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়ো, আর তুমিও নিজে সাবধান হইয়ো। তোমাদের মত দুই একটিকে যদি না খুন করিতে পারিলাম, তাহা হইলে করিলাম কি?

ইচ্ছা ছিল যখন তুমি আমার এই পত্রখানি পড়িবে, তখন তোমার মুখের ভাব কেমন হয়—কি কর, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে মজাটা প্রত্যক্ষ করিব। কোন কারণ বশতঃ সে ইচ্ছা আমাকে ত্যাগ-করিতে হইল।

আর দুই একদিনের জন্য কেন এই বালিকার হত্যাকারীকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবে? দুই একদিন পরে একেবারে "অরিন্দম-হন্তার" সন্ধান করিতে বাহির হইতে হইবে।

তোমার পরিচিত

শত্রু।"

অরিন্দম পত্রখানি পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে ফিরাইয়া দিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অরিন্দম বাবু, আপনি আর কখন এমন ব্যাপার দেখিয়াছেন কি ?"

অরি। না, লোকটি বড় সহজ নয়; যাই হোক এখন যাহাতে তাহাকে সহজ করিয়া আনিতে পারি, তাহাই করিতে হইবে। পত্রখানি পড়িয়া দেখিলাম যে, লোকটি আপনাকে চেনে, আপনিও তাহাকে চেনেন; এই চেনাচিনির ভিতরও লোকটা এত কাণ্ড করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য।

যো। আমার পরিচিতের মধ্যে কে এমন লোক, আমি ত ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আবার দুই চারি দিনের মধ্যে আপনাকে খুন করিবে বলিতেছে; আপনার সঙ্গে এমন কাহার শত্রুতা ?

অ। কাহার শত্রুতা ? অনেকেরই; যিনি চোর তাঁহার, যিনি জালিয়াৎ তাঁহার, যিনি খুনে তাঁহার, এই তিন রকমের শত্রু লইয়া আমাকে সর্ব্বদা ঘর করিতে হয়। সে যাহাই হোক, এখন এ লোকের মতন-লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অরিন্দমের নৈপুণ্য।

অরিন্দম তখন সেই সিন্দুকের ভিতর হইতে একটি কাল বনাতের জামা, এবং একগাছি কাল রংএর ভাঙা ছড়ি বাহির করিলেন। রক্তে সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া সে কাল বনাতের জামাটি গাঢ় পাটখিলা রংএর মতন দেখাইতেছে। ছড়িটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এই ছড়ি আর জামা যাহার, সম্ভব সেই লোকই এই বালিকাকে খুন করিয়াছে; এই জামা পরিয়াই সে খুন করিয়া থাকিবে, জামাটি রক্তাক্ত হওয়ায় ও ছড়িটি কোনরকমে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অব্যবহার্য্য বোধে এই সিন্দুকের ভিতর চালান্ দিয়াছে। এই দুটিতে আমি সে লোকটার চেহারা কিরূপ মনে একটা অনুমান করিয়া লইতে পারিব। লোকটি লম্বা পাঁচ ফুট, ছয় ইঞ্চির বেশি হইবে না।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেমন করিয়া আপনি জানিলেন?"

অরিন্দম সেই কাল রংএর ভাঙা ছড়িটি দেখাইয়া বলিলেন, "যে খুন করিয়াছে, এই ছড়ীটি যদি তাহার হয় এবং ছড়ীটি যদি তাঁহার মানানসহি হয়, তাহা হইলে আমার অনুমান মিথ্যা নহে। মাপে ছড়ীটি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ঐ রূপ পাঁচফুট ছয় ইঞ্চি মাপের লোকেরই ব্যবহার্য্য। লোকটি আরও চারি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হইলে ছড়ীটি আরও দুই ইঞ্চি বড় হইত। লোকটি তেমন খুব বেঁটে নয়, খুব লম্বাও নয়, লোকটার বুক খুব প্রশস্ত, স্কন্ধ বিস্তৃত, কোমর তেমন মোটা নয়, বুকের মাপের অপেক্ষা কিছু কম, ইহাতে বুঝাইতেছে, লোকটি

সে রকমের মোটা নহে; মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ স্ফীত। গলাটা কিছু বেশি মোটা।"

যোগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিতে পারিলাম না, কিরূপে আপনি এমন অনুমান করিতেছেন।"

অরিন্দম বলিলেন, "এই জামার ছাঁট-কাট দেখিয়া আমি যাহা বলিলাম—আপনি জামাটি মাপিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। লোক-টির চুলগুলি অল্প কুঞ্চিত। জামার বোতামের সঙ্গে দুই চারি গাছি চুল জড়াইয়া আছে। বোধ হয়, সে লোকটা খুন করিয়া নিজের মুখে চোখে মাথায় যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা এই জামা দিয়া মুছিয়া থাকিবে; সেই সময়েই বোতামের সঙ্গে দুই চারি গাছি চুল জড়াইয়া উঠিয়া আসিয়াছে—সকল গুলিই এক মাপের—অল্প অল্প কোঁকড়া।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ওইগুলি যদি মাথার চুল না হইয়া দাড়ীর বা গোঁফের চুল হয়? মাথা মুছিবার সময় অবশ্যই সে নিজের মুখ খানাও একবার এই জামা দিয়া মুছিয়া থাকিবে।"

অরিন্দম বলিলেন, "না, তাহা হইলে জানিতে পারিতাম। দাড়ী কিম্বা গোঁফের চুল স্বভাবতঃ গোড়া হইতেই ধনুকের মত একদিকে কিছু বাঁকা হইয়া থাকে, কিন্তু মাথার চুল গোড়া হইতে আগে খানিকটা কিছুকম আধ ইঞ্চি সোজা হইয়া থাকে। যদি কোঁকড়া চুল হয় তাহার পর ডগার দিকে বাঁকা হইয়া থাকে। আর যদি কাফ্রি-দের চুলের মতন খুব কোঁকড়ান চুল হয়, সে সতন্ত্র কথা, তাহার আগাগোড়া প্রায় সমানই হয়। গোঁফ দাড়ী আর মাথার চুলে কত তফাৎ একটু চেষ্টা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আরও ইহাতে বুঝিতে পারিতেছি, লোকটার দাড়ী গোঁফ কিছুই নাই, তাহা হইলে গোঁফ দাড়ীর চুলও দুই একটি লাগিয়া থাকিত।

দেখিতাম। অবশ্যই সে ইহাতে হাত মুখ মাথা ভাল করিয়া জোর দিয়া মুছিয়া থাকিবে, কারণ রক্তের দাগ শীঘ্র উঠে না; বিশেষতঃ খুন করিবার সময় মানুষের হাত পায় এমন এক পৈশাচিক শক্তির সঞ্চার হয় যে, মনুষ্য তখন যে কাজ করে সকল কাজেই অনিচ্ছায়ও অযথা বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে, অবশ্যই সে সময়ের এই মার্জ্জনী-রূপে ব্যবহৃত জামায় গোঁফ দাড়ী হইতে দুই একটি চুল ইহাতে উঠিয়া থাকিত। এই সকলের মধ্যে আরও একটি অনুমান করা যায়, লোকটা গৌরবর্ণ।

যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু শেষে গৌরবর্ণের কথা শুনিয়া তিনি একটা উপহাস করিবার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, "কেন অরিন্দম বাবু, গায়ের রং কি একটু জামার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে নাকি ?"

অরিন্দম বলিলেন, "নজর থাকিলে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু নজর দিয়া তুমি, আমি, গাছপালা ঘরবাড়ী দেখিলে হয় না—চোখ্ বুজাইয়া আরও এমন অনেক জিনিষ দেখা যায়—যা খোলা চোখের কর্ম্ম নয়।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জামার সঙ্গে গায়ের রং না উঠিয়া আসিলে আমি ত এমন কোন উপায়ই দেখিতে পাই না, যাহাতে সেই লোকটাকে গৌরবর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারি।"

অরিন্দম বলিলেন, "কৃষ্ণবর্ণ লোকে কৃষ্ণবর্ণ বড় বেশি পছন্দ করে না, তাহা না হইলে জামা ছড়ি উভয়ই কাল রংএর হইত না। যদিও জামাটি কাল রংএর হইত; ছড়ীটি নিশ্চয়ই অন্য কোন রঙের হইত। লোকটার বয়স চল্লিসের কম নহে;—তাহার এদিকে লোকে এতবড় একটা দুঃসাহসিকতার কাজ এমন নিপুণরূপে সম্পন্ন করিতে পারে—আমার এমন বিশ্বাস হয় না।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহা হইলে আপনার অনুমানে লোকটার বয়স চল্লিস বৎসর, গৌরবর্ণ, মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ স্ফীত, কেশ অল্প কুঞ্চিত, শ্মশ্রু গুম্ফহীন, লম্বা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির বেশি নয়, গলাটা কিছু মোটা, কোমরটা কিছু সরু। যখন হত্যাকারী ধরা পড়িবে, তখন আপনার এই অনুমানগুলি কতদূর সত্য বুঝিতে পারা যাইবে।"

অরিন্দম বলিলেন, "তাহাই হইবে ; এখন চলিলাম।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আবার কখন দেখা করিবেন ?"

অরিন্দম বলিলেন, "যখনই দেখা করিবার কোন প্রয়োজন দেখিব। এই বালিকার একখানি ফোটোগ্রাফ তুলিয়া রাখিবেন।"

অরিন্দম তথা হইতে বাহির হইলেন।

প্রথম খণ্ড

সর্পিণী—সিংহ-বিবরে

When Ruth three seasons thus had lain
There came a respite to her pain;
She from her prison fled;
But on the vagrant none took thought
And where it liked her best she sought
Her shelter and her bread,

Wordsworth.
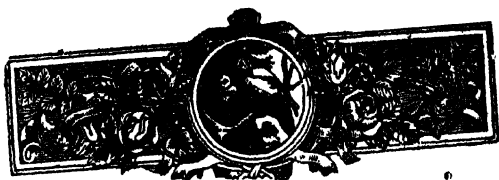
মায়াবী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রান্তরে।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। অবিশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টিতে সে রাত্রি আরও কি ভয়ানক! আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন; আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি মেঘ করিয়াছে; সে মেঘ নিবিড় ছিদ্রশূন্য অন্ধকারময়। ভূতল হইতে আকাশতল পর্য্যন্ত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। মুহুর্মুহূ বজ্র গর্জ্জিতেছে; সে গর্জ্জন এমন বিকট এবং ভীতিপ্রদ, শুনিয়া অতি সাহসীরও বুক কাঁপিয়া উঠে। এক এক বার বিদ্যুৎ হইতেছে বটে, কিন্তু সে আলোকের অপেক্ষা আঁধার অনেক ভাল। এই ঘোরতর দুর্য্যোগে ঝটিকাময়, শব্দময় এবং নানাবিভীষিকাময়, জনশূন্য, তারকাশূন্য ও দিক্‌দিগন্তশূন্য, সেই মহান্ধকারের মধ্য দিয়া একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া

বালিকা একটি বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল। যখন বিদ্যুৎ বাহির হইতেছিল, তখন বালিকা সভয়ে প্রান্তরের একবার এদিক, একবার সে দিক করিয়া চারিদিকেই চাহিয়া দেখিতেছিল; ভয় হইতেছিল, পাছে কেহ তাহাকে সেই আলোকে দেখিতে পায়। আলো নিভিয়া গেলে, অন্ধকার পাইয়া বালিকা যেন কতকটা নিঃশঙ্ক-চিত্তে তখন আবার কিছুদূর অগ্রসর হইতেছিল। এই বিদ্যুচ্চকিত, মেঘ-কৃষ্ণ, বর্ষা-প্লাবিত নিশীথে জনহীন প্রান্তরে কে ওই বালিকা?

জানি না, কতক্ষণ সেই বালিকা এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছিল; কিন্তু তখন সে একান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার নাসারন্ধ্র ও মুখ-বিবর দিয়া ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল, চেষ্টা করিয়া কিছুদূর কিছু দ্রুত চলিতেছিল. কিন্তু পরক্ষণেই সে গতির দ্রুততা আবার কমিয়া আসিতে-ছিল; আর পারে না। পা আর চলে না—যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। বালিকা সেই অতি বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিতে কতবার ভূতলাব-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল—কতবার পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল এবং ঝড়ে জলসিক্ত অঞ্চলও পায়ে পায়ে জড়াইয়া বালিকাকে কতবার ভূতলে নিক্ষেপ করিল। উপরে মেঘ ছুটিতেছে—মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে,—মেঘে মেঘে মিশিয়া মেঘ আরও নিবিড় হইয়া ছুটিতেছে; তাহার নীচে ঝড় ছুটিতেছে—ঝড়ে ঝড়ে মিশিয়া ঝড় আরও ভয়ানক বেগে ছুটিতেছে, তাহার নীচে সেই অসহায় বালিকা প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটিয়াছে।

প্রান্তরের প্রান্তে আসিয়া বালিকা একখানি ছোট গ্রাম দেখিতে পাইল; কিন্তু সে গ্রামও তখন মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে—জনপ্রাণীর অস্তি-ত্বের কোন চিহ্নই নাই। গ্রামের ধারে আসিয়া বালিকা হতাশ হইয়া-সেই মৃতবৎ গ্রামের চারিদিকে সকরুণনেত্রে চাহিতে লাগিল। ক্রীড়াশীল

বিদ্যুৎ সেই মৃতকল্প বালিকার হতাশদৃষ্টির সম্মুখে এক একবার সেই মৃতবৎ গ্রামের ছবিখানি ধরিয়া কি রঙ্গ করিতেছিল জানি না—কিন্তু তাহাতে বালিকার অবসন্ন ক্লিষ্ট হৃদয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে সত্বর গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল।

বালিকা অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়াছে, এবং অসহ্য শীতে তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, মুখশ্রী এখন পাণ্ডুর। সকল ইন্দ্রিয় এখন অবসন্ন। এবং আর্দ্র স্তূপীকৃত কৃষ্ণকেশদাম পৃষ্ঠে, বক্ষে, অংসে ও বাহুতে গুচ্ছে গুচ্ছে জড়াইয়া লুটিতেছে।

বালিকা গ্রামের মধ্যে আসিয়া দেখিল, কিছু দূরে একটি গৃহে তখনও আলো জ্বলিতেছে। সেই একমাত্র দীপালোক লক্ষ্য করিয়া বালিকা নূতন বলে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া দেখিল, সেটি একটি মুদীর দোকান, তথায় চারি পাঁচ জনে বসিয়া তাঁস পিটিতেছে, তামাক টানিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে, এবং অন্যমনে গুনগুন্ গীত গাহিতেছে। যাহার দোকান সে লোকটাও ঐ তাস-খেলার-দলের মধ্যে মিশিয়াছে; তাহার নাম বলাই মণ্ডল। আর তিন চারিজন সেই পাড়ার; এই দুর্যোগে মুদী খদ্দেরের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, আর তাহারা সেই তিন চার জন ঝড় বৃষ্টিতে ঘরে ফিরে যাওয়া দুঃসাধ্য বোধে অনন্যোপায় হইয়া তাস খেলায় ব্রতী হইয়াছে। খেলা এখনও চলিতেছে এবং বেশ জমিয়াও আসিয়াছে।

যখন খেলাটা বেশ জমিয়াছে, সেই বালিকা তথায় আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কেউ জান গা—এখানে গোস্বামী পাড়া কোথায়?"

প্রথমে কেহই উত্তর করিল না। যে তাস পিটিতেছিল তাহার তাস পেটা বন্ধ হইল; যে তামাক টানিতেছিল, তাহার হাতের হুঁকাটা

কাঁপিতে কাঁপিতে শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ; যে গল্প করিতেছিল সে তখন একটা ভূতের গল্পের অর্দ্ধেকটা বলিয়াছিল, তাহার গল্প বলা ঘুরিয়া গেল ; এবং যে অন্যমনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছিল, সমের মাথায় আসিবার পূর্ব্বে তাহার গান থামিয়া গেল ; এবং সকলেই অবাঙ্মুখে সেই বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল। তথাপি কেহ উত্তর করিল না। বিশেষতঃ যে ভূতের গল্প করিতেছিল, কিছুদিন আগে আমাবশ্যার রাত্রে কোথায় সে স্বচক্ষে প্রেতিনী দেখিয়াছিল, সেই অদ্ভুত কাহিনী অতি সাহসের সহিত বলিতেছিল, ভয়ে তাহার হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল ; এবং বুকের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে লাগিল। সুতরাং সে তখন মনে মনে বারম্বার অনতিপরিস্ফুটস্বরে আত্ম-সংরক্ষণের মন্ত্র-পাঠ করিতে লাগিল।

বালিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে গোস্বামীপাড়া কোথায় ?"

তাঁহাদিগের মধ্যে বলাইচন্দ্র বেশি সাহসের পরিচয় দিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল, "কে তুমি ? কোথা থেকে আস্‌ছো ?"

বালিকা সে কথায় কোন উত্তর না করিয়া বলিল, "আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, জান যদি গোস্বামি-পাড়া কোন দিকে—শীঘ্র আমাকে বলিয়া দাও। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।"

বলাইচাঁদের সাহস দেখিয়া হলধর নামে তথায় আর একজন ছিল, তাহারও সাহস শেষে সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিল। সে তখন একবার তাহার অতি সাহসের পরিচয় দিয়া প্রেতিনী-অনুমিত বালিকার সহিত কথা কহিল, "গোস্বামী পাড়ায় কার কাছে যাবে ?"

বালিকা একবার ইতঃস্তত করিল ; নাম বলিল না।

কুলধরেরও নাম জানিবার তেমন বিশেষ কোন আবশ্যকতা ছিল না, সে বালিকার সহিত কথা কহিয়া কেবল তাহার সঙ্গীদিগকে নিজের অতুল সাহস-বিক্রমের পরিচয় দিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল মাত্র। বালিকাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সে তখন তাহার অমানুষিক সাহসের পরিচয় দিল, "গোস্বামী পাড়া এখান থেকে অনেক দূর; এই দিকের দীঘীটির পাড় দিয়া বরাবর দক্ষিণে প্রায় তিন পো পথ গেলে, তার পর গোঁসাই পাড়া। এই ঝড় বৃষ্টিতে তুমি একা যেতে পারবে না। কোথায় পথ ভুলে বিঘোরে পড়ে প্রাণটা হারাবে।"

বালিকা আর কোন কথা না কহিয়া চকিতে তথা হইতে বাহিরে আসিল। সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া দক্ষিণ মুখে আবার নূতন বলে চলিতে আরম্ভ করিল।

এ বালিকা কে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ বালিকা কে?

দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমিষে বালিকা বাহিরের সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল দেখিয়া তথাকার সকলের কি সাহসী বলাই মণ্ডল, কি তাহার-অপেক্ষা-অধিক-সাহসী হলধর, সকলের মুখ শুখাইয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিল।

যে ইতিপূর্ব্বে ভূতের গল্প করিতেছিল, তাহার নাম হারাণচন্দ্র। বলিল, "এ আর কেউ নয় হে হলধর, এ সেই, যার কথা আমি এখন বলছিলেম, সেই বাঁশঝাড়ের তলায় যাকে দেখেছিলাম এ নিশ্চয়ই সেই। একবার জানান্‌টা দিয়া গেল। এখন দেখছি, এত রাত্রে, আর আজ আবার শনিবার, যে জল ঝড়, ও কথাটা তোলা ভালই হয় নাই। নৈলে, এত জল ঝড়ে মানুষের বাবার সাধ্যি কি যে বাহির হয়; আমি ঠিক চিনতে পেরেছি, সেই গলায় দড়ী দিয়ে মরা গোয়ালাদের ছোট বউ।

আর একজন বলিল, "দূর, সে কি এত সুন্দর দেখতে ছিল; এর মুখ চোখ দেখলে না—যেন তুলি দিয়ে আঁকা—যেন দুগ্‌গো প্রতিমে।

হারাণচন্দ্র তখন দুই একটি কঠিন প্রমাণ দিল, "আমি বেশ করে দেখেছি, সে যতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিল তার একটুও ছায়া

পড়্‌তে দেখিনি। ঘোষেদের গলায় দড়ী দিয়ে মরা সেই ছোটবউ না হয়ে যায় না, আমি আগে একদিন একে স্বচক্ষে দেখেছি ; আর সুন্দর অসুন্দরের কথা ছেড়ে দাও, এখন ওরা যেমনটি মনে কর্‌বে তেমনটি হ'তে পারে ; আজ ওকে কি বা দেখ্‌লে, আমি সে দিন যা দেখেছিলেম, যেন রূপ চৌচির হয়ে ফেটে পড়্‌ছে, অন্য কেউ হ'লে সেই ফাঁদে পা দিত—আর মর্‌তো, আমি বাবা শক্ত ছেলে।"

বলাই মণ্ডল আর এক পথে গেল, "ওসব কাজের কথা নয়, গোঁসাই পাড়ার কোন লোকের মেয়ে টেয়ে হবে ; শ্বশুরবাড়িতে বোধহয় জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তাই, আজ জল ঝড়ে সুবিধা পেয়ে বাপের বাড়ী পালিয়ে আস্‌ছে।

তামাক বন্ধ রাখিয়া, তাস পেটা বন্ধ রাখিয়া, গল্প বন্ধ রাখিয়া এবং গুন্ গুন্ গান বন্ধ রাখিয়া যখন অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের মধ্যে কেবল এই বিষয়েরই আলোচনা চলিতে লাগিল, তখন তথায় দ্রুতপদে আর এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই আগন্তুকের চেহারা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল। তেমন বিকট হইতেও বিকট এবং কদাকার হইতেও কদাকার আকৃতির লোক তাহারা জীবনে আর কখনও দেখে নাই বলিয়াই ভয় পাইল। তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘ দীর্ঘ হস্তপদাদি, দেহের সেই সুকৃষ্ণবর্ণ ও সেই বর্ণের অপরিসীম ঔজ্জল্যে যথেষ্ট চিক্কণ তেলকালীও অতিশয় লজ্জিত হয়। প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল, সেই প্রকাণ্ড মুখমণ্ডলে অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চক্ষু, প্রশস্ত নাসিকা, বিকট দন্তশ্রেণী।

তাহার উপর আবার তেমনি কর্কশকণ্ঠ, "ওহে, তোমরা এদিক দিয়ে একটা মেয়েকে যেতে দেখেছ ?"

কেহ কোন কথা কহে না।

তখন সেই বিকট আগন্তুকের সুবিকট কর্কশকণ্ঠ সপ্তমে উঠিয়া আরও কর্কশ শুনাইল, "কিহে তোমরা যে কেহই কথা কও না? বোবা নাকি? যদি সত্য কথা না বল, এই দেখেছ, আমার হাতে কি?"

এই বলিয়া একখানি দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া দেখাইল।

তখন সেই অতি সাহসী হলধর ভয়-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "হাঁ আধ ঘণ্টা হবে, একটা মেয়ে দক্ষিণদিকের বড় দীঘীর ধার দিয়ে গোঁসাই পাড়ার দিকে গেছে।"

আগন্তুক আর তথায় মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না। বালিকার অনুসরণে বাহির হইয়া গেল। অতি সাহসী হলধর তখন একটা সুদীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

হলধর বলিল, "ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

বলাই মণ্ডল বলিল, "কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এর ভিতর গূঢ় রহস্য আছে।"

হারাণচন্দ্র বলিল, "এ আর কিছু নয়—সবই ভূতের খেলা।"

বলাই মণ্ডল বলিল, "না না ভূত নয়। এ লোকটার কিছু মন্দ অভিসন্ধি আছে।

কিছুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ অতি দূর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ওগো কে আছ, শীঘ্র এস, খুন—খুন কর্‌লে, খুন—খুন—"

বলাই মণ্ডল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ঠিক হয়েছে, সেই লোকটাই বুঝি সেই মেয়েটাকে খুন কর্‌লে। চল, চুপ করে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না, এস সকলে মিলে যদি এখনও মেয়েটাকে বাঁচাতে পারি।"

তখন বলাই তিন চার গাছা মোটা মোটা লাঠি বাহির করিল। এক একজনের হাতে এক একটি দিল; সকলেই লইল—লইল না

কেবল বীরকুলর্ষভ হারাণচন্দ্র। সে বলিল, "তোমাদের কথায় ভুলিয়া আমি প্রাণ খোয়াইতে পারি না। যেতে হয়, তোমরা যাও; আমি ত প্রাণ থাক্‌তে যাচ্ছি না। ভূতে ঐ রকম অনেক মায়া জানে—ঐ রকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার দীঘীর ধারে নিয়ে যেতে পার্‌লে হয়—তখন কত ধানে কত চাল, তা বেশ ভাল করে দেখিয়ে দেবে। কি বল হলধর?"

হলধর 'হাঁ' কি 'না' কিছুই বলিল না।

হারাণচন্দ্রের বড় মুস্কিল বাঁধিয়া গেল, সকলেই যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে তখনকার মত তাহাকে সেইখানে একাকী থাকিতে হয়। আর তাঁহাদের সঙ্গে গেলে যে বিপদ সে অনুমান করিয়াছিল, তাহাও বড় সহজ নয়; সেই জন্য হারাণচন্দ্র হলধরকে নিজের দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তখনই সে চেষ্টা এমন ভাবে সফল হইল, কেহই তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল না। অন্যের অলক্ষ্যে চোখ টিপিয়া, দুই একবার হলধরের গা টিপিয়া এমন ভাবে হারাণচন্দ্র তাহার আপাদমস্তক পূর্ণ করিয়া এমনই একটা মহাভয় ঢুকাইয়া দিল, যে হলধর আর কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল না। তখন হলধর আর হারাণচন্দ্র ছাড়া অপর তিন জন একটা লণ্ঠান লইয়া লাঠী হস্তে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যদুনাথ গোস্বামী।

যখন বলাই মণ্ডল, অপর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া সেই অনাশ্রিতা বালিকার সন্ধানে বাহির হইল, তখন আকাশ অনেক পরিস্কার ; ঝড়ের বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত এবং বৃষ্টি অল্প অল্প পড়িতেছিল। হলধর যে দীঘির ধার দিয়া বালিকাকে গোস্বামী পাড়ার পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া সকলে দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাহারা সেই দীঘির ধারে আসিয়া পড়িল। তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না, দীঘির চারিধারে তাহারা সন্ধান করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী অনবসর পরিশ্রমের কোন ফলই ফলিল না দেখিয়া, কেহই নিশ্চেষ্ট হইল না, তথাপি অনুসন্ধান করিতে লাগিল ; হয় সেই বালিকাকে, নয় তাহার মৃতদেহ দুইটার একটা তাহারা যেমন করিয়াই হউক খুঁজিয়া বাহির করিবে।

এইরূপে আরও অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। তাহারা দেখিল দীর্ঘিকার অপর পার্শ্ব দিয়া কে একটি লোক সত্বর পদে চলিয়া যাই-তেছে। তখন সকলে মিলিয়া সেই দিকে ছুটিল। নিকটে গিয়া, লণ্ঠানের আলো ধরিয়া চিনিল, সে লোক তাহাদেরই পাড়ার যদুনাথ গোস্বামী। তখন সকলে তাঁহাকে এক একটি প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কিরে বলা, এতরাত্রে এখানে যে লাঠি হাতে করে ঘুরছিস্ ?"

বলাইচাঁদ তখন তাঁহাকে একে একে সকল কথাই বলিল। শুনিয়া গোস্বামী বলিলেন, "তবেই ঠিক হইয়াছে, আমিও আসিতে আসিতে পথে একখানা রক্তমাখা কাপড় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম।"

তখন বলাই বলিল, "চলুন, সে কাপড়খানা যেখানে পড়ে আছে, সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন; সে কাপড়খানা দেখিলেই, আমরা চিনিতে পারিব।"

যদুনাথ গোস্বামী প্রথমে দুই একবার অস্বীকার করিলেন; শেষে বলাইচাঁদের একান্ত পীড়াপীড়িতে যাইতে সম্মত হইলেন।

যদুনাথ গোস্বামী, বলাইচাঁদ ও বলাইচাঁদের সঙ্গী দুইজনকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কিছুদূর আসিয়া যদুনাথ গোস্বামী সকলকে লইয়া নিকটস্থ এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেশি দূর আর যাইতে হইল না, দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়া তাহারা লণ্ঠানের আলোকে সেই রক্তমাখা কাপড় দেখিতে পাইল। কেবল রক্তমাখা কাপড় নহে, সেখানে আরও একখানা প্রকাণ্ড ছুরি, দুই তিনটা রৌপ্যনির্ম্মিত মাথার কাঁটা পড়িয়া থাকিতে দেখিল।

বলাই মণ্ডল কাপড়খানা দেখিয়াই চিনিতে পারিল, সেই নিরাশ্রিতা বালিকার। যদুনাথ গোস্বামী ছাড়া আর সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে সকল রক্তমাখা কাপড় ছুরি ইত্যাদি যাহা একটা ভয়ানক খুনের সাক্ষ্যস্বরূপ পড়িয়াছিল, কেহই স্পর্শ করা দূরে থাকুক, অধিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহাদের ভয়ে হাত পা কাঁপিতে লাগিল। রক্তের সঙ্গে এমনই কি একটা বিভীষিকা সকল সময়ে মিশিয়া থাকে। তখন তাহাদের হাতের লাঠী এবং হাতের লণ্ঠান হাতে রহিল, কেবল

যে সাহসে ভর করিয়া এতদূর আসিতে পারিয়াছিল, সেই সাহসটি তাহাদের মনের ভিতর হইতে যাদুকরের হাত হইতে খেলার বর্ত্তুলটির মত অলক্ষ্যে কোথায় উড়িয়া গেল।

সকলে ফিরিয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্দিনী।

হুগলী জেলার জীবন পালের বাগানের নাম অনেকেই জানেন। অনেকেই জানেন, এক সময়ে সেই বাগানের নিকট দিয়া দস্যুভয়ে, এমন কি দিবালোকেও কেহ যাইতে সাহস করিত না। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সেইদিকটা এমন বনজঙ্গলাবৃত ছিল, যে দিবসেও সেখানে যখন তখন দস্যুরা তাহাদিগের হত্যাকাণ্ড নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিত।

জীবন পালের বাগানের উত্তরপ্রান্তে একটি জীর্ণদশাগ্রস্ত, পুরাতন, পতনোন্মুখ ভাঙ্গাবাড়ী ছিল। তাহার কোন কোন অংশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোন অংশ পড় পড়। ছাদের উপর বড় বড় বট অশ্বত্থ মৌরশীপাট্টা লইয়া পুত্র-পৌত্র-পরিবার-পরিবৃত হইয়া দখলীকার আছে। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, আবর্জ্জনাবহুল, মনুষ্যসমাগম-চিহ্নবিরহিত।

সেই নির্জ্জন ভাঙ্গাবাড়ীর অপেক্ষাকৃত পরিস্কার কোন একটি প্রকোষ্ঠে অনিন্দিত গৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়রূপিনী অনতীতবাল্যা একটি

বালিকা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। হিমনিষিক্তপদ্মবৎ তাহার মুখ অশ্রুপ্লাবনে একান্ত মলিন; তাহার লাবণ্যোজ্জ্বল দেহ কালিমাবৃত এবং কঙ্কালাবশেষ। কেশরাশি রুক্ষ জড়িত এবং বিশৃঙ্খল। বালিকা নতমুখে একটি নিশ্বাস অতিকষ্টে একবারে দুইবারে তিনবারে টানিতেছিল। বালিকার সেই পরম সুন্দর মুখখানি এক্ষণে কাঁদিয়া ম্লান হইলেও তাহার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, এবং সেই আয়ত চক্ষুর মধুরোজ্জ্বল লীলাচঞ্চল দৃষ্টি সেই ম্লানমুখখানিতে এক অননুভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া রাখিয়াছিল। যে কক্ষে সেই বালিকা বসিয়াছিল, তাহা বাহির হইতে অবরুদ্ধ। বালিকা বন্দিনী।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়ের বেগ কিছু শমিত হইলে বালিকা পশ্চিমদিকের একটা জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই জানালা-পথে প্রবেশ করিয়া বায়ু-প্রবাহ বালিকার রাশীকৃত রুক্ষ কেশ-ভার উড়াইয়া উড়াইয়া একবার তাহার সেই মুখখানির উপর ফেলিতে লাগিল, আবার উঠাইয়া, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আবার সেই বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মলিন বিবর্ণীকৃত মুখখানি ঢাকিতে লাগিল। এমন যে সুন্দর মুখ! এমন ম্লান? না দেখিয়া ঢাকিয়া রাখাই ভাল, ইহাই বুঝি, কি এইরকম কোন একটা বায়ুর উদ্দেশ্য; বায়ুর যে উদ্দেশ্যই হউক, বালিকা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিল।

বালিকা একদৃষ্টে দেখিতেছিল, দৃষ্টি-সীমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্তাভ নীলিমাময় বেলাপ্রান্তে কেমন ধীরে ধীরে আরক্তরবি ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতেছিল; এবং আরও কিছু দূরে কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে নিবিড় মেঘমালা গোধূলির হেমকিরণপরিব্যাপ্ত আকাশের সেই মধুর কোমলচ্ছবি ব্যাপিয়া, পুঞ্জীকৃত হইয়া, স্তূপীকৃত হইয়া অল্পে অল্পে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বালিকার দৃষ্টি সেই সকলের উপর

নিস্পন্দ। অদূরস্থিত সদ্যোপ্রস্ফুট প্রচুর ভিন্ন জাতীয় বন্যকুসুমের স্নিগ্ধ-পরিমল একত্রে মিশিয়া, সেই সংমিশ্রণে আরও মধুর হইয়া এক অপার্থিব সামগ্রীবৎ নিদাঘসায়াহ্নসমীরণ বহিয়া যেখানে সেই রোরুদ্যমানা, ধূলিধূসরিতা, বিগলিতাশ্রুনয়না, বিপদবিহ্বলা বালিকা প্রস্তরগঠিতের প্রায় একখানি মূর্ত্তিমান দুঃখের জীর্ণ ছবিটির মত, নীরবে ঈষদোত্তোলিত মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে, সেই অলোকসম্ভবারূপিনী কিশোরীর চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। দূর বনান্তর হইতে কোন কোন মধুরকণ্ঠ পাখীর মধুরতর কলকণ্ঠগীতি সেই বালিকার নিকটবর্ত্তী সকল স্থানই মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। বালিকার সে দিকে লক্ষ্য নাই। বালিকা সেইখানে সেইরূপ নিশ্চলভাবে পাষাণ-প্রতিমার মত অনেক-ক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে অবসন্ন বনতলে ধূসরবসনা সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে যখন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, এবং যখন সেই সন্ধ্যার অল্প অল্প অন্ধকারে আর পশ্চিম গগনের নিবিড়, জমাট মেঘের কাল ছায়ায় সায়াহ্নলীন অস্ফুট ম্রিয়মান দিবালোক আরও মলিন হইয়া আসিতে লাগিল; তখন বালিকার উদাস দৃষ্টি চঞ্চল হইয়া প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন পার-স্পর্য্যে সবিস্ময়ে ফিরিতে লাগিল; সহসা সেই আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে কি দেখিয়া বালিকা শিহরিয়া উঠিল, এবং মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় চকিতে তথা হইতে সরিয়া বৃহকোণে গিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালিকা কাঁপিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মাহতা।

অনতিবিলম্বে রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া এক ব্যক্তি সেই প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকার শয়নের নিমিত্ত এক কোণে একটি কদর্য্য শয্যা ছিল, লোকটা তাহার উপর বসিল। বালিকা সেই শয্যার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া বালিকা অপর পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সেই আগন্তুকের বয়স চল্লিশ বৎসরের কম নহে; কিন্তু, তাহাকে দেখিয়া, পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। তাহার দেহ বলিষ্ঠ, হস্তপদাদি মাংসপেশিতে স্ফীত, বক্ষঃ উন্নত, প্রশস্ত, এবং অটুট স্বাস্থ্যের ও অতুল শক্তির পরিচায়ক। মুখাকৃতি মন্দ নহে; তবে এক সময়ে যৌবনের প্রারম্ভে ঐ মুখাকৃতি যে দেখিতে সুন্দর ছিল, সে অনুমানটা এখনও সহজেই করা যায়। দেহের বর্ণ গৌর।

বালিকাকে সম্বোধন করিয়া আগন্তুক বলিল, "রেবতী, কতদিন আর এমন যন্ত্রণা ভোগ করিবে? আমার কথায় আর অমত করিয়ো না। তোমার জন্য আমি এতদূর লালায়িত দেখিয়াও কি তোমার মনে একটু মাত্র দয়া হয় না?"

রেবতী কোন কথা কহিল না।

আগন্তুক আবার বলিল, "রেবতী, কথা কও, এতদূর আসিয়া তোমার একটি মিষ্টকথা শুনিব, এমন অদৃষ্টও কি আমার নয়?"

রেবতী মৃদুনিক্ষিপ্ত স্বরে বলিল, "আমি এখনও বলিতেছি, এ জীবন থাকিতে আমি কখনই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না। তোমাকে বিবাহ করিয়া, শত-দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করা অপেক্ষা এই বননিবাসে চিরবন্দিনী হইয়া থাকাও এখন আমার পক্ষে অতুল সুখ।"

আগন্তুক কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, কি ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে এই অতুল সুখেই চিরজীবনটা এইখানে কাটাও। কিন্তু নিশ্চয় জানিয়ো, আমার কথা না শুনিলে, কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। তুমিও যত কঠিন হইবে, আমিও কঠিন হৃদয়ে তোমার উপর সেইরূপ কঠিন কঠিন ব্যবস্থাও ক্রমে চালাইতে থাকিব। চিরদিন আমি তোমার নিকট এমনই বিনীত এমনিই অনুগ্রহপ্রার্থী থাকিব না; যে কোন প্রকারে হউক আমি আমার কার্য্যোদ্ধার করিবই। এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী হইয়া যে সুখভোগ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমার উপপত্নী হইয়া সেচ্ছায় সে সুখের জন্য লালায়িত থাকিবে। এখন বুঝিতেছি, যতদিন তুমি সেই দেবা ছোঁড়াটাকে না ভুলিতে পারিবে, ততদিন আমার কথায় কিছুতেই সম্মত হইবে না—ভাল, শীঘ্রই তাহার ছিন্নমুণ্ড এইখানেই বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিবে।"

এই বলিয়া আগন্তুক এমন ভ্রুকুটিকুটিলমুখে সেই সরলা বালিকার দিকে চাহিল যে, বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, ভয়ে বলিতে পারিল না—ভয়ে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার শিরায় শিরায় উচ্ছ্বসিত রক্তস্রোত বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া হৃদ্‌পিণ্ডপূর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার নিস্প্রভতার চক্ষুদিয়া দরবিগলিত-ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

ভীতিবিহ্বলা রেবতী আগন্তুকের সম্মুখে আসিয়া, ক্ষিতিতলন্যস্ত-জানু হইয়া, বাত্যাবিচ্ছিন্নবাসন্তীবল্লরীবৎ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বুকফাটাকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "কেশববাবু, আমি পিতৃমাতৃহীনা, দুর্ভাগিনী; আমার মুখ চাহিয়া, আমার এই যন্ত্রণা দেখিয়া কি তোমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না? দয়া হয় না? আমার কাকার সঙ্গে তোমার কত হৃদ্যতা—কাকা তোমায় কত যত্ন করেন, আমি ত তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী; তবে কেন আমাকে এখানে রাখিয়া এমন অসহ্য পীড়ন করিতেছ? তুমি আজ প্রায় এক বৎসর ধরিয়া আমাদের বাড়ীতে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে প্রত্যহ যাইতে; আমাকে—আমার ছোট বোনকে তুমি কতইনা স্নেহ করিতে; কতইনা ভাল বাসিতে; কিন্তু সে ভালবাসার ত এমন কোন অন্যভাব ছিল না। কাকাবাবু আমাদিগকে যেমন ভাল বাসিতেন, তুমিও আমাদের সেইরূপ ভালবাসিতে; তখন ত তোমার চক্ষে একদিনের জন্য এ কলুষিত স্পৃহার কোন চিহ্নও ফুটিতে দেখি নাই। আমি তোমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম; সে ভক্তির বিনিময়ে আমি যে স্নেহ তোমার কাছে আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি, তাহা না দিয়া, তুমি তাহার কাছে এ কি জঘন্য প্রস্তাব করিতেছ? কেশববাবু, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও; আমি প্রাণান্তে এ সকল কথার একটি বর্ণও প্রকাশ করিব না। না জানি আমার জন্য সেখানে এখন কি হাহাকারই পড়িয়া গেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

রেবতীর সেই ব্যাথাব্যঞ্জক কাতরোক্তিতে পাপান্তঃকরণ, নারকী কেশবচন্দ্র কর্ণপাত করিল না। এবং নিজের অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমে বালিকার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি মুছাইয়া দিল, তাহার পর টানিয়া আপনার বুকের উপর তুলিতে চেষ্টা করিল।

স্ফীতজটা সিংহিনীর মত রেবতী তখন আপনবলে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার শিশিরসিক্ত কমলতুল্য ও ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল, রোষরক্তরাগ-রঞ্জিত হইতে আর এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। দলিতফণাফণীর ন্যায় বালিকা ফুলিতে ফুলিতে রোষতীব্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "পিশাচ, ধিক্ তোকে, তোর মুখ দেখিতেও পাপ আছে; এখনি এখান থেকে দূর হ—তোর যা ইচ্ছা হয় করিস্—যে যন্ত্রণা দিতে চাস্ দিস্, আমি তোকে আর ভয় করি না। তোর মত নারকীর নিকট দয়া ভিক্ষা করা অপেক্ষা সহস্রবিধ যন্ত্রণাপ্রদ মরণও ভাল।"

বর্দ্ধিতরোষা রেবতীর দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর দিয়া ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, এবং সেই দ্রুতশ্বাসে বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্ফীত ও কম্পিত হইতে লাগিল।

বালিকার সেইরূপ ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র কিছু বিস্মিত, কিছু স্তম্ভিত, কিছু বা ভীত হইল। তথাপি পাপী অস্খলিত সঙ্কল্পে সেই মুহ্যমানা বালিকার দিকে পুনরগ্রসর হইল। ব্যাঘ্রতাড়িত হরিণশিশুর

ন্যায় বালিকা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কেশবচন্দ্রও বালিকাকে ধরিবার জন্য বাহিরে আসিতে গেল। বাহিরে কবাটের পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল.; কেশবচন্দ্র যেমন বাহিরে আসিবে, সেই স্ত্রীলোকটি তাহাকে সজোরে এমন এক ধাক্কা দিল, তাহাতে কেশবচন্দ্র পড়িয়া না গেলেও দশ পদ পশ্চাতে হটিয়া গেল। সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ সেইখানেই তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে স্ত্রীলোকটি দুই হাতে তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া, বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল। তাহার পর রেবতীর হাত ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইল, রেবতী বিস্ময়-স্থিরনেত্রে সেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাঘ ও সাপিনী।

"মোহিনী, মোহিনী, কেন মরিবি, দে, কবাট খুলিয়া দে, কেন মরিবি।" বলিয়া ভিতর হইতে কেশবচন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রবৎ বিকট গর্জ্জন করিতে লাগিল। এবং বারম্বার কবাটের উপর সবলে পদাঘাত করিতে লাগিল। শালকাঠের কবাট সেই শতপদপ্রহারে কিছুমাত্র খিন্ন না হইয়া, বোধ হয় সেই নিরাশ্রিতা বালিকার মুখ চাহিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির রহিল।

পাঠক, বুঝিয়াছেন কি, যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিলাম, সে আমাদের সেই মোহিনী, সেই মরিয়া, দুঃখিনী, নৈরাশ্যপীড়িতা, অঙ্গুলাবমৃষ্টা-সর্পিণী, উন্মাদিনী।

ভিতর হইতে কেশবচন্দ্র সেই রুদ্ধদ্বারে দেহের সকল শক্তি একত্র

করিয়া পদাঘাতের উপর পদাঘাত করিতে লাগিল, আর বজ্রনিঃস্বণে বলিতে লাগিল, "মোহিনী, পিশাচী, এখনও কবাট খুলিয়া দে, কেন মরিবি।"

মোহিনী গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বিদ্রূপের মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল, "আমার মরণের জন্য ইহার পর চিন্তিত হইয়ো—তখন অনেক সময় পাইবে; এখন নিজের মরণের ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ কর। এ যে-সে মরণ নয়, এইখানে—অনাহারে—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মরণ—তোমার উপযুক্ত মরণ—তিল তিল করিয়া অনেকদিন ব্যাপী যন্ত্রণাময় সুদীর্ঘ মরণ। তোমার মরণ-প্রতীক্ষা করিয়া আমি এখনও মরি নাই। আগে যেমন দিন রাত তোমার আরাধনা করিয়া মরিতাম—এখন তেমনি দিনরাত তোমার মরণের আরাধনা করিয়া ঘুরিতেছিলাম। এখন তোমাকে সেই মরণের মুখে তুলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম।"

যে তালাচাবি কেশবচন্দ্র ব্যবহার করিত, তাহা শিকলের আংটায় লাগানো ছিল, মোহিনী সেই শিকলে সশব্দে তালাবদ্ধ করিয়া চাবিটি দূরবনমধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।"

কেশবচন্দ্র পুনরপি বলিল, "মোহিনী, এখনও কবাট খুলে দে, কেন মরিবি?"

হাসিয়া মোহিনী উত্তর করিল, "ভয় দেখাইতেছ? আমার আর মরণের ভয় নাই।"

কে। ইহাতে আমার কি ভয়ানক ক্ষতি হইবে, তুমি জান না।

মো। তোমার ক্ষতিতে আমার কতদূর লাভ হইবে—তুমি জান না।

কে। ইহার জন্য কখনই আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।

মো। ক্ষমা করিবার জন্য কেহ তোমার মাথার দিব্য দিবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মোহিনী ও রেবতী।

মোহিনী রেবতীকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুদূর আসিয়া উভয়ে এক নিবিড় ছায়াছন্ন বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইল। সেখানে রেবতীর মুখ হইতে তাহার দুরবস্থার সকল কথা মোহিনী শুনিল। শুনিয়া মোহিনী বলিল, "এখন কি করিবে? কি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? বেনীমাধবপুর এখান হইতে বিশ ক্রোশ, এতদূর পথ তুমি একাকী এখন যাইতে পারিবে না; তাহাতে বিপদও আছে, আর ধরা পড়িতে পার। এ হুগলী জেলায় তোমার কেহ আত্মীয় নাই, যেখানে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য লুকাইয়া থাকিতে পার?"

রেবতী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কে আছে? কই তেমন আত্মীয় কেহ নাই, তবে চন্দন নগরে গোঁসাই পাড়ায় আমাদের এক গুরু আছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিলে, তিনি আশ্রয় দিতে পারেন।

মোহিনী। চন্দননগর এখান হইতে তিন ক্রোশেরও বেশি। আকাশ যেরূপ ঘোর করিয়া রহিয়াছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে, পথে তোমার কষ্ট হইবে। যদি যাইতে সাহস কর, আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতে পারি। সে পথে গেলে তোমার কোন বিপদ হইবে না।

রেবতী। তুমি এখানে থাক কোথা? নয় তোমার এখানে এরাত্রি-টার মত থাকিতাম।

মোহি। আমার নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নাই, যখন যেখানে যাই, সেই খানে একটু থাকিবার সুবিধা করিয়া লই ; এইরূপে বনে বনে দিনরাত ঘুরিয়া বেড়াই।

রেব। তোমার কি কেউ নাই ?

মো। আছে—স্বামী।

রে। তিনি তোমার খোঁজ রাখেন না ?

মো। তাঁহার অনুগ্রহ।

রে। তিনি কোথায় থাকেন ?

মো। সেই যে তিনি—যিনি তোমাকে আমার সতীন করিবার জন্য তোমায় খুব সাধ্য-সাধনা কর্‌ছিলেন।

রে। (বিস্মিত হইয়া) তিনি ? এমন স্বামী !

মো। (ছুরি দেখাইয়া) এমন স্বামী বলিয়াই ত এই ছুরিখানা লইয়া ঘুরিতেছি। এ জন্মে ত তাঁহাকে পাইলাম না—পাইলাম না—অথচ কলঙ্ক কিনিলাম। ইহলোকে পাইলাম না বলিয়া পরলোকে তাঁহার আশা ত্যাগ করি কেন ? একদিন—যে দিন পরলোক যাত্রার সময় আসিবে, তখন এই ছুরি তাঁহার হৃদয় শোণিতে আর আমার হৃদয় শোণিতে একটা অবিচ্ছেদ্য অক্ষয় মিলন করাইয়া দিবে। চল, এখন আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিই। আমাকে এখনই ফিরিতে হইবে।

রে। তোমার কি হইবে ? তিনি তোমার উপর যেরূপ রাগিয়াছেন, তাহাতে তোমার কি দশা হইবে—কে জানে ? আমার জন্য তুমি কেন বিপদে পড়িবে ?

মো। আমার এ জীবনের উপর দিয়া আগে অনেক বিপদ গিয়াছে। এখন অনেক দিন হইতে খালি পড়িয়া আছে, সেই জন্য কেমন ফাঁকা

ফাঁকা বোধ হয়; তুমি বিপদ ভালবাস না, কিন্তু আমি নিত্য নিত্য বিপদের সঙ্গে থাকিয়া বিপদকে কেমন যেন একটু ভালবাসিতে শিখিয়াছি; তাই আমি বিপদ ভালবাসি, তোমার বিপদটা আমি যদি নিই, তাতে আর তোমার দুঃখ কি? এখন এস, যতক্ষণ তোমাকে এখান হইতে না সরাইতে পারিতেছি—ততক্ষণ তোমার বিপদটা আমি সম্পূর্ণ দখল করিতে পারিতেছি না।

মোহিনী রেবতীর হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কেশবচন্দ্রের মুক্তি।

বাহির হইবার আর কোন উপায় না দেখিয়া কেশবচন্দ্র সেই অবরুদ্ধ কক্ষমধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, এবং অন্ধকারমাত্রাত্মক হইয়া সম্মুখস্থ নিবিড় বনভূমি ভীষণ হইয়া উঠিল।—বায়ু গর্জ্জন করিয়া প্রবলবেগে ঝটিকারম্ভ হইল; এবং ঝটিকান্দোলিত অসংখ্য বন্যবৃক্ষের সহিত নিবিড়তর অন্ধকার সংক্ষুব্ধ-সমুদ্রবৎ তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। মেঘমণ্ডিত মসীমলিন আকাশের সহিত তদনুরূপ বনস্থলী একত্রে মিশিয়া, নীলিমা ঢাকিয়া, তারা ঢাকিয়া, চন্দ্র ঢাকিয়া প্রকৃতির বক্ষে চিত্রবৈচিত্রবিহীন যতদূর-দৃষ্টি-চলে-ততদূর-বিস্তৃত একখানা কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া দিল।

ক্ষণপরে সেই অন্ধকারের মধ্যদিয়া আর এক অন্ধকারমূর্ত্তি সেই অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে ডাকিল, "রেবতী, রেবতী"

তাহার কণ্ঠস্বরে কেশবচন্দ্র যেন প্রাণ পাইল, বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি বলিতে বলিতে উঠিল, "কে রে, গোরাচাঁদ ? এদিকে এক সর্ব্বনাশ হয়ে-গেছে।" বলিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোরাচাঁদ বলিল, "এই যে আপনি এখানে আছেন, আপনাকে খুঁজিতেই আমি এখানে এসেছি। দরজাটা খুলে দিন, অনেক কথা আছে।"

কেশবচন্দ্র বলিল, "দরজা বাহির হইতে বন্ধ, শীঘ্র দরজাটা খুলিয়া দে।"

অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া গোরাচাদ শিকল অনুসন্ধান করিল, দেখিল, তাহা তালাবদ্ধ ; বলিল, "ডাক্তারবাবু, এ যে চাবি দেওয়া, কেমন করে খুল্‌বো ? আপনার কাছে চাবি আছে ?"

কেশবচন্দ্র বলিল, "চাবি নাই। যেমন করিয়া হোক, এখনি ভাঙ্গিয়া ফেল্।"

গোরাচাঁদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "ব্যাপার কি ? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কি হয়েছে ?"

কেশবচন্দ্র বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে—পাখী উড়িয়াছে—ভরা জাহাজ ডুবিয়াছে—এক দম্‌সে বিশ হাজার টাকা লোকসান। আগে দরজাটা খুলিয়া দে—সব কথা বলিতেছি।"

গোরাচাঁদ অনেক অনুসন্ধানে সেই ভাঙ্গা বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরিয়া জানালা-ভাঙা একটা লোহার গরাদা সংগ্রহ করিয়া আসিল ; তাহাতেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইল ; শিকলের ভিতর সেই লৌহদণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া একপাক ঘুরাইতেই খুলিয়া গেল। কেশবচন্দ্র তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মোহিনীর সন্ধান।

কেশবচন্দ্র বাহিরে আসিয়া, গোরাচাঁদকে বলিল, "গোরাচাঁদ, রেবতী পলাইয়া গিয়াছে।"

সবিস্ময়ে গোরাচাঁদ বলিল, "সেকি! কোথায় গেল? কখন?"

কেশবচন্দ্র বলিল, "কোথায় জানি না—এক ঘণ্টা হইবে, আমার চোখের সাম্‌নে সে পলাইয়া গিয়াছে।"

কেশবচন্দ্র আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা গোরাচাঁদকে বলিল। শুনিয়া গোরাচাঁদ আরও বিস্মিত হইল। বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এখনি রেবতীর খোঁজ কর্‌তে হবে।"

"এখনি কি, এই মুহূর্ত্তে তাকে যেমন করে হোক্ ধর্‌তেই হবে, নতুবা সব পণ্ড হবে। তুই ত যত গোল বাঁধাস্, তোর ফির্‌তে এত দেরি হল কেন বল দেখি? বেটা যদি একঘণ্টা আগে ফির্‌তিস্ তা হলে আর আমাকে এমন পাইস হাত জলে পড়্‌তে হত না। এখন এমন আমার রাগ হচ্ছে তোর উপর—যে তোরই মাথাটা ভেঙে ফেলি।"

"হাঁ আমারই বেশি দোষ কি না; আটক হয়ে চুপকরে বসেছিলেন, আমি এসে আপনাকে বার্ কর্‌লেম্—এই আমার অপরাধ।"

(সক্রোধে) "অপরাধ না, বেটা, তুই যেখানে যাবি সেখানেই বাঘের মাসী—এক ঘণ্টার জায়গায় দশ ঘণ্টা কাটিয়ে তবে ফির্‌বি, তোকে নিয়ে আমার কাজ চালানো ভার হলো দেখ্‌ছি।"

"আমি ত সন্ধ্যার আগেই ফিরেছিলেম্, বিশ ক্রোশ পথ সহজ নয় ত; তার পর আপনার বাড়ীতে যদি গেলেম, সেখানে আপনাকে দেখ্‌তে পেলেম্ না, সেখান থেকে আবার তমীজউদ্দীনের বাড়ীতে গেলেম্, তার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বেটী 'নাই' বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। তার পর এখানে এসে যা শুন্‌লেম্, শুনেই চক্ষুস্থির।

"এখন যেখানে তোকে পাঠিয়েছিলেম, সেখানে গিয়ে তুই কি করে এলি বল্‌দেখি? তিনি কি বল্‌লেন?"

"আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি একটা নির্জ্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালে, সেখানে আমি সেটা তার হাতে দিলেম্, দেখেই খুব আপ্যায়িত।"

"টাকার কথা কি হল?"

"সেই দিকেই গোল বেঁধে গেছে; দুটো কাজ একসঙ্গে শেষ না কর্‌তে পার্‌লে টাকা কড়ির বিষয় কিছু হবে না। আপনি মনে কর্‌-ছিলেন, আগে একটা কাজ শেষ করে কিছু টাকা হস্তগত করে, শেষে তাকে জড়িয়ে ফেলে এমন একচাল চালবেন যে, তার জমীদারী তালুক মুলুক সবগুলি আপনার হাতেই আস্‌বে, তা আর হলো কই? সে ভারি ধড়ীবাজ্‌ লোক, আমাদের উপরের একচালে সে চলে; সে বল্‌লে, দুটোতে আমার যা আশঙ্কা, একটাতেও তাই; এতে আর কাজ হাঁসিল হলো কই?"

"এত যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম সকলই পণ্ড হল দেখ্‌ছি।"

"আমি বল্‌লেম, দুটোকে একবারে শেষ করুন, তা ত আপনি শুন্‌লেন না; এখনি রোক্‌ বিশহাজার টাকার তোড়া ঘরে তুল্‌তেন। গরীবের কথা বাসী হলে মিষ্ট লাগে। আপনি পড়্‌লেন বেশি লোভে, কাজেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

"কেন ? তুই বল্‌লিনি, তার সঙ্গে কথা ছিল কি ? এক একটা কাজ শেষ হবে, এক একটা কাজে দশ দশ হাজার টাকা ; এই কথাই ত বলা-কহা ছিল ; লেখা পড়ার মধ্যেও ত তাই আছে, যে, দুইটি কাজ দশ হাজার টাকা হিসাবে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।"

"তা ত বুঝ্‌লেম্, কিন্তু সেই বিশ হাজার টাকা যে তুই কিস্তিতে নয়, এক কিস্তিতে। তা এখানে এসে যা দেখছি, তাতে ত আপনি একেবারে কিস্তি মাৎ করে বসে আছেন, এখন বিশ হাজার টাকার জায়গায় বিশটি পয়সাও পাবেন্ না।"

ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কেশবচন্দ্র কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "গোরাচাঁদ, তুই যা, যেমন করিয়া পারিস্, রেবতীকে ধরিয়া আন্। যদি তাকে জীবিত অবস্থায় আন্‌তে পারিস, আগে সে চেষ্টা করিস্— আমি তাকে স্বহস্তে খুন কর্‌বো। যদি তেমন কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিস্, তা হলে খুন করে তার মৃতদেহ নিয়ে আস্‌বি। জীবিত কি মৃত যে কোন অবস্থায় রেবতীকে আমার চাই-ই-চাই। নৈলে বিশ হাজার টাকা এক দম্‌সে ফাঁক হয়ে যাবে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, অতিলোভটা করা আমার অন্যায় হয়েছে। তুই, রেবতীর সন্ধানে যা ; আমি মোহিনীর সন্ধানে যাই,—এই বিশ হাজার টাকার শোধ আমি, মোহিনীর উপর তুল্‌ব—তবে ছাড়্‌বো। আগে আমি তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর্‌তেম ; যা মনে কর্‌তেম, এখন দেখ্‌ছি তা নয়, সে আমার একটা ভয়ানক শত্রু।"

তখন অদূরে থাকিয়া অন্তরাল হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিল, "শত্রু বলে শত্রু, পরমশত্রু। সে শত্রুর সন্ধান করিতে কোথায় যাইতে হইবে না, এখানেই আছে; তোমাকে ছাড়িয়া সে এক মুহূর্ত্ত কোথায় থাকে না। তা যদি থাকিবে তবে সে তোমার শত্রু কি ? যদি দূরেই থাকিবে,

তবে বিনোদ, সে শত্রু তোমার পদে পদে শত্রুতা করিবে কি প্রকারে ?”

পাঠক, বিনোদলাল আর কেশবচন্দ্র একই লোক।

কণ্ঠস্বরে কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিল, সে মোহিনী। কিন্তু চারিদিকে যে ভয়ানক অন্ধকার ; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্ধকার ঠেলিয়া কোথায়ও তাহাকে দেখিতে পাইল না ; তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল এবং ঝড় তেমনি প্রবলবেগে তখনও গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছিল। সেই ঝড় বৃষ্টির গোলমেলে শব্দে কেশবচন্দ্র কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, মোহিনী কোথায় দাঁড়াইয়া তাহাকে উপহাস করিল। চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল, যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইল না।

“আমাকে দেখিতে পাইতেছ না ? এই যে আমি।” বলিয়া তখনই মোহিনী একটা জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের মতন বিকট গর্জ্জনে কেশবচন্দ্র মোহিনীকে ধরিতে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই গোরাচাঁদ অপর দিক হইতে মোহিনীকে আক্রমণ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই মোহিনী চকিতে আবার সেই সর্পসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। একে নিবিড়তর অন্ধকার—সেই জঙ্গলের ভিতর যাইয়া কেশবচন্দ্র ও গোরাচাঁদ মোহিনীকে অনেক খুঁজিল। মোহিনীকে পাইল না।

কেশবচন্দ্র বলিল, “এক কাজে দুজনে থাকিবার প্রয়োজন নাই। গোরাচাঁদ, তুই রেবতীর সন্ধানে যা, যেমন করিয়া পারিস্, রেবতীকে আনিতে চাস্। আমি এখানে রহিলাম—মোহিনীকে খুন না করিয়া আমি অন্য কাজে হাত দিব না। পিশাচী আমার বড় আশায় ছাই দিয়াছে।”

গোরাচাঁদ চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জোবানবন্দী।

পাঠক, এখন কেশবচন্দ্র গোরাচাঁদ, মোহিনী ইত্যাদির কথা রাখিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে দুর্ঘটনার কথা বলিতেছিলাম, তাহাই এখন আমাদিগের আখ্যায়িকার পুনরবলম্বন হইল। সেই দীর্ঘিকার অদূর-বর্ত্তী জঙ্গল-মধ্যে যে রক্তমাখা কাপড়, দীর্ঘ ছুরী, ইত্যাদি পড়িয়াছিল, তাহাই লইয়া পরদিন প্রত্যূষে গ্রামমধ্যে এমন একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, যে কথাটা রঞ্জিত—ক্রমে অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধনের ঘরের সমুখে স্নিগ্ধ ছায়াছন্ন বটগাছের তলায় তৃণাস্তরণে বসিয়া হুঁকা হস্তে, কাসি কণ্ঠে, গম্ভীরমুখে এবং স্তিমিত নেত্রে প্রাচীনেরা সেই কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। ঘাটে কলসী-কক্ষে বামা, উচ্ছিষ্ট-মলিন তৈজসস্তূপহস্তে শ্যামা, একরাশি ক্ষারসিদ্ধ বস্ত্র স্কন্ধে শম্ভুর মা, এবং তৈলাক্তদেহে কামিনী সেই প্রসঙ্গের উপর নিজেদের মতামতের এক একটা অলঙ্ঘ্য দৃঢ় ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

প্রভাতোদয়ের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দম ঘটনাস্থলে দেখা দিলেন। সঙ্গে পাঁচ-সাত-জন পাহারাওয়ালাও আসিল। বলাই মণ্ডল ও তাহার সঙ্গীগণের জোবানবন্দী অরিন্দম একে একে লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। তাহারা যাহা জানিত, ঠিক্ ঠিক্ বলিয়া গেল, জেরার ঘোরফেরে তাহাদের বড় একটা পড়িতে হইল না। যেখানে একটু মিথ্যার গন্ধ

আছে, সেই থানেই গোলযোগ ; সেই গোলযোগে যদুনাথ গোস্বামী একটু জড়াইয়া গেলেন। অরিন্দম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাল রাত্রে তেমন দুর্য্যোগে কোথা হইতে আসিতেছিলেন ?"

যদু। গোসাঁই পাড়ায় আমার ভগ্নীপতির বাড়ী ; আমার ভগ্নী পীড়িতা, তাই তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেইখান হইতে আসিতে ছিলাম।

অরি। ফিরে আসিবার সময় আপনিই কি আগে ... রক্তমাখা কাপড় দেখিতে পাইয়াছিলেন ? না, আপনার ... কেহ তখন ছিল, সে আপনাকে দেখাইয়া দি...

য। না, আমার সঙ্গে আর কে...। ... দেখিতে পাই।

অ। ভাল দেখিবার পূর্ব্বে এই জঙ্গলের ... আপনার তখন কোন আবশ্যক হইয়াছিল কি ?

য। না, আমি উহার ভিতর যাইব কে...

অ। তবে কেমন করিয়া আপনি যে ... কাপড়-খানা জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া থাকিতে ... বুঝিতে পারিতেছি না।

য। কেন ? বিদ্যুতের আলোতে আমি ... ছিলাম।

অ। কাপড়খানা দেখিবার পর, বলাই মণ্ড... হইবার আগে আপনি ঐ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন ?

য। (ক্ষণেক চিন্তা।)

অ। বলুন না, ইহাতে ভাবিয়া বলিবার কি আছে ?

য। না।

অ। এই চল্লিশোর্দ্ধ বয়সেও আপনার দৃষ্টিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ আছে

দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। দিনের আলোয় চেষ্টা করিয়া দেখিলে বাহির হইতে বোধহয় এ কাপড়খানা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যাইত না; রাত্রে বিদ্যুতের আলোয় তাহাও আপনি দেখিতে পাইয়াছিলেন; তা ছাড়া, কাপড়খানা যে রক্তমাখা, তাহাও বাহির হইতে আপনি স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। কেমন গোস্বামী মহাশয়, এ সকল যেন কিছু [illegible] বলিয়া বোধ হইতেছে না?

য[illegible] আপনি কি মনে করি[illegible]ছেন, আমি আপনাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছি?

অ। [illegible] পারি। তবে যে আপনি সত্যকথা বলিতেছেন, [illegible] পারিতেছি না। দেখুন, গোস্বামী মহাশয়, আপনি [illegible] মণ্ডলের মত একজন সরল-বিশ্বাসী বলিয়া মনে [illegible], আপনি যাহা বলিয়া যাইবেন, তাহাই বিশ্বাস করি[illegible] চোক-বাঁধা বিশ্বাসেও কোন কাজ করি না। [illegible] কথাটির উপর সন্দেহ করিয়া করিয়া তবে একটি [illegible] ধরিয়াই আমাদের কাজ করিতে হয়। যতক্ষণ [illegible] গোপন না করিয়া অকপটচিত্তে প্রকৃত কথা আ[illegible] যায়, ততক্ষণ আমরা আমাদের কার্য্যোদ্ধারের [illegible] পাই না। তার ভিতর একটু মিথ্যার ছায়া দেখি[illegible]নেকটা আশা করিয়া থাকি; আপনার দুই একটি কথা শুনিয়াই আমার মনে সেই রকমের অনেকটা আশা হইয়াছে, যে আমি আপনার সাহায্যেই শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আপনি যেন এ খুন-রহস্যের ভিতর একটু না একটু জড়িত আছেন, আপনার কথা শুনিয়া এমনও একটু বোধ হইতেছে। দেখা যাক্, কি হয়।

য। (রাগ ভরে) নয় আমিই খুন করিয়াছি, আমাকেই নয় চালান্ দিন্। সাত পো অধর্ম্ম না হলে, কেউ পুলিসের হাঙ্গামে পড়ে না। আপনারা থানার লোক, আপনারা সব কর্‌তে পারেন।

অ। (মৃদুহাস্যে) আঃ, আপনি রাগ করেন কেন? আপনি এখন স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌তে পারেন, আপনাকে আর আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার নাই।

যদুনাথ গোস্বামী মুখ ভার করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, অরিন্দম তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পদচিহ্ন।

যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদুনাথ গোস্বামীকেই কি আপনি এ খুন সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন?"

অরিন্দম বলিলেন, "খুন কোথায়, যোগেন বাবু? আপনি কি মনে করিয়াছেন, সেই বালিকাকে কেহ হত্যা করিয়াছে?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই রক্তমাখা কাপড়, ছোরা, দেখিয়া তাহা ভিন্ন আর কি মনে করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ একটা দস্যু ছুরি লইয়া সেই বালিকার অনুসরণ করিয়াছিল, শুনিলাম। আপনি কি বলেন?"

অরিন্দম বলিলেন, "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এইটুকু বলিতে পারি, সেই বালিকা মরে নাই, কোথায় যায়ও নাই, এই গ্রামের মধ্যে আছে।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বলাই মণ্ডল যে, বালিকাকে 'খুন করিল' বলিয়া বারম্বার আর্ত্তনাদ করিতে শুনিয়াছিল, সেটক কি বলাই-মণ্ডলের একটা স্বপ্ন ?"

অরিন্দম বলিলেন, "স্বপ্ন নহে, ঐ জন্য আমিও মনের ভিতর একটু গোলযোগে পড়িয়াছি; নতুবা এখানে আসিয়া আর যা শুনিলাম, আর যা দেখিলাম, তাহাতে বালিকা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, বেশ বুঝা যাইতেছে।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেই বালিকা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, এমন কি প্রমাণ পাইলেন ?"

অরিন্দম বলিলেন, "যে দুই চারিটি প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে আমি অনেকটা নির্ভর করিতে পারি। প্রথমতঃ এই জঙ্গলের ভিতরে ও বাহিরে কর্দ্দমের উপর যে সকল পদচিহ্ন রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিই ত বালিকার বলিয়া বোধ হয় না। সকলগুলিই যথেষ্ট লম্বা এবং যথেষ্ট চটলা।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহা যেন হইল, কিন্তু, হত্যাকারী অপরস্থানে সেই বালিকাকে হত্যা করিয়া এই জঙ্গলের ভিতর রক্ত-মাখা কাপড় আর ছুরিখানা লুকাইয়া রাখিতে পারে।"

অরিন্দম বলিলেন, "দ্বিতীয়তঃ হত্যাকারীর কোন চিহ্নই দেখিতেছি না। এই জঙ্গলের ভিতরে কেবল চারি রকমের পায়ের দাগ দেখিতেছি; চারিজনের মধ্যে একজন বলাইমণ্ডল, একজন সাধুচরণ, একজন হরকৃষ্ণ,* একজন আমাদের গোস্বামী প্রভু। এই চারজনেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছিল বলিতেছে. চারিজনেরই পায়ের দাগ পাওয়া

* বলাই মণ্ডলের সঙ্গীদ্বয়, যাহারা গতরাত্রে লাঠিহাতে বলাই মণ্ডলের অনুসরণ করিয়াছিল।

যাইতেছে; এই চারজন ছাড়া এই জঙ্গলের মধ্যে কেহ যায় নাই, তাহা হইলে এই চারিটি ছাড়া অপর রকমের দাগ একটি না একটি দেখিতে পাইতাম।" আর সত্যই যদ্যপি বালিকা খুন হইয়া থাকে তাহা হইলে, এই চারিজনের মধ্যে কেহ সেই বালিকার হত্যাকারী।"

এই বলিয়া অরিন্দম উঠিলেন, জোবানবন্দী দিতে আসিয়া বলাই-মণ্ডল, সাধুচরণ, হরকৃষ্ণ, ও যদুনাথ গোস্বামীর যে সকল পায়ের দাগ ভিজা মাটিতে পড়িতে তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই গুলির সহিত জঙ্গল মধ্যস্থিত পায়ের দাগগুলি এক একটি করিয়া মাপে মিলাইয়া যোগেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন। সকলগুলিই মাপে ঠিক হইল। কোন্‌টি কাহার পায়ের দাগ, তাহাও বলিয়া দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিস্ময়-পুলকিত দৃষ্টিতে, অবাঙ্মুখে, অনেকক্ষণ অরিন্দমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, "আরও একটা কথা হইতেছে, এই কাপড়-খানিতে যে ভাবে রক্ত লাগিয়াছে, তাহাতে হত্যাকাণ্ডের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয়, কেহ কাপড়খানাতে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছে। তা ছাড়া যদি ঐ [illegible] কিম্বা ঐরূপ কোন অস্ত্র দিয়াই সেই বালিকাকে খুন করা [illegible] হইলে ঐ কাপড়ের কোন এক অংশ সম্পূর্ণরূপে রক্তে [illegible]; এমন ঐখানে একটু, সেখানে একটু করিয়া চারিদিকে [illegible] কেন? হত্যাকারীর কাপড়ে এরূপ ভাবে রক্ত লাগা অসম্ভব নহে। তা ছাড়া খুন করিয়া মৃতদেহ হইতে কাপড়খানি খুলিয়া লইবারও কোন কারণ দেখিতেছি না। কাপড়খানি এমন কিছু একটা ভারি জিনিষ নয় যে, হত্যাকারী মৃতদেহের সহিত এ কাপড়খানি বহন করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়াছিল।"

মুগ্ধচিত্তে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি যে এই সব সামান্য বিষয় হইতে এতদুর ঠিক করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য ; আমি ত এ সকলের বিন্দুবিসর্গ লক্ষ্য করি নাই।"

অরিন্দম বলিলেন, "ইহাই বা কি, অনেক সময় একগাছি সামান্য চুলের উপর লক্ষ্য করিয়াও আমাদের চলিতে হয় ; সন্দেহের একটি পরমাণু পাইলেও সেটি লইয়া আমাদের সহস্রবার নাড়াচাড়া করিতে হয়।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যদি খুনই হয় নাই, বালিকা বাঁচিয়া আছে, তবে যদুনাথ গোস্বামীর উপর আপনি অনর্থক সন্দেহ করিতেছেন কেন ?"

অরিন্দম বলিলেন, "খুন হয় নাই বলিয়াই যে কাহাকে সন্দেহ করিব না, এমন কি কথা। আমি ত গোস্বামীকে খুনী বলিয়া সন্দেহ করি নাই। গোস্বামী এই সকল কাণ্ডের কিছু-না-কিছু জানেন বলিয়াই, আমি তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছি। নতুবা কোন্ প্রয়োজনে তিনি মিথ্যা বলিলেন ; অবশ্যই মিথ্যা বলিয়া তিনি আমাদের দৃষ্টি হইতে কোন বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, তিনি একবার ভিন্ন এই জঙ্গলের ভিতর আর যান নাই ; কিন্তু তিনি যে দুইবার এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই দেখুন, গোস্বামীর পায়ের দাগগুলি এক মুখে দুইবার অঙ্কিত হইয়াছে। এই দেখুন, গোস্বামী মহাশয়ের এইগুলি দক্ষিণ পায়ের দাগ, এ গুলির এক ইঞ্চি তফাতে ঠিক পাশাপাশি দেখুন ঐ ভাবে ঐ মুখে আরও এক একটি ঐ দক্ষিণ পায়ের দাগ, যদি এ দাগগুলি বিপরীত মুখে পড়িত, তাহা হইলে মনে করিতে পারিতাম এ দক্ষিণ পায়ের দাগ ফিরিবার সময় পড়িয়াছে।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এরূপ ত হইতে পারে, হয় ত ভিতরে ঢুকিবার সময় ঐখানে তিনি একবার দাঁড়াইয়াছিলেন, কোন কারণে আবার একবার একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে এক পায়ের দাগ এক মুখে দুইবার ঐরূপ পাশাপাশি অঙ্কিত হওয়া বিচিত্র নহে।"

অরিন্দম বলিলেন, "শুধু একস্থানে ঐরূপ দাগ পড়িলে আপনার এ যুক্তি অন্যায় বোধ করিতাম না ; দেখুন, প্রত্যেক স্থানে ঐরূপ দাগ রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দাগের উপরেও দাগ পড়িয়াছে, কোন স্থানে বা একটু বেশি তফাৎ ; কেবল ফিরিবার সময় দাগগুলি এরূপ এক পায়ের দাগ এক মুখে পাশাপাশি দেখা যাইতেছে না। তাহার কারণ, তিনি প্রথম বার এখানে আসিয়া এইদিক দিয়া বাহির হন্ নাই। এই দেখুন, উত্তর মুখে এই যে সকল পায়ের দাগ ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে, এই গুলিও গোস্বামী মহাশয়ের। তিনি একবার এই উত্তরদিক্ দিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। আমি এই দাগ-গুলি দেখিয়াই চিনিতে পারিতেছি, ইহা গোস্বামী মহাশয়ের ; কিন্তু আপনাকে মাপিয়া না দেখাইলে চিনিতে পারিবেন না।"

এই বলিয়া অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে সেই দাগগুলি মাপিয়া দেখাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "গোস্বামী মহাশয় যে, দুইবার এখানে আসিয়াছিলেন, সে প্রমাণ ত এখন আপনি স্পষ্ট দেখিলেন ; কিন্তু গোস্বামী মহাশয়, একবার ভিন্ন আর ইহার মধ্যে যান্ নাই, এই মিথ্যা কথাটির ভিতর অবশ্যই একটা গূঢ় অভিপ্রায় সংলগ্ন আছে। আর এই ছুরিখানা সম্বন্ধে দুই একটি কথা আছে ; ছুরিখানি যেরূপ লম্বা চওড়ায় বড় দেখিতেছি—খুনীর ছুরির মতনই বটে। হইলে কি হয়, ইহাতে এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহাতে এই ছুরিতে বালিকার

কোন অনিষ্ট হইয়াছে এমন বোধ করিতে পারি। তাহা হইলে এই ছুরির একস্থানে না একস্থানে কণামাত্রও রক্তের দাগ দেখিতে পাইতাম।"

যোগেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন, "যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে রক্তের দাগ ধুইয়া যাইতে পারে।"

অরিন্দম বলিলেন, "ছুরিখানার যে অংশ উপরের দিকে ছিল, সে অংশের রক্তের দাগ বৃষ্টিতে ধুইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ছুরিখানির যে অংশ মাটীর দিকে ছিল, সে দিকে একটুও রক্তের দাগ দেখিতে পাইতাম। বাঁটের খাঁজের ভিতরও একটু না একটু রক্ত লাগিয়া থাকিত। এই সকলের পর তেমন যে বড় বেশি বৃষ্টি হইয়াছিল, বোধ হয় না। তেমন বৃষ্টি হইলে এ সকল পায়ের দাগ এমন স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম না। আর কাপড়ের রক্তের দাগগুলি এমন গাঢ় থাকিত না, বৃষ্টির জলে বেশি রকমে ভিজিলে অবশ্যই অনেকটা ফিঁকা দেখাইত। এখন এই মাথার কাঁটা দুটির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। এই দুটি কাঁটায় আমার অপর একটি কাজের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। দুইদিন পূর্ব্বে থানায় সিন্দুকের ভিতর যে বালিকার মৃতদেহ দেখিয়াছিলাম, সেই বালিকার হত্যাকাণ্ডের সহিত আজিকার এ ঘটনার কিছু সংস্রব আছে, বুঝিতেছি। সে দিন সিন্দুক মধ্যে যে দুটি কাঁটা পাইয়াছিলাম, আর আজ এখানে আসিয়া যে দুটি কাঁটা পাইলাম, এক কারিগরের হাতেই তৈয়ারি, একমাপ, এক ধরণের।"

তখন পূর্ব্বের সেই দুটি কাঁটা বাহির করিয়া, অপর দুইটির সহিত মিশাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রনাথের সম্মুখে ধরিয়া অরিন্দম বলিলেন, "এইবার আপনি এই কাঁটাগুলি হইতে আগেকার সেই দুটি চিনিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন কি?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সকল গুলিই ত এক রকমের দেখিতেছি। কিরূপে চিনিব ?"

তাহার পর অরিন্দম নিজের নোটবুক খানি বাহির করিয়া শেষের দিককার একখানি পাতা খুলিয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। তাহাতে এইরূপ একটি রজকের চিহ্ন অঙ্কিত কাপড়ের কোণ সংলগ্ন ছিল। যোগেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, "এ আবার কি—বুঝিতে পারিলাম না। আপনার সকলই অদ্ভুত।"

অরিন্দম বলিলেন, "এমন বিশেষ কিছু নয়, তবে ইহা এখন একটা বিশেষ উপকার দেখিল। থানায় সেই মৃতা বালিকার কাপড়ে যে রজকের চিহ্ন ছিল, ইহা তাহাই, আজ এখানকার ঘটনার এই রক্তমাখা কাপড়খানিতে যে মার্কা দেখিতেছি, ইহার সহিত এই মার্কারও কিছুই প্রভেদ নাই; তাই বলিতেছি, সে ঘটনার সঙ্গে আজিকার এ কাণ্ডের অনেকটা যোগাযোগ আছে। সে দিন সেই বালিকার মৃতদেহ দেখিয়া, এই মাথার কাঁটা আর রজকের চিহ্ন ছাড়া হত্যাকারীকে ধরিবার কোন সূত্র পাই নাই, আপনার মুখে সে দিন যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাও বড় জটিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যেমন করিয়া হোক পরে যে কৃতকার্য্য হব, এখন এমন আশা করিতে পারি।

যোগেন্দ্রনাথের সহিত অরিন্দমের আর কোন বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না; যোগেন্দ্রনাথ একজন পাহারাওয়ালাকে দিয়া সেই রক্তাক্ত কাপড় ছুরিখানা থানায় লইয়া আসিলেন। অরিন্দম বাসায় ফিরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এ সুন্দরী কে?

সেই দিন অপরাহ্নে অরিন্দম একাকী বাহির হইলেন। যদুনাথ গোস্বামীর বাটী অভিমুখে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইতে বেলা পড়িয়া আসিল। যদুনাথ গোস্বামীর বাড়ীখানি একতল, ছোটবড় চারি পাঁচটি ঘর আছে; ঘরগুলি পুরাতন, বাহিরের চারিদিকে লোণা ধরিয়াছে। একদিক হইতে লাউগাছ, আর একদিক হইতে কুমড়াগাছ, এদিক হইতে পুঁই, ওদিক হইতে ধুতুল, সীম, শশাগাছ, ছাদে উঠিয়া সমুদয় ছাদ ব্যাপিয়াছে—শেষে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় ছাদের চারিদিক দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

সেই সকল দেখিতে দেখিতে অরিন্দমের দৃষ্টি একটি উন্মুক্ত ক্ষুদ্র গবাক্ষের উপর গিয়া পড়িল; দেখিলেন, তিনি দেখিতে না দেখিতে একটি স্ত্রীলোক সেখান হইতে চকিতে সরিয়া গেল। বিদ্যুৎও বোধহয় তেমন চকিতে মিলায় না। সেই নিমেষমাত্র সময়ে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অরিন্দমের অনুভব হইল, স্ত্রীলোকটির বয়স বেশি নয়, আশ্চর্য্যরূপ সুন্দরী, মুখখানি আরও সুন্দর; কিন্তু যেরূপ সুন্দর, তেমন যেন প্রফুল্ল নহে। আবার তাহাকে দেখিবার জন্য অরিন্দম কিছুক্ষণ সেই দিকে নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, "কে ইনি? হয় ত যদুনাথ গোস্বামীর কন্যা হইবেন। কিন্তু বলাই মণ্ডলের নিকট শুনি-

য়াছি যদুনাথ গোস্বামী নিঃসন্তান। এক স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার সংসারে আর কেহই নাই; অনেক ব্রাহ্মণ কুলগৌরবের জোরে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াও বিবাহ করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ পঞ্চাশের অদৃষ্টে এখনও গোস্বামী মহাশয়ের পাদস্পর্শ লাভ হয় নাই। তাহা হইলে এখন যাঁহাকে দেখিলাম, তিনি কন্যা না হইয়া বৃদ্ধস্যতরুণী ভার্য্যা হইতে পারেন।”

অরিন্দম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই উন্মুক্ত গবাক্ষে আর একটি বর্ষীয়সা স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। তিনিও একবার অরিন্দমের দিকে চাহিয়া তখনই তথা হইতে অন্তহিত হইলেন। অরিন্দমের সংশয় আরও বাড়িল। ভাবিলেন, ইনিই গোস্বামী মহাশয়ের গৃহিণী হইবেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যাহাকে দেখিলাম, সে নবীনা কে? গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক?

সেখানে সেরূপভাবে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা ভদ্রোচিত কার্য্য নহে, বুঝিয়া অরিন্দম তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। কেননা সে দিকটা যদুনাথ গোস্বামীর ভিতর বাটীর পশ্চাদ্ভাগ। অরিন্দম তখন একবার গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য সদর বাটীর সম্মুখে আসিলেন। সে দিকের সমুদয় গবাক্ষ, ও দ্বার বন্ধ দেখিলেন। সেখানে আসিয়া কাহাদের কথোপকথনের অস্ফুটশব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তিনি তখন একটি রুদ্ধ জানালার পার্শ্বে আসিয়া, কাণ পাতিয়া দাঁড়াইলেন। দুই একটি কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ভিতরে আর এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইতেছে। তখন তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, সেই

ঘরে দুইটি লোক বসিয়া। একজনকে চিনিলেন, যদুনাথ গোস্বামী; অপর লোকটি অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল, তাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল তথাপি যদুনাথ গোস্বামী ও সেই অপরিচিতের সেই কূটপরামর্শ চলিতে লাগিল। অরিন্দম অনন্যমনে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন; ক্রমশঃই তাহাতে অধিকতররূপে তাঁহার চিত্তাকৃষ্ট হইতে লাগিল। যখন ভিতরের সেই গুপ্তমন্ত্রণার শেষ হইয়া আসিল, অরিন্দম বাহিরে একবার চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, এবং শুক্লাষ্টমীর পূর্ণ অৰ্দ্ধচন্দ্র মধ্যগগন ছাড়াইয়া পশ্চিম আকাশের অনেকদূর অবধি নামিয়াছে। তাহার দূরে ও নিকটে জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল তরল শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি নির্ম্মল আকাশের বুকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অরিন্দম সেই জানালার ছিদ্রপথে দেখিলেন, তখন গোস্বামী ঝুঁকিয়া প্রদীপের সম্মুখে একখানি পত্র লিখিতেছেন, সেই অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার মুখের একপার্শ্ব দীপালোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, লোকটা একান্ত কুৎসিৎ দেখিতে। গঠন প্রণালী দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। অরিন্দম তাহাকে চিনিতে পারিলেন না; কখনও কোথায় দেখিয়াছেন, এমনও বোধ হইল না। কোন্ উদ্দেশে পত্রখানি লেখা হইতেছিল, অরিন্দম বুঝিতে পারিয়াছিলেন; ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগের মন্ত্রণার মধ্যে ঐ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল।

পত্র লেখা হইলে সেই অপরিচিত লোকটি সেখানি বুকপকেটে রাখিয়া দিল। অরিন্দম তাহা দেখিলেন। বুঝিলেন, লোকটি এখনই বাহিরে আসিবে; এই জন্য তিনি সেখান হইতে একটু দূরে একটা বটগাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখনই সেই লোকটি বাহিরে

আসিল, একটু দূরে দাঁড়াইয়া বাড়ীখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আপনার গন্তব্যপথ ধরিল। অরিন্দম তাহার অনুসরণ করিলেন। তাহার অপেক্ষা দ্রুত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই অপরিচিত লোকটি দুই একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কোন কথা কহিল না—অরিন্দমও না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুসরণে।

যখন যদুনাথ গোস্বামীর বাড়ী হইতে অনেকদূর অরিন্দম সেই অপরিচিত লোকের অনুসরণে আসিয়া পড়িলেন; তখন তিনি উপযাচক হইয়া তাহার সহিত এইরূপ প্রথম আলাপ করিলেন; "মহাশয়কে যেরূপ দেখিতেছি, যদিও আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই, কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি, সাম্‌নে বল্‌লে খোসামুদি করা হয়—অতি—অতি—

অপরিচিত লোকটি এইরূপ আলাপে যত সন্তুষ্ট না হক্‌, বড় বিস্মিত হইয়া বলিল; "কে হে বাবু তুমি ?"

অরিন্দম আরও একটু গড়াইয়া বলিলেন; "এই, এই কথাটা হচ্ছে যে, মহাশয়ের সাম্‌নে বল্‌লে খোসামোদ করা হয়—আপনি অতি—অতি—"

অপরিচিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কেবল "অতি, "অতি"ই কর্‌ছো যে—কি বল না—অতি ভদ্রলোক না অতি—সদাশয় লোক ?"

অরিন্দম বলিলেন, "রাম, তাও কি কখনও হতে পারে, একজন

অতি ধড়ীবাজ লোক। সাম্‌নে বল্‌লে খোসামোদ করা হয়, তাই বলি বলি করেও বল্‌তে পারছিলেম না।" বলিতে বলিতে অরিন্দম আরও একটু তাহার নিকটস্থ হইলেন। নিকটস্থ হইয়া তাহাকে—বিশেষতঃ তাহার মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন।

সেই অপরিচিত লোকটি ললাট কুঞ্চিত করিয়া একটু হাসিল। তাহার মুখখানি গড়িতে বিধাতার কি জানি এমনই এক সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা ছিল, যে, সে মুখখানিতে হাজার হাসি একসঙ্গে দেখা দিলেও বুঝাইত না, লোকটি হাসিতেছে, না, কি এক অসহ্য অরুন্তুদ যন্ত্রণায় মুখবিকৃতি করিতেছে। লোকটি হাসিয়া—কি বিকৃত মুখে জানি না—বলিল, "তুমি কি পাগল নাকি ?"

অরিন্দম বলিলেন, "এমন কথা পূর্ব্বে আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই, এই প্রথম তোমার মুখে শুনিলাম। সে কথা যাক্, এখন বল দেখি, কি মনে করে আজ আবার সন্ধ্যার পর বাহির হয়েছ ? কাল রাত্রেত একটাকে শেষ করেছ, আজ আবার কার বুকে ছুরি বসাবে, দাদা ?"

অপরিচিত বলিল, "তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছি না।"

অরিন্দম বলিলেন, "মনে মনে খুব বুঝ্‌তে পারছ ; এই যে এতবড় একটা খুন হয়ে গেল, তার কি কোন খবরই রাখ না ?"

সেই লোকটি বলিল, 'না, কিছু না, আমি এখানে থাকি না। তুমি কি গোয়েন্দা নাকি ?"

অরি। তা না হলে, তোমার পিছু লইব কেন ? আমি বেশ বল্‌তে পারি, তুমিই সেই মেয়েটিকে খুন করেছ।

অপরিচিত। আমি কিছুই জানি না।

অরি। তুমিই না কাল রাত্রে একবার বলাই মণ্ডলের দোকানে আবির্ভূত হয়েছিলে?

অপ। না, আমি বলাই মণ্ডল নামে কাকেও জানি না।

অ। জান বই কি, হয় ত এখন ভুলে গেছ। বলাই মণ্ডল মিথ্যা কথা বল্‌বার লোক নয়, তার মুখেই আমি তোমার কথা শুনেছি।

অপ। সে কি তোমার কাছে আমার নাম করেছিল?

অ। নাম না বল্‌লেও, তোমার মুখখানি দেখে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমিই স্বয়ং সেই মহাপুরুষ।

অপ। মিথ্যা কথা। তবে আমি এ খুনের কিছু কিছু জানি বটে। তুমি কি এখন সেই বালিকার মৃতদেহের সন্ধান কর্‌ছো নাকি? তা হলে আমি তোমার কিছু উপকার কর্‌তে পারি।

অ। তা হলে বাধিত হব।

অপ। মৃতদেহ বাহির কর্‌তে পার্‌লে তুমি বেশি রকমের একটা পুরস্কার পেতে পার, এমন একটা সম্ভাবনা আছে কি?

অ। আছে বই কি, তা না হলে আর সেই সকাল থেকে এখনও অবধি ঘুরে ঘুরে বেড়াব কেন, বল?

অপ। আমি যদি সেই মৃতদেহ বার করে দিই, তা হলে কিছু বখ্‌রা দিতে পার?

অ। তোমার দ্বারা যদি এত বড় একটি মহৎ কাজ হয়, তা হলে তা আর দিব না? তখনই।

অপ। আমি কাল রাত দুটার পর ঐ দীঘীর ধার দিয়ে যখন আসি, ঐ পশ্চিম দিক্‌কার একটা জঙ্গলের ভিতর একটা বালিকার মৃতদেহ দেখেছি। আমার সঙ্গে গেলে দেখাতে পারি।

অ। এখনও এ কথা গোপন ক'রে রেখেছিলে কেন?

অপ। সাধ করে কে পুলিসের হাঙ্গামে পড়ে বল? এখন আমার সঙ্গে যাবে কি?

অরিন্দম একবার কি ভাবিলেন। বলিলেন, "চল, যাইব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মল্লযুদ্ধ।

সেই অপরিচিত লোকটি অরিন্দমকে লইয়া চলিল; উভয়েই নীরব; তিন চারিটা বড় বড় জলাভূমি পার হইয়া চলিল। অবশেষে এমন এক স্থানে উভয়ে আসিয়া পড়িল যে, সেখান হইতে লোকালয়ের চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রে—রাত্রের কথা দূরে থাকুক্, কেহ কাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে, এমন কি সেখানে প্রশস্ত দিবালোকে, সে নির্ব্বিঘ্নে সে কাজ শেষ করিতে পারে।

সেই অপরিচিত ব্যক্তি সেইখানে আসিয়া মৃতদেহ খুঁজিবার ভাণে নিকটস্থ একটি জঙ্গলের এদিক ওদিক দেখিয়া বলিল, "তাই ত, বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

অরিন্দম সে কথার কোন উত্তর করিলেন না।

অপরিচিত লোকটা আবার অরিন্দমকে শুনাইয়া বলিল, "তাই ত, বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

তখনও অরিন্দম নীরব।

অপরিচিত। কই, হে লাসটা যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

অরিন্দম। কোথা গেল?

অপ। কি করিয়া বলিব?

অ। তোমার মনের কথাটা কি ভেঙে বল দেখি?

অপ। তুমি কি মনে কর?

অ। আমি মনে করি, তুমি একটি ভয়ানক ধড়ীবাজ লোক। এর বেশি আর কি মনে করিতে পারি? এখন কি মনে করে আমাকে এখানে নিয়ে এলে, প্রকাশ করে বল দেখি?

অপ। এই যে প্রকাশ কর্‌ছি।

এই বলিয়া লোকটা একখানি দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া অরিন্দমের দিকে অগ্রসর হইল। অরিন্দম একান্ত ভয়ার্ত্তের ন্যায় কাতরকণ্ঠে দুই হাত তুলিয়া বলিল, "কর কি—কর কি—মের না—মের না—দোহাই তোমার—দোহাই তোমার।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "যদি তুমি আমার কথার ঠিক্ ঠিক্ জবাব দাও, আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

অরিন্দম বলিলেন, "বল, কি বলিতে হইবে।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "সকল কথাই বলিতে হইবে; তুমি কে? তোমার নাম কি? কোথায় থাক? কি কর? কেনই বা আমার পিছু নিয়েছ?

অরিন্দম বলিলেন, "আমি আবার কে? দেখ্‌ছ না, একটা লোক আর কি; নামটা বড় ভাল নয়, কৃতান্ত বাবু। থাকি খুনে লোকের সঙ্গে সঙ্গে; করিবার মধ্যে তোমাদের মতন বদমায়েস্‌দের ধরিয়া বেড়াই—আর তোমার যে পিছু নিয়েছি, সে কেবল তোমাকে ধরিবারই জন্য।"

অপ। কেন, আমি কি খুনী?

অ। সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? তা না হলে অতবড় একখানা ছুরি নিয়ে তুমি দিনরাত ঘুরে বেড়াও।

অপরিচিত ব্যক্তি আবার সেই ছুরি লইয়া অরিন্দমকে মারিতে গেল। অরিন্দম আবার সেইরূপ—যেন কত ভয় পাইয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন; অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া সে বারও পার পাইলেন। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "এখনও বল্ তুই কে? কোথায় থাকিস্?"

অরিন্দম বলিলেন, "বল্‌ছি—বল্‌ছি—ঐ যে অনেক দূরে একটি নারিকেল গাছ দেখ্‌ছো—তার পরে আরও দূরে আর একটি তালগাছ—ঐ যে জ্যোৎস্নার আলোকে বেশ দেখা যাচ্ছে।' এই বলিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া অরিন্দম অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সেখানে তালগাছ, কি, নারিকেল গাছ—কিছুই ছিল না।

অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে চাহিতে চাহিতে অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "কই, হে, কোথায় তোমার তালগাছ?"

অরিন্দম পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন সুবিধা বুঝিয়া আগে তাহার হাত হইতে সেই ছুরিখানা কাড়িয়া লইলেন, সেই সঙ্গে তাহার পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া এমন এক ধাক্কা দিলেন; সে ধাক্কা তাহাকে আর সাম্‌লাইতে হইল না, সশব্দে সেইখানে পড়িয়া গেল। তাহার পর অরিন্দম তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন। লোকটা জোর করিতে লাগিল। অরিন্দম তাহার গলাটি বামহাতে চাপিয়া ধরিতে, সে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। লোকটি একটু অবসন্ন হইয়া আসিতে গলাটি ছাড়িয়া দিয়া অরিন্দম বলিলেন, "কি গো, বড় যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলে? এখন কি করি বল দেখি, তোমায় ছেড়ে দিব? না; তোমার প্রাণটা এইখানকার বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যাব?"

অপরিচিত লোকটি কোনও উত্তর করিল না।

অরিন্দম বলিলেন, "না তোমার মত একটি এত বড় কাৎলা কে যে কালে ছিপে গেঁথেছি, তখন হঠাৎ তুলে ফেলা হবে না—ভাল করে না

খেলিয়ে তুল্‌লে হাতের সুখ হবে না।" তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "মনে করো না এখন ছাড়িয়া দিলাম বলিয়া, তুমি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইলে; যখনই মনে করিব, তখনই আবার তোমাকে ধরিব। কোন একটু আবশ্যক ছিল বলিয়াই তোমাকে এতটা বিরক্ত করিলাম। আবার যখন কোনও আবশ্যক বোধ করিব, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করিব। যাও, এখন কথা না কহিয়া, এই সোজা পথটি ধরিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর; নতুবা তোমার ছুরি তোমারই বুকে বসাতে কুণ্ঠিত হব না।"

অপরিচিত ব্যক্তি মাথা হেঁট্ করিয়া, কথাটি মাত্র না কহিয়া তথা হইতে খুব একটি নিরীহ ভাল মানুষের মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ছদ্মবেশে।

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর অরিন্দম বৃদ্ধবেশে যদুনাথ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন।

নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণে অরিন্দমের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এমন কি তিনি যখন যে কোন প্রকার ছদ্মবেশে বাহির হইতেন, কোন পরিচিত ব্যক্তিও তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। অনেক সময় পুলিসের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র বাবুও ভ্রমে পড়িতেন। অরিন্দমের বয়স চল্লিসের নিকটবর্ত্তী। অনেক রকমের ছদ্মবেশ ধরিতে হয় বলিয়া, তিনি প্রত্যহ প্রাতে নিজ হস্তে নিজ শ্মশ্রুগুম্ফের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধন

করিয়া থাকেন। যদুনাথ গোস্বামীর সহিত অরিন্দমের সহজেই দেখা হইল। তখন যদুনাথ গোস্বামী আহারাদি শেষে বাহিরের ঘরে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ ও ধূমপানে ব্রত ছিলেন। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন, একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে সম্মুখীন দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন।

ছদ্মবেশী অরিন্দম বলিলেন, "মশাই বল্‌তে পারেন, এখানে যদুনাথ গোস্বামী কোথায় থাকেন?"

যদুনাথ বলিলেন, "আমার নাম? কি হয়েছে বলুন দেখি? কোথা থেকে আপনি আস্‌ছেন?"

অরিন্দম বলিলেন, "অনেক দূর থেকে আস্‌ছি, আপনারই এক শিষ্যের বাড়ী থেকে। উঃ! বড় গরম! কি রোদ দেখেছেন! উঃ! বড় সুখবর, তিনি শিব-প্রতিষ্ঠা কর্‌বেন, বড়লোক, একবারে কল্পতরু হবেন; বিশেষতঃ আপনি তাঁর গুরু, আপনার পাথরে পাঁচ কীল! উঃ, কি গরম—প্রাণ যে যায়।"

যদুনাথ অপেক্ষাকৃত আকৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "কে তিনি? আমার ত সকল শিষ্যই বড়লোক।"

অরিন্দম কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বল্‌ছি—বড় গরম! উঃ! একটু জল; পিপাসায় বুক থেকে গলাটা অবধি শুকিয়ে উঠেছে।"

ঘরটির দুইটি দ্বার, একটি বাহিরের দিকে, অপরটি ভিতরে দিকে। শেষোক্ত দ্বার দিয়া যদুনাথ গোস্বামী জল আনিতে বাড়ীর ভিতর গেলেন। সেই দিকে আরও একটি গবাক্ষ ছিল; অরিন্দম দেখিলেন, সেই গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ মুখে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—যাহাকে পূর্ব্বদিন একবার বাটীর পশ্চাদ্ভাগের গবাক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলেন। অরিন্দমকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আর তথায় দাঁড়াইল না।

কিয়ৎপরে যদুনাথ গোস্বামী জল লইয়া আসিলেন। অরিন্দমের হাতে দিলেন। অরিন্দম এক নিশ্বাসে যতটুকু পারিলেন পান করিলেন।

যদুনাথ গোস্বামী সেইরূপ আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নিকট হইতে আপনি আসিতেছেন?"

অরিন্দম হাঁফ্ ছাড়িয়া বলিলেন, "বল্ছি হে বল্ছি, ব্যস্ত হয়ো না। উঃ! বড় কষ্ট হচ্ছে। উঃ, সমস্ত শরীরটা কেমনই করছে; মাথাটা যেন ঘুরছে, চোখে এমন ঝাপ্সা দেখছি কেন? সর্দ্দিগর্ম্মীর লক্ষণ নয় ত? পাখা। পাখা নাই? একি হল! প্রাণটা যেন বার হবার জন্য আই চাই করছে, বড় ভাল বুঝ্ছি না, গোঁসাই ঠাকুর। জল, জল— আবার জল! বড় পিপাসা—উঃ গেলেম যে!" বলিতে বলিতে অরিন্দম সেইখানে শুইয়া পড়িলেন; মাটিতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। এবং এপাস ওপাস করিতে লাগিলেন—উঠিতে পড়িতে লাগিলেন—শেষে নিঃসংজ্ঞ—মৃতবৎ। ব্যাপার দেখিয়া যদুনাথের ভয় হইল, ভয়ে মুখ শুখাইল এবং কি করিবে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া আপনার ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী আসিলে তাহাকে পাখার বাতাস করিতে বলিয়া নিজে কবিরাজের বাড়ীতে ছুটিলেন। কবিরাজের বাড়ী নিকটে নহে।

সহসা একি বিপদ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শুশ্রূষা।

অরিন্দম তখন অনেকটা সুবিধা বোধ করিলেন। যে উদ্দেশে তিনি ভাণ করিয়া মৃতবৎ মাটিতে পড়িয়া ছিলেন, এখন তাহা সহজেই সফল করিতে পারিবেন বলিয়া আশা হইল। তিনি তখন ক্ষীণকণ্ঠে আবার জল চাহিলেন। ব্রাহ্মণী জল আনিতে উঠিলে অরিন্দম কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি বসুন, যেমন বাতাস করিতেছেন, করুন। আমার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন রিম্ ঝিম্ কর্‌ছে। মা! আপনি আমার আর জন্মে মা ছিলেন, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা কর্‌লেন।"

স্ত্রীলোকের মন নরম কথায় সহজেই ভিজে। তখন ব্রাহ্মণী সেই খানে বসিয়া আরও জোরে বাতাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে আবার কিছুক্ষণ কাটিল। অরিন্দম আবার জল চাহিলেন। তখন ব্রাহ্মণী আর একজনকে ডাকিয়া, তাহার হাতে পাখা দিয়া, বাতাস করিতে বলিয়া নিজে জল আনিতে গেলেন।

যে এখন পাখা লইয়া বসিল, অরিন্দম দেখিলেন, এ সেই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী। দেখিয়া চিনিলেন, তিনি দুইবার ইহাকে বাতায়নে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ছিলেন। অতিমৃদুস্বরে বলিলেন, "গোঁসাই মহাশয় তোমার কে হন্?"

সে কোন উত্তর করিল না। পূর্ব্ববৎ বাতাস করিতে লাগিল।

অরিন্দম পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর করিলেন,

"বোধ হয় কেহই না—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তোমার কেহ নহেন। আমি তোমার বিষয় কিছু কিছু জানি।"

শুনিয়া ব্যজনকারিণী সুন্দরীর ভয় হইল। সে পাখা ফেলিয়া, উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অরিন্দম বলিলেন, "ভয় নাই—আমি তোমার শত্রু নই, আমার কাছে কোন কথা গোপন করিয়ো না। তোমার উপর আবার এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। শীঘ্রই তুমি এমন বিপদে পড়িবে যে, তাহা হইতে তখন আর উদ্ধারের আশামাত্র থাকিবে না।"

ব্যজনকারিণী কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আবার বসিল।

অরিন্দম বলিলেন, "তুমি গোরাচাঁদ বলিয়া কাহাকেও চেন কি? আমার কাছে লুকাইয়ো না।"

গোরাচাঁদের নাম শুনিয়া সেই নবীনার মুখ শুখাইল, আবার সে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অরিন্দম বলিলেন, "বসো, আমার দ্বারা তোমার উপকার ভিন্ন কোন অপকার হইবে না, নিশ্চয় জানিয়ো। আমার কাছে লুকাইয়ো না—তাহা হইলে তুমি ভাল কাজ করিবে না? আমাকে বিশ্বাস কর। গোরাচাঁদকে তুমি চেন কি?"

নবীনা বলিল, "চিনি।"

অরিন্দম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশবচন্দ্র নামে কোন জমীদারকে চেন?"

নবীনার শুষ্ক মুখ আরও শুখাইল। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "তাহাকেও চিনি।"

অরিন্দম বলিলেন, "তুমি শীঘ্রই আবার তাহাদিগের হাতে পড়িবে। তোমার গোস্বামী মশাই এই ষড়যন্ত্রে আছেন; গোরাচাঁদ নামে লোকটা কাল সন্ধ্যার পর এখানে এসে গোঁসাই মহাশয়ের সঙ্গে গোপনে পরা-

মর্শ করে গেছে; আজ রাত্রেই তোমাকে আবার তাহাদিগের হাতে পড়িতে হইবে। এই পত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।" একখানি পত্র বাহির করিয়া নবীনার হাতে দিলেন। পত্রখানি এইরূপ ;—

"মহাশয়,

যদিও আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, কিন্তু গোরাচাঁদের মুখে আপনার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে একজন মহৎব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি। শুনিলাম, রেবতীর কাকা গোপাল চন্দ্র বসু আপনার হস্তে রেবতীকে সমর্পণ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। রেবতীর নাকি এ বিবাহে মত নাই, সেই জন্য তিনি এই শুভবিবাহ যাহাতে গোপনে সম্পন্ন হয়, সে জন্য রেবতীকে আপনার বাগান-বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তথা হইতে আপনার অসাক্ষাতে রেবতী পলাইয়া আসিয়াছে। বেশি বয়স অবধি মেয়েদের অবিবাহিত রাখাই এই সকল গোলযোগের একমাত্র কারণ। সেই জন্য আমাদিগের শাস্ত্রে মেয়েদের যত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পার, ততই মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ আছে। বেশি বয়স হলে মেয়েরা নিজে নিজে পছন্দ করিতে শিখে, পাত্রাপাত্র বুঝে না। আপনার সম্বন্ধে রেবতী অনেক মিথ্যাকথা আমাকে বলিয়াছিল, আমি সে সকল বিশ্বাস করিতে পারি নাই। যাই হোক যাহাতে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহাতে আমিও ইচ্ছুক। আর গোরাচাঁদের মুখে আপনার যেরূপ বিষয়-ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিলাম, তাহাতে রেবতীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। রেবতী এখন আমার কাছে আছে, গোরাচাঁদ আড়াই শত টাকা দিয়া রেবতীকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু, এ সকল বিবাহের কাজে ত গুরু-বরণ ইত্যাদিতে দুই-চারিশত টাকা আমার পাবারই কথা, তা ছাড়া আমি যে রেবতীকে সন্ধান করিয়া ধরিয়া রাখিলাম, তাহার জন্য আপনার মত

জমীদারের নিকট কি আর কিছু আশা করিতে পারি না? আপনি পত্র প্রাপ্তে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা গোরাচাঁদের হাতে পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাহার সহিত তখনই রেবতীকে পাঠাইয়া দিব। ইতি.

আশীর্ব্বাদক

শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।”

পাঠক মহাশয়কে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না এই রেবতীই যে. জীবন পালের বাগান হইতে মোহিনীর সহায়তায় দুর্বৃত্ত কেশবচন্দ্রের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, সেইদিন রাত্রে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া গোঁসাই পাড়ার পথ জানিতে বলাই মণ্ডলের দোকানে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং ইহারই রক্তাক্ত বস্ত্রাদি দেখিয়া পরদিন গ্রামমধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। যে ব্যক্তি সেইদিন রাত্রেই রেবতী চলিয়া আসিলে অল্পক্ষণ পরেই বলাই মণ্ডলের দোকানে গিয়া বালিকার সন্ধান করিয়াছিল, এবং পরদিন রাত্রে অরিন্দমকে জনমানবশূন্য প্রান্তরের মধ্যে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, সে সেই কেশবচন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুচর—সেই গোরাচাঁদ ব্যতীত আর কেহই নহে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রেবতীর সন্দেহ।

পত্র পড়িয়া রেবতীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ অবশ করিয়া যেন সমস্ত শোণিত হৃদপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া গুরুভারে বুকটা বড় ভারী করিয়া তুলিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "আমি যে কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

অরিন্দম বলিলেন, "যদুনাথ গোস্বামীর হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই বিশ্বাস করিতে পারিবে।"

রে। আমি তাঁহার হস্তাক্ষর জানি।

অ। একি তার হাতের লেখা নয়?

রে। তাঁহারই হাতের লেখা, এ সইও তাঁহার। গোঁসাই ঠাকুর আমাদের গুরু হন, আবশ্যকমত আমাদের বাড়ীতে পত্রাদি পাঠাইতেন; তাহাতেই আমি তাহার হাতের লেখা ও সই অনেক বার দেখিয়াছি। দেখিলেই বেশ চিনিতে পারি। আপনি এ পত্র কোথায় পাইলেন?

অ। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার, কোন কথা গোপন করিয়ো না, তুমি কে, কোথায় তোমার বাড়ী, পিতা মাতার নাম কি; কেশব বাবু কে, গোরাচাঁদ কে, তোমার এ অবস্থান্তরের কারণ কি, তুমি যাহা জান, সমস্তই অকপটে আমাকে বল, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।

রেবতী বলিল, "আপনি এ পত্রখানি কোথায় পাইলেন?"

অরিন্দম বলিলেন, "কাল রাত্রে গোঁসাই ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করিয়া যখন পত্রখানি লইয়া গোরাচাঁদ বাহির হয়, তখন আমি এই পত্রখানি হস্তগত কর্‌বার জন্য, তার অনুসরণ করি। পথে দুই একটি কথায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়া তোমার কথা তুলি, তোমার মৃতদেহ দেখাইবে বলিয়া সে আমাকে একটি নির্জ্জন প্রান্তরে লইয়া গিয়া, হত্যা করিবে মনে করিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলে। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার সঙ্গে যাই। সেখানে সেই নির্জ্জনে আমাকে একা পাইয়া, সে যেমন আমাকে ছুরি মারিতে আসে, আমি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসি, সেই সময়েই আমি তাহার অজ্ঞাতসারে এই পত্রখানি হস্তগত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।"

রেবতী সন্দিগ্ধমনে বলিলেন, "বুঝিতে পারিতেছি না, আপনার মনের অভিপ্রায় কি? কেনই বা আপনি এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন?"

অ। আমি একজন পুলিস কর্ম্মচারী। তোমার বিপদের কথা আমি অনুমানে কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। যে সঙ্কল্প করিয়া আমি এ কাজে হাত দিয়াছি, তোমাকে এখন এই উপস্থিত বিপদের মুখ হইতে দূরে রাখিতে পারিলে, তাহা অনেকটা সফল হইবে।

রেবতীর মনের অবস্থা তখন কিরূপ, তাহা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। অবিশ্বাস এবং সংশয়, ভয় এবং বিস্ময়, উৎকণ্ঠা এবং হতাশা, এবং ঘোরতর সন্দেহ এই সকল একত্রে মিলিয়া তাহার দুর্ব্বল হৃদয়কে মথিত করিতেছিল। রেবতী অস্থিরচিত্তে বলিল, "আপনি যদি পুলিস-কর্ম্মচারী, তবে গোরাচাঁদকে ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিলেন কেন?"

অরিন্দম বলিলেন, "ছাড়িয়া দিয়াছি বটে, যখনই মনে করিব,

তখনই আবার ধরিব; তাহার মুখখানি যখন চিনিয়া লইতে পারিয়াছি, সে তখন ধরা পড়িয়াই আছে। শীঘ্র শীঘ্র একটি লোককে গ্রেপ্তার করাও আমার অভ্যাস নহে। তাহাতে শীঘ্র পাপী ধৃত হয় বটে, শীঘ্র বিচারে তাহার যাহা হয় একটি দণ্ডও হয়; সে দণ্ড অনেক স্থলে কোথায় লঘুপাপে গুরু—কোথায় গুরু পাপে লঘু। যাহাকে বন্দী করিয়া বিচারালয়ে দিতে হবে, তাহার যাহা কিছু জানিবার সমস্তটুকু যতক্ষণ না জানিতে পারি, যেমন নিজের পাপের কথা, নিজের স্বভাব চরিত্রের কথা সে নিজে জানে, আমিও সেই সকল ঠিক তারই মতন সম্পূর্ণরূপে না জানিতে পারি, ততক্ষণ তাহাকে আমি গ্রেপ্তার করি না। বুঝিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ। এখনও বলিতেছি, ইহাতে তোমার ভাল হইবে না। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার, কোন কথা আমার কাছে গোপন করিয়ো না। তুমি কে, তোমাদের বাড়ী কোথায়, তোমার পিতার নাম কি, তোমার এই দুরবস্থার কারণই বা কি, এ সকল তুমি যাহা জানো, সমস্তই আমাকে অকপটে বল; আমি বারবার বলিতেছি, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রেবতীর আত্মকাহিনী।

রেবতী বলিতে লাগিল, "আমাদের বাড়ী বেণিমাধব পুর; আমার পিতার নাম জানকী নাথ বসু। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। আমার আর একটী ছোট বোন আছে, তার নাম রোহিণী; আমরা দুই বোনে কাকার নিকট থাকিতাম। কাকার নাম গোপাল চন্দ্র বসু। কাকাবাবুর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। শুনিয়াছি, তিনি একবার বাবার সঙ্গে মাম্‌লা-মোকদ্দমা করিয়া নিজের বিষয়ের সমস্ত অংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন। তখন বাবা আবার তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের জমীদারী হইতে চারি আনা অংশ দান করেন। তখন থেকে বাবার সঙ্গে কাকা বাবুর যে মন-মালিন্য ছিল তাহা ঘুচিয়া যায়। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আজ দুই বৎসর কাল কাকাবাবু সমস্ত জমীদারীর কাজ-কর্ম্ম নিজেই দেখিয়া আসিতেছেন। সন্তানাদি না থাকায় কাকা আর কাকিমা আমাদিগকে পিতামাতার অধিক স্নেহ করেন। না জানি, আমার জন্য কাকা মহাশয় কি কাণ্ডই না করিতেছেন। আপনি আমাকে কোন রকমে কাকাবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট উপকার করিবেন।"

অরিন্দম বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে—এখন তোমার এ দুরবস্থার কারণ কি বল দেখি? যদি কোন প্রতিকার করিতে পারি।"

রেবতী বলিতে লাগিল, "ইদানীং কেশবচন্দ্র নামে একটি লোক কাকাবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা-সাক্ষাৎ করিত। আগে তাহাকে কখনও দেখি নাই। লোকটা বড় মিষ্টভাষী, কাকাবাবুর সঙ্গে তাহার এমন ঘনিষ্টতা হইল যে, কোন দিন তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে, কাকাবাবু তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন। আসিলে, কখন তাহার সঙ্গে গল্প করিতেন, কখন দাবা খেলিতেন, কখন বা বেড়াইতে বাহির হইতেন। যদি কোন দিন কেশবচন্দ্র না আসিত, সে দিন কাকাবাবুকে বড়ই বিমর্ষ থাকিতে দেখিতাম। কেশবচন্দ্রও আমাদিগকে কাকাবাবুর মত স্নেহ দেখাইত; কিন্তু সে মানুষ নয়, পিশাচ—তার মনের ভাব অন্য রকমের। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল, কি জানি কি ঔষধের সাহায্যে আমাকে অজ্ঞান করিয়া, চুরি করিয়া লইয়া আসে। যখন আমার প্রথম জ্ঞান হইল, তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাথার ভিতরে বড় যন্ত্রণা হইতেছিল; সমস্ত শরীরটা যেন কেমন এক রকম অবশ হইয়া গিয়াছিল, এমন কি ভাল করিয়া চোখ চাহিতেও তখন কষ্ট বোধ হইতেছিল। দেখিলাম, আমি নৌকার উপর রহিয়াছি। নৌকাখানা গঙ্গার একদিককার কিনারায় লাগানো রহিয়াছে। সে দিকটা ভয়ানক বন; তেমন বন কখনও আমি দেখি নাই। নৌকার উপর কেশবচন্দ্র, আর চারি পাঁচ জন দাঁড়ি-মাঝি; তাহারা তামাক খাইতেছে, আর কি বলাবলি করিতেছে। তখন যেন আমার সমস্তই স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাথাটা আরও ভারি হইয়া উঠিল। তটে একটা লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে, সেই গোরাচাঁদ। তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। সে বলিল, "ইহাকেও লইয়া যাইব কি? ইহার যে জ্ঞান হইয়াছে, দেখিতেছি।" তাহার কর্কশকণ্ঠ আমার অবশ কর্ণে আরও

কর্কশ শুনাইল; আমার বড় ভয় হইল—বিশেষতঃ তাহার দস্যুর মত বিকট চেহারা দেখিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না, বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, কাঁদিতে গিয়া বুকে বড় ব্যাথা লাগিল, কাঁদিতে পারিলাম না। তখন কেশবচন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার নাকেরকাছে একখানা রুমাল চাপিয়া ধরিল, মাথায় যেন একটা বজ্র আসিয়া পড়িল; আবার আমি অজ্ঞান হইলাম। তাহার পর আবার যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, সে গঙ্গা নাই, সে বন নাই, নৌকা নাই, দাঁড়ী মাঝি কেহ নাই। আমি একটা নিবিড় বনের মাঝখানে দুর্গন্ধ, আবর্জ্জনাপূর্ণ একটা ঘরে একাকী পড়িয়া আছি। ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ; বাহির হইবার আর কোন উপায় নাই। তাহার পর কেশবচন্দ্র প্রত্যহ এক এক বার আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে লাগিল। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য যে, সে এই কাজ করিয়াছে, একদিন সে প্রকাশ করিল; আমি কিছুতেই সে পাপিষ্ঠের কথায় স্বীকৃত হইতে পারিলাম না। সেজন্য আমাকে পিশাচ কত ভয় দেখাইত, কখনও বা ছুরি লইয়া কাটিতে আসিত—আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলাম না—কিছুতেই সম্মত হইলাম না। তেমন পাপিষ্ঠের স্ত্রী হইয়া আজন্ম মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা, তাহার শাণিত ছুরির মুহূর্ত্তের মৃত্যু শ্রেয় বোধ করিলাম। গোরাচাঁদের উপর আমার রক্ষার ভার ছিল, সে সেই নরপ্রেতের বিশ্বস্ত অনুচর! শেষে একটা স্ত্রীলোক আমাকে উদ্ধার করে। শুনিলাম, সে কেশবচন্দ্রের স্ত্রী; সেই আমাবে এখানে আসিবার পথ দেখাইয়া দেয়। একটা বড় প্রান্তর পার হইয়া আমি এই গ্রামে আসি, তখন ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। এখানকার গোঁসাই পাড়ায় আমাদিগের গুরু যদুনাথ গোস্বামীর

নিকট যাইব মনে করিয়া, এখানকার একটি মুদীর দোকানে গোঁসাই পাড়ার পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লই। সেখানে আরও অনেক লোক বসিয়া তাস খেলিতেছিল, তাহারা আমায় একটা দীঘীর ধার দিয়া যাইতে বলিল। আমি আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন দীঘীর ধার দিয়া যাইতেছি, তখন পশ্চাদ্দিকে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আগে বন ছাড়িয়া যখন প্রান্তরে পড়ি, তখন একবার গোরাচাঁদকে পথে আমার অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি তখন একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া পড়ি, সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, সে আর একদিকে চলিয়া গেল। আমি প্রান্তরের মাঝখান দিয়া, সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া এই গ্রামে আসিয়া পড়িলাম; দীঘীর ধারে আসিয়া যে পদশব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা তখন গোরাচাঁদের বলিয়াই বোধ হইয়াছিল বলিয়া আরও ভয় হইল। আমি তখন প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম; এমন সময় আমার আঁচল খানায় টান পড়িল, আবার গোরাচাঁদের হাতে পড়িলাম ভাবিয়া, আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, মাটিতে পড়িয়া গেলাম, এমন সময় কে আসিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিল। বিদ্যুতের আলোকে তাঁহাকে চিনিলাম, তিনিই যদুনাথ গোস্বামী, ভরসা হইল। দেখিলাম, কেহই আমার আঁচল ধরে নাই, একটা কাঁটাগাছে আঁচলখানা জড়াইয়া গিয়াছিল, যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহা গোস্বামী মহাশয়েরই। পড়িয়া গিয়া কপালের এক স্থান কাটিয়া গিয়াছিল; ক্ষতমুখ দিয়া অজস্রধারে রক্ত বহিতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়কে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম, দুই তিন দিনের জন্য আমাকে তাঁহার নিকট লুকাইয়া রাখিবার জন্য অনুনয় করিলাম, তিনি স্বীকৃত হইয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া চলিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম তিনি গোঁসাই পাড়ায় আজ কাল থাকেন না; সে বাড়ী তাঁহার

ভগ্নীকে থাকিতে দিয়া নিজে এখন এইখানে থাকেন। আমাকে এই-থানে লইয়া আসিলেন। যাহাতে আর কেহ আমার সন্ধান করিতে না পারে, যাহাতে আমাকে খুন করিয়াছে বলিয়া লোকের মনে একটা ধারণা হয়, সেই জন্য আমার রক্তমাখা কাপড়, একখানা বড় ছুরি, আর দুই তিনটা মাথার কাঁটা লইয়া গোস্বামী মহাশয়, যেখানে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, সেইখানের একটা জঙ্গলে রাখিয়া আসিলেন। শুনিলাম, ফিরে আসিবার সময় এখানকার দুই একজন লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হইয়াছিল; তাহারাও নাকি আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। যাই হোক, গোস্বামী মহাশয় যে আমাকে আবার সামান্য টাকার লোভে আবার সেই বিপদের মুখে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, ইহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়। যখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন, তখন উনি তাঁহার নিকট কত বিষয়ে কত টাকা পাইয়াছেন, সে সকল কি একবারও এখন মনে পড়িল না? এ সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই।" বলিতে বলিতে রেবতীর ফুল্লেন্দীবরতুল্য সেই বড় বড় চক্ষুদুটি সজল হইল, হিমনিষিক্তপদ্মবৎ সে চক্ষু দুটি পরম শোভময়, দুই চক্ষে দুইটি বড় বড় অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। আবার ভাবনার অপার সমুদ্রে পড়িয়া, রেবতী আকুল হইয়া উঠিল। রেবতী আর কথা কহিতে পারিল না, রেবতীর বুক কাঁপিতে লাগিল; রেবতী চোখে দেখিতে পাইল না, রেবতী নীরবে সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রেবতীর কথা শুনিয়া অরিন্দম নিজের সন্দেহের সহিত অনেকগুলি বিষয় মিলাইয়া পাইলেন। যেখানে রেবতীর রক্তাক্ত কাপড় ইত্যাদি পড়িয়াছিল, সেই জঙ্গলমধ্যে যদুনাথের দুইবার যাতায়াতের পদচিহ্ন পড়িবার কারণও বুঝিলেন। একবার সেই রক্তাক্ত কাপড় ইত্যাদি রাখিতে গিয়াছিলেন, আর একবার বলাই মণ্ডল ও তাহার

সঙ্গীগণকে সেই সকল দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। অরিন্দম রেবতীকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে আর কোন কথা তুমি জান?"

রেবতী চোখ মুছিয়া বলিল, "না, আপনি এখন দয়া করিয়া এ বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন; আবার যদি সেই পাপিষ্ঠের হাতে পড়ি, তাহা হইলে আর বাঁচিব না। আপনি আমার কাকার কাছে আমায় রাখিয়া আসুন।"

অরিন্দম সে কথায় কোন কথা না কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বয়সেও তোমার বিবাহ হয় নাই কেন? এখন বোধ করি তোমার বয়স পনেরো বৎসরের কম নহে।"

রেবতী লজ্জিতভাবে বলিলেন, "বাবা বাঁচিয়া থাকিলে এতদিন তিনি আমার বিবাহ দিতেন। যখন আমি বারো বৎসরে পড়িয়াছি, তখন বাবা কলিকাতা সহরের দক্ষিণে ভবানীপুরে আমার বিবাহ দিবার জন্য ঠিক্ ঠাক্ করিয়া ছিলেন। তাহার পর হঠাৎ তাহার শরীর ভাঙিতে আরম্ভ হয়। কি এক উৎকট পীড়ায় হঠাৎ তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন; কোন ডাক্তার, কি কবিরাজ কেহই সে রোগ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাবা প্রায় ছয় মাস কাল শয্যাশায়ী থাকিয়া ক্রমে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। কি রোগ কেহ ঠিক করিতে পারিল না, কাজেই চিকিৎসায়ও তেমন হইল না। বাবা অসময়ে আমাদের ছাড়িয়া গেলেন।"

অ। তোমার কাকাবাবু তোমার বিবাহে এতদিন উদাসীন ছিলেন কেন?

রে। তিনি জমীদারী কাজকর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এমন কি স্নানাহারের সময় পাইতেন না।

অ। এই বলিলে তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা গল্প করিতেন, দাবা খেলিতেন, তাস পিটিতেন—বেড়াইতে বাহির হইতেন, তোমার উপর তাঁহার যেরূপ স্নেহ, তোমার মুখে শুনিলাম, তাহাতে তিনি তোমার বিবাহের কোন বন্দোবস্ত না করিয়া তাস, দাবা, গল্প, বেড়ানো দূরে থাকুক, তিনি যে কেমন করিয়া স্নানাহার করিতেন, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, কাকাবাবু তোমায় এত অধিক পরিমাণে স্নেহ করিতেন, তোমাকে তিনি বিবাহ দিয়া, পরের ঘরে পাঠাইয়া, কেমন করিয়া প্রাণ ধরিবেন, সে বিষয়ে তাঁহার একটু সন্দেহ ছিল।

রেবতী তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না। অরিন্দম তখন রেবতীকে যাহা যাহা করিতে হইবে, সব বলিয়া দিলেন, যাহাতে এই চতুর্দ্দিক ব্যাপী বিপদের মুখ হইতে তাহাকে যে কৌশলে উদ্ধার করিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। আরও অনেকক্ষণ ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল, তাহাতে রেবতী অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিল। রেবতীর চক্ষু হইতে যেন আর একটা আবরণ সরিয়া গেল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সাফল্য।

বৃদ্ধকে তৃষ্ণাতুর মৃতপ্রায় দেখিয়া ব্রাহ্মণী যে সেই জল আনিতে গেলেন, এখনও ফিরিলেন না—কারণ কি? ব্রাহ্মণী যখন জল লইয়া আসিবেন, তখন রেবতী ও অরিন্দমকে পরস্পর কথোপকথন করিতে শুনিয়া, সে ঘরের ভিতর আর আসিলেন না; জলের ঘটী হাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা একান্ত নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে লাগিলেন, আর জলপূর্ণ ঘটীটি তাঁহার হাতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুরমহাশয় বাড়ীতে নাই, তিনি একাকী, কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। স্ত্রীলোকের মন বড় কৌতূহলপ্রিয়। কুতূহলী মন বলিল, আগে শোনা যাক্, তাহার পর যাহা করিতে হয় করা যাইবে; তার আগে যদি তিনি আসিয়া পড়েন, তিনিই যা হয় করিবেন। এখন শুনিই না—কি কথা হয়। ব্রাহ্মণী একমনে শুনিতে লাগিলেন। কতক শুনিতে পাইলেন, কতক বা না, আবার যাহা শুনিলেন, তাহার কতক বা বুঝিতে পারিলেন, কতক বা না।

তাহার পর যখন অতিমৃদুস্বরে তাঁহাদিগের পরামর্শ চলিতে লাগিল, যাহা আমরাও এখন জানিতে পারি নাই, তখন ব্রাহ্মণীর কাণে আর কিছুই আসিল না। কেবল জানালার ফাঁক্ দিয়া ব্রাহ্মণীর আগ্রহপূর্ণ চক্ষু এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে রেবতীর মুখের রকম রকম ভাব দেখিতে লাগিল। সেই সময়ে সেই সকল বিষয়ে তাঁহার মন এমনই আকৃষ্ট

হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাতের জলের ঘটীর কথা কিছুই মনে ছিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে সেটি হাত হইতে সশব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন অরিন্দম প্রস্থান করিবার জন্য উঠিয়াছেন ; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আর জল থাইব না।"

অনতিবিলম্বে যদুনাথ গোস্বামী কবিরাজ সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে কতক বা ঠিক্, কতক বা বেঠিক্ অনেক কথা শুনাইল। শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। কবিরাজ ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল। তখন গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রেবতীকে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, কে সে ? কেন আসিয়াছিল ? কোথায় থাকে ? কি বলিয়া গেল ? ইত্যাদি—ইত্যাদি॥

রেবতী একটি কথারও উত্তর করিল না।

* * * * * * *

সেই দিন অপরাহ্ণে আর এক কাণ্ড ঘটিল। রেবতীর মাতামহ (?) পুলিস-প্রহরী সঙ্গে লইয়া রেবতীকে লইতে যদুনাথ গোস্বামীর বাটীতে উপস্থিত ; রেবতী সেখানে আছে কি না যদুনাথ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি স্বীকার করিবেন, কি অস্বীকার করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই রেবতী ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সে তাহার বৃদ্ধ মাতামহকে চিনিল। তখনই পাল্‌কী ডাকাইয়া রেবতীকে তন্মধ্যে উঠাইয়া লওয়া হইল। অরিন্দম ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়েই তথায় উপস্থিত ছিলেন।

অরিন্দম যদুনাথ গোস্বামীকে বলিলেন, "কি গোস্বামী মহাশয়, পাঁচশত টাকা যে একেবারে ফাঁক্ হইয়া গেল। যাই হোক, রক্তমাখা কাপড়ের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে, যে মর্চ্চেধরা ছুরি খানা রাখিয়া আসিয়া-

ছিলেন, যখন অবসর হইবে, সেখানা থানায় গিয়া লইয়া আসিবেন ; অনর্থক আর কেন ঘর থেকে ছুরিখানা লোক্সান দিবেন ?

গোস্বামী মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, "আপনি একান্ত ভাল মানুষ, একটা খুব খেলাই খেলিলেন।"

ঠাকুর মহাশয় তথাপি কোন উত্তর করিলেন না।

সকলে চলিয়া গেল।

ঠাকুর মহাশয় কিসে কি ঘটিয়া গেল, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় খণ্ড

শোণিত-প্রবাহ

Moresco. Perished?
Alh. He had Perished!
Sleep on, poor babes! not one of you doth know
That he is fatherless—a desolate orphan!
Why should he make them? can an infant's arm
Revenge his murder?
One Moresco (to another) Did she say his murder?
Nao. Murder? Not murdered?

Coleridge—"*Remorse*" *Act IV, Scene III.*

দারোগা তখন দুইহাতে জুমেলিয়ার কিরিচ সমেত হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

২য় খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুলসম।

অরিন্দম নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যে হত্যাকারী সেই বালিকার লাস্ সিন্দুকমধ্যে পুরিয়া, থানায় পাঠাইয়া একটা অতি বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, যতক্ষণ না তাহাকে কোন রকমে ধরিতে পারিতেছেন, তিনি কিছুতেই নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবেন না। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যত ঘটনা ঘটিতেছে, সকলের সঙ্গেই সকলের যেন কিছু না কিছু সংস্রব আছে। সকলেই যেন এক শৃঙ্খলে গ্রথিত। তথাপি তিনি সেই সকলের মধ্যে এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িলেন যে, কিছুকালের জন্য তিনি কোন উপায় অবধারণে সমর্থ হইলেন না। যেখানে সন্দেহের একটু ছায়াপাত দেখিতেন, সেই খানেই যাইতেন, যতদূর সম্ভব সংবাদাদি সংগ্রহ করিতেন ; কিন্তু কাজে এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অরিন্দমের ন্যায় একজন নামজাদা পুলিস-কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কলঙ্কের কথা।

একদিন অপরাহ্নে তিনি দূর লোকনাথপুর গ্রামের মধ্য দিয়া বাটী ফিরিতেছেন। প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার আহারাদি হয় নাই। লোকনাথপুর তাঁহার বাসা-বাটী হইতে কিছুকম এক ক্রোশ। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। তখন পশ্চিম গগনে থাকিয়া কতকগুলি তরল নির্গলিতাম্বুগর্ভ শ্বেতাম্বুদখণ্ড অস্তগত-প্রায় রবির স্বর্ণোজ্জ্বলকিরণ-রঞ্জিত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, আরও সুন্দর দেখাইতেছিল তাহারই কোমলোজ্জ্বলচ্ছায়া বীচি-চঞ্চলবক্ষে ধরিয়া লোকনাথপুরের আম-জাম-নারিকেলবৃক্ষপরিবৃত স্বনামখ্যাত বিমলি* সরোবর। এ সকল ফেলিয়া চাহিয়া দেখিতে হয়, এমন এক অপূর্ব্ব শোভা তখন ঐ সরোবরের পশ্চিমঘাটে বিকশিত ছিল, যেখানে অনেকগুলি সৌন্দর্য্যসমুজ্জ্বলা স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়রূপিণী নবীনা, কেহ আকণ্ঠ-নিমজ্জিত, উপরে অতি সুন্দর মুখখানি, সদ্যপ্রোদ্ভিন্নপদ্মবৎ, তাহারই উপর একখণ্ড অতি সুন্দর হেমাভকিরণ। কেহ ডুবিয়াছে, কাল জলে, রাশীকৃত কাল কেশগুলি উপরে তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, সেখানে একখণ্ড অতি সুন্দর হেমাভকিরণ। যেখানে কেহ সাঁতার কাটিতেছে, কেহ ঢেউ দিতেছে, এবং কেহ জল ছিটাইতেছে, সেখানে সেই অতি সুন্দর হেমাভকিরণ খণ্ড খণ্ড, চঞ্চল, তথাপি অতি সুন্দর।

যখন সকলে যে যাহার কাজ সারিয়া একে একে উঠিয়া যাইতেছিল, অরিন্দম তখন সেই পুষ্করিণীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, সকলেই চলিয়া গেল, একজন গেল না; সে বসিয়া রহিল। তাহার রূপে সেখানটা আলো করিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার

* এইরূপ প্রবাদ, বিমলা নাম্নী কোন বৃদ্ধা ঐ পুষ্করিণীর তটে একখানি পর্ণকুটির বাঁধিয়া আমরণ বাস করিয়াছিল; সেই জন্য উহার এইরূপ অপূর্ব্ব নাম করণ। যখনকার কথা বলিতেছি তখন সে বিমলা ছিল না, এবং তাহার সেই পর্ণকুটিরেরও কোন চিহ্ন ছিল না। এখন সে পুষ্করিণীরও চিহ্নমাত্র নাই।

সে রূপের বর্ণনা হয় না। বুঝি, সেই ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরীই বিধাতার একমাত্র চরমোৎকৃষ্ট শিল্পচাতুর্য্য। এত অল্প বয়সে সর্ব্বাঙ্গে এমন পরিণত ভাব বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কি সেই স্নেহপ্রফুল্ল মুখখানি! কি সেই বিশালায়ত, ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, সেই চোখে পীযুষনিস্যন্দিনীদৃষ্টি! যেমন আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, তেমনি আকর্ণবিশ্রান্ত চিত্ররেখাবৎভ্রূযুগ, তেমনি চূর্ণকুন্তলাবৃত অর্দ্ধপ্রকাশিত ললাট; তেমনি সেই সুগঠিত নাসিকা, তেমনি অধর নির্ম্মল, স্ফুরিত রক্তাভ; ললিত, নির্ম্মল, আরক্ত সে কপোলদুটির কমনীয়তা চখে না দেখিলে, লিখিয়া কি বুঝানো যায়! সে চিবুক দেখিয়া কে না বলিবে, যাহা কখনও দেখি নাই, তাহা দেখিলাম? এযে পুষ্পপরাগসমাচ্ছন্ন নবনীর সমষ্টি! সংসর্পী, দীর্ঘ অথচ কুঞ্চিত, রাশীকৃত, সিক্ত কৃষ্ণকেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে কতক বা পৃষ্ঠে, কতক বা ঈষদুন্নত বক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই শশাঙ্করশ্মিরুচির বর্ণবিভার নিকট গোধূলীর উজ্জ্বলতম কাঞ্চনঘটাও ম্রিয়মান বোধ হইতেছিল। পাঠক! আপনি কি ভাদ্রের ভরা নদী কখন দেখেন নাই? যদি দেখিয়া থাকেন, বুঝিতে পারিবেন, এই বরবপুতে কেমন সে অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি সেইরূপ কূলে কূলে উছলিতেছিল, সীমাতিক্রম করে নাই। সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণায়ত পরিপুষ্ট প্রসৃত, সেই সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া অপরূপ রূপরাশি উচ্ছ্বসিত। সেই নির্জ্জনতার মধ্যে, গাছ পালার মধ্যে, গোধূলির কনকচ্ছায়ার মধ্যে, মৃদুমন্দ স্নিগ্ধসমীরণের মধ্যে, দিগদিগন্তপরিব্যাপ্ত ফুলগন্ধ মধ্যে থাকিয়া, ঘাটের শৈবালাচ্ছন্ন প্রস্তর-চাতালে বসিয়া সেই বনদেবীমূর্ত্তি চিত্রার্পিতপ্রায় ও নীরব।

যখন সেই সুন্দরী দেখিল, সেখানে সে ছাড়া আর কেহ নাই, তখন উঠিয়া তাড়াতাড়ি জলে নামিল এবং অধিক জলে গিয়া ডুবিল। অনেকক্ষণ গেল তথাপি উঠিল না। অরিন্দম দূরে থাকিয়া, দেখিয়া

বিস্মিত হইলেন, বড় কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই সরো-বরের পূর্ব্ব-পশ্চিম কোণে বটবৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইলেন ; মনে কেমন একটা সন্দেহ হওয়ায় তিনি সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তথাপি সেই লোকললামভূতা সুন্দরী উঠিল না। অরিন্দম চিন্তিত হইলেন, এত অধিকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকা মনুষ্যমাত্রেরই অসাধ্য। তিনি দেখিলেন, যেখানে সে ডুবিয়াছিল, তাহার আরও অনেকটা দূরে দুইখানি হাত একবার ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া যাইতেছে আবার কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে।

তখন অরিন্দমের বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি জলে নামিলেন। হাতদুখানি আবার ভাসিয়া উঠিতে, ধরিলে এবং নবীনাকে ঘাটে আনিয়া তুলিলেন। নবীনা যদিও সংজ্ঞাশূন্য হয় নাই, কিন্তু সে এত অবসন্ন হইয়াছিল যে, বসিতে পারিল না, ঘাটের চাতালের উপর শুইয়া পড়িল। এবং জল এত অধিক পরিমাণে তাহার উদরস্থ হইয়াছিল যে, কথা কহিতে পারিল না, এমন কি নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল, একটা নিশ্বাস একবার দুইবার তিনবারে টানিতে ছিল।

দেখিতে দেখিতে সেখানে গ্রামের অনেকগুলি লোক আসিয়া পড়িল। অরিন্দম তাহাদের মুখে শুনিলেন, সেই জলমগ্নাসুন্দরী সেই-খানকার বিখ্যাত ধনী তমীজউদ্দীনের কন্যা। নাম কুলসম। তাহারা সকলেই সেই তমীজউদ্দীনের প্রজা; তাহাদের সাহায্য পাইয়া অরিন্দম কিছু সুবিধা বোধ করিলেন ; কুলসমকে বারম্বার ঘুরাইয়া ও উঠা বসা করাইয়া তাহার উদরস্থ সমস্ত জল বমন করাইয়া ফেলিলেন। কুলসম অনেকটা সুস্থ হইল। একবার অরিন্দমের মুখপানে চাহিয়া মৃদু-নিক্ষিপ্তশ্বাসে বলিল, "কেন আপনি আমার জন্য এত করিলেন ? ভাল করিলেন না, আমার মরণই ভাল ছিল।"

অরিন্দম সে কথার কোন কথা কহিলেন না। যখন কুলসমের শারীরিক অবসন্নতা অনেকটা কমিয়া অসিল, তখন একদিক হইতে অরিন্দম, অপরদিক হইতে অপর একটি লোক কুলসমের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কুলসম তাহাদের সঙ্গে ধীরপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। বেশি দূরে নয়, সেইখানেই সেই সরোবরের পূর্ব্বপার্শ্বে তমীজউদ্দীনের প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন বিপদ।

অনতিবিলম্বে কুলসমকে লইয়া অরিন্দম ও প্রতিবেশীচতুষ্টয় তমীজউদ্দীনের বাটীতে উপস্থিত হইল। সে সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছা-ইতে বেশি বিলম্ব হইল না। দুই তিনজন ভৃত্য আসিয়া কুলসমকে লইয়া গেল। এমন সময়ে কুলসমের পিতা তমীজউদ্দীন সেখানে আসিলেন, তাঁহার পশ্চাতে তাহার স্ত্রীও আসিলেন। তমীজউদ্দীনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, তাঁহার দেহ জীর্ণশীর্ণ; জরাতুর অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার শরীর কটি হইতে ভাঙিয়া সমুখের দিকে অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চলিয়া আসিবার সময় মাতালের মত তাহার পা টলিতেছিল।

কম্পিতকণ্ঠে তমীজউদ্দীন, অরিন্দমের দিকে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার কন্যাকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনি যদি না দেখিতেন, তাহা হইলে যে আজ আমার——"বলিতে বলিতে, বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া সহসা ঘড়্ঘড়ী উঠিল,

আবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, এবং আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া অরিন্দম ধরিয়া ফেলিলেন। দুই হস্তে তাঁহাকে তুলিয়া বহির্ব্বাটীর একটি প্রশস্ত কক্ষে শয়ন করাইয়া দিলেন।

সশঙ্কচিত্তে আর সকলে সেইস্থলে প্রবেশ করিল। অরিন্দম দেখিলেন, ইতোমধ্যেই তমীজউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে।

তমীজউদ্দীনের স্ত্রীর নাম মতিবিবি ; তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প—পঞ্চবিংশতির বেশি নয়, বরং তাঁহাকে আরও ছোট দেখায়। মতিবিবি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চুল ছিঁড়িয়া, হাত পা আছড়াইয়া, বুক চাপড়াইয়া, ডাক ছাড়িয়া উঠানে কাঁদিতে বসিলেন।

অরিন্দম একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে কোন্ ডাক্তার চিকিৎসা করেন ?"

তাহার নাম আমেদ। অমেদ বলিল, "ফুল সাহেব।"

অরিন্দম বলিলেন, "এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

ছুটিয়া আমেদ চলিয়া গেল। অরিন্দম তমীজউদ্দীনের দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে করিতে লাগিলেন, হয় ত তমীজউদ্দীন জীবিত আছেন, বোধ হয় এ এক প্রকার মৃগীরোগ হইবে। মতিবিবিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মতিবিবি আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময় সেখানে দ্রুতপদে কুলসম প্রবেশ করিল। যেখানে তাঁহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "বাবা—বাবা—বাবা কি হয়েছে তোমার ? এই যে আমি, বাবা, কথা কও।" পিতার বুকে মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

অরিন্দম বলিলেন, “বোধ হয় তোমার পিতা জীবিত নাই। একজন ভৃত্য ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে।”

শুনিয়া শিহরিত হইয়া, কুলসম উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল; কর্তৃত্বের ভাবে মাথা তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, “কোন্ ডাক্তার?”

অরিন্দম বলিলেন, “ফুলসাহেব নামে যিনি তোমাদের বাটীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।”

শুনিয়া এরূপ সময়েও কুলসমের মুখে হাসি আসিল। সম্মুখে তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়া; পার্শ্বে মাতা আকুল হৃদয়ে রোদন করিতেছেন; এ ভয়ানক সময়ে কুলসমের মুখে সেই হাসি যেন কেমন এক রকম, বড় ভয়ানক দেখাইল। তাহার পর সে অস্ফুটস্বরে একবার বলিল, “ফুলসাহেব? হবে।” তখন আবার সে পিতার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “বাবা! কোথায় তুমি? আর যে কেউ আমার নাই। বাবা! বাবা! আমার কি হবে!” তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, হাত পা অবশ হইয়া আসিল। বলিল, “ফুলসাহেব—শত্রু—আমার পিতার শত্রু—আমার শত্রু—এ সংসারের শত্রু—পিশাচ—পিশাচ কি সর্ব্বনাশ!” আর বলিতে পারিল না,—তাহার কাতর কম্পিত দেহলতা সেইখানে পড়িয়া মাটিতে লুটাইল; কুলসম মূর্চ্ছিত হইল।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুলসমকে ধরিলেন। তাহার পর মতিবিবিকে বলিলেন, “এ সময়ে আপনি আকুল হইয়া কাঁদিলে চলিবে না। কুলসম অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; এখন আপনাকেই সকল দিক দেখিতে হইবে।”

মতিবিবি কুলসমের পাশে আসিয়া বসিলেন। চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে শীঘ্র কুলসমের জ্ঞান হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুলসাহেব।

অল্পক্ষণপরেই ডাক্তার ফুলসাহেব উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ তামীজউদ্দীনকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়া বলিলেন, "না, জীবিত নাই; বুঝিতে পারিতেছি না, কেন এমন হঠাৎ মৃত্যু হইল।"

মতিবিবি বলিলেন, "কুলসমই যত অনর্থের মূল; ও যদি না ও জলে ডুবিয়া মরিতে যাইবে, তাহা হইলে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়।" দরবিগলিত ধারে দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল; তথাপি সেই মুখে একবার একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অরিন্দম ডাক্তার ফুলসাহেবকে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলেন। ফুলসাহেব মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহ দেখিল না, তখন তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য ওষ্ঠাধরের একপার্শ্বে একপ্রকার বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। অরিন্দমের কথা শেষ হইলে, ফুলসাহেব নিতান্ত বিনীতের ন্যায় বলিলেন, "মহাশয়ের নামটি কি জানিতে পারি?"

অ। অরিন্দম বসু।

ফু। বটে।

সহসা ফুলসাহেবের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং সে ভাব সামলাইয়া তিনি আরও বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়? যদি কোন বাধা না থাকে—"

অ। রঘুনাথপুর; এখান হইতে তিন ক্রোশ পথ হইবে, কোন কাজে এখানে অসিয়াছিলাম। বলেন যদি, আমি এখন যাইতে পারি।

ফুলসাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কুলসমের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি আর এখানে থাকিয়ো না, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে তোমার স্বাস্থ্য এখন তেমন ভাল বোধ করি না। যাও, তোমার মাকে সঙ্গে লইয়া তোমার ঘরে যাও।" তাহার পর অরিন্দমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আর একটু অপেক্ষা করুন।"

কুলসম উঠিয়া দাঁড়াইল, কোন কথা কহিল না; কিন্তু, সে এমন ভাবে একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে একবার ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল— ডাক্তারই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তখন ফুলসাহেবের মুখের ভাব অন্য কোন ভাবাপন্ন না হইলেও, একবার ক্ষণেকের জন্য ললাটকুঞ্চিত হইয়া, মিলাইয়া গেল; সেই সঙ্গে তাঁহার সেই দৃষ্টিতে একবার যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া, সেইরূপ চকিতে মিলাইয়া গেল। বলিলেন, "যাও কুলসম, অবাধ্য হইয়ো না—তোমার মাকে সঙ্গে লইয়া তোমার ঘরে যাও।"

মতিবিবি উঠিয়া গেলেন; কুলসমও উঠিল। যাইবার সময় দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অরিন্দমকে বলিল, "মহাশয়, আমাকে যদি সেই সময় মরিতে দিতেন, ভাল করিতেন। এখনও বলিতেছি, আপনি ভাল কাজ করেন নাই।" দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তখন ডাক্তার ফুলসাহেব একটা অতি দীর্ঘ, আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেহ মরিলে, স্ত্রীলোকেরা যেন কাঁদিবার একটা বড় সুযোগ পায়, কাঁদিয়া বাড়ী ফাটাইতে থাকে; যত শীঘ্র উহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সে চেষ্টা আমি আগে করি।" তখনই তিনি ভৃত্যদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তিন চারিজন ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। অরিন্দম দেখিলেন, তাহারা সকলেই সশঙ্ক, ত্রস্ত, সকলেই ডাক্তার বাবুকে অতিশয় ভয় করে। তাহাদের মুখভাবে

ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়, যেমন অতিশয় ভয় করে, তেমনি তাঁহাকে তাহারা মনে মনে অতিশয় ঘৃণাও করে।'

ফুলসাহেব তখন ভৃত্যদের যাহাকে যাহা করিতে হইবে, বলিয়া দিলেন। তাহারা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। অরিন্দম চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, দুইবার তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন, ডাক্তার ফুলসাহেব দুইবারই তাঁহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সেই মৃতদেহ সম্বন্ধে অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে ফুলসাহেবের আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। তাহার পর তিনি অরিন্দমকে বলিলেন, "অরিন্দম বাবু, আরও যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন, আমি একবার মতিবিবি ও কুলসমের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতেছি; তাহার পর একসঙ্গে যাইব, কি বলেন?"

অরিন্দম বলিলেন, "মাপ করিবেন, আমার কিছু আবশ্যক আছে—অধিকক্ষণ বসিতে পারিব না। আমি উঠিলাম।"

ফুলসাহেব বলিলেন, "না না, বসুন আপনি, আমি এখনই আসিতেছি; আপনার সঙ্গে দুই একটি কথা আছে। আপাততঃ মতিবিবি আর কুলসমকে এ সময় যা যা করিতে হইবে, বলিয়া আসিতেছি—এখনি আসিব।"

ফুলসাহেব উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সতর্কীকরণ।

ডাক্তারের প্রস্থানের পরমুহূর্ত্তেই কুলসম দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সেই কক্ষে এখনও তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। অরিন্দম মনে করিলেন, কুলসম বুঝি তাহার মৃত পিতাকে আবার দেখিতে আসিয়াছে। সে কিন্তু, পিতার মৃতদেহের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না, যেখানে অরিন্দম বসিয়াছিলেন, সেইদিকে অগ্রসর হইয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। বলিল, "অরিন্দমবাবু, সাবধান, ঐ ডাক্তার বড় সহজ লোক নয়, আমি উহার ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, সে আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় আছে।"

অরিন্দম তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, শোকে দুঃখে কুলসমের মতিভ্রম ঘটিয়া থাকিবে; কুলসম অরিন্দমকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া তাহার মনের ভাব এক রকম অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। সেই সময় একটা দুঃখের হাসি সেই ম্লানমুখে একবার দেখা দিল। কুলসম বলিল, "আমাকে পাগল মনে করিবেন না, আমি সকলই দেখিতেছি—সকলই বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আপনি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি।" মৃত পিতার নিস্পন্দ কঠিন বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "আমার পিতারকে এ দশা করিল? কে? ঐ পিশাচ—ডাক্তার, ডাক্তার ফুলসাহেব আমার পিতাকে খুন করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে—যখন ফুলসাহেবকে

আমরা জানিতাম না, তখন আমার পিতা কেমন দেখিতে ছিলেন, সে সবল শরীর আজ দুই বৎসরের মধ্যে জরাতুর বৃদ্ধের অপেক্ষাও জীর্ণ-শীর্ণ। আজ দুই বৎসরের মধ্যে ফুলসাহেব এ সোণার সংসার শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে। এখনও বলিতেছি, অরিন্দমবাবু, আপনি আমাকে পাগল মনে করিবেন না। আমি আমার পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ফুলসাহেবকে যতদূর চিনিতে হয়, চিনিয়াছি। আজ তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, এবার সে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছে। আমি তার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারি। সেই জন্য আপনাকে সতর্ক করিলাম। সাবধান—খুব সাবধান—ফুলসাহেব বড় ভয়ানক লোক।"

কুলসমের সেই আগ্রহাতিশয্যে, তাহার সেই সোজাসুজি সারল্যপূর্ণ কথায় অরিন্দমের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। তিনি বলিলেন, "সকল কথা না খুলিয়া বলিলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"না—না ; এখন নয় ; এখনিই পিশাচ আসিয়া পড়িবে—এখন সে সময় নয়।" এই বলিয়া কুলসম সভয়ে একবার ইতস্ততঃ চাহিল।

অরি। যদি বা তিনি আসেন, কি হইয়াছে ?

কুল। আমাকেই তার ফলভোগ করিতে হইবে।

অ। যতক্ষণ আমি উপস্থিত আছি, ততক্ষণ বোধ হয় নয়।

কু। ততক্ষণ না হইলেও হইতে পারে। এমন নারকী আর আছে কি ? এদিকে কথাগুলি এমন মধুমাখা, ভাবভঙ্গীতে এমন সাধুতার ভাণ, কার সাধ্য তাহার মনের ভাব বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে ? কখনও তাহার মুখে কর্কশ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না ; কখন রাগিতে জানে না। আজ আপনার সহিত যেরূপ অতিশয় ভদ্রভাবে উহাকে আলাপ করিতে দেখিলেন, চব্বিশ ঘণ্টা ঠিক ঐ ভাবে থাকে। আর

আজ যাহাকে দেখিলেন, যাহার বয়স আমার বয়সের চেয়ে বড় বেশি হইবে না,. উনি আমার বিমাতা—উনিও বড় সহজ নহেন। আমার পিতার মৃত্যুতে তিনি যে শোক প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মৌখিক ; তিনি ইহাতে বরং মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। হায়, আজ সকল রকমে আমার যতদূর সর্ব্বনাশ হইতে হয়, তাহা হইয়াছে। আজ আমার আপনার বলিতে কেহই নাই, পিতা নাই—মাতা নাই—ভ্রাতা নাই—জানি না কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইব —আমার কি হইবে!

কুলসমের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে দুইহাতে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি সকলের পার্শ্ব দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বহির্গত হইয়া তাহার হাত দুখানি প্লাবিত করিল। অরিন্দম প্রবোধ দিয়া তখন তাহাকে শান্ত করিলেন। কুলসম বলিতে লাগিল, "ফুলসাহেব এ সংসারে পদার্পণ করিবার দুইমাস পরে আমার মাতার মৃত্যু হইল। তাহার আরও দশমাস পরে আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট একটি ভাই ছিল, তাহার মৃত্যু হইল। তাহার পর আর ছয়মাস গত হইতে না হইতে আমার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এ সকলের ভিতরে পিশাচের আরও একটা অভিপ্রায় আছে ; পাপিষ্ঠ যে আমাকেও আর অধিক দিন জীবিত রাখিবে, এমন বোধ হয় না।"

অরিন্দম বলিলেন, "কেন, এ কথা বলিতেছ কেন ?"

কুলসম বলিল, "যদি না তাহাকে আমি বিবাহ করি, সে শীঘ্রই আমাকে হত্যা করিবে। তেমন নরাধমকে বিবাহ করিয়া আজীবন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা একদণ্ডের মৃত্যু-যন্ত্রণা সহস্রগুণে শ্রেয়। সেইজন্য পিশাচ—থাক্, ওকথা এখন থাক্, আমি আমার দুঃখের কথা

আপনাকে বলিব মনে করিয়া এখানে আসি নাই, আপনাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি। এখনও আপনাকে বলিতেছি. ফুলসাহেবকে সাবধান ;সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকের যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক, আপনি সেইরূপ সাবধান থাকিবেন ; যখন প্রথমেই সে এখানে আসিয়া আপনাকে দেখে, তখনকার মুখের ভাব দেখেই আমি বুঝিয়াছি, যদিও আপনি ফুলসাহেবকে চিনেন না, সে আপনাকে বেশ চেনে ; শুধু চেনে না, আপনাকে সে যে তেমনি ঘৃণা করে, আপনার নাম শুনেই তার চোখ দুটা একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেই, আমি তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি.। যদিও ফুলসাহেব আপনার সহিত নম্রভাবে কথা কহিতেছিল ; কিন্তু, নিশ্চয় জানিবেন, তার বিনীত মিষ্ট হাসিমাখা কথার অপেক্ষা কাল-সাপের গর্জ্জনও মঙ্গলজনক। এখন আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া কুলসম উঠিল।

অরিন্দম, "বসো, আমারও একটি কথা আছে।" বলিয়া একখণ্ড কাগজে নিজের ঠিকানাটি লিখিয়া কুলসমের হাতে দিলেন। বলিলেন, "যদি কখনও দরকার হয়, এই ঠিকানায় সংবাদ দিতে বিলম্ব করিয়ো না।"

কুলসম মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। তাহার পর চঞ্চলপদে তথা-হইতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে।

তখন অরিন্দমের মনের ভিতর কুলসমের কথাগুলি তোলাপাড়া হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, হয় ত কুলসম যাহা বলিল, সমস্ত সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। যেরূপভাবে কুলসম ফুলসাহেবের পরিচয় দিল, ফুলসাহেব কি তেমনই একটা ভয়ানক লোক? তেমনই একটি পিশাচচেতা? আবার ভাবিলেন, কই, ফুলসাহেবকে তেমন ত দেখিলাম না; লোকটাকে ভাল বলিয়াই বোধ হইল। হয় ত বা কুলসমের কিছু পাগলের ছিট আছে; যেরূপ ভাবে সে আমার সহিত কথা কহিল, তাহাকে পাগলই বা বলি কি করিয়া? যাই হোক ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে; বুঝিতেছি, ইহার ভিতর অনেক রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে; চেষ্টা করিয়া দেখিলে সময়ে সকলই বাহির হইয়া পড়িবে। দেখা যাক্, ডাক্তার মহাশয় আসিয়া কি বলেন।

অরিন্দম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় নিঃশব্দে ফুলসাহেব তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে তখন বড় চিন্তান্বিতের মত দেখাইল। অরিন্দম কোন কথা কহিলেন না। ফুলসাহেব ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, "অরিন্দম বাবু, কিছু মনে করিবেন না, অনেকক্ষণ আপনাকে একলা বসাইয়া রাখিয়াছি।"

অরিন্দম বলিলেন, "না, সে জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না; যাই হোক বাড়ীর মেয়েরা আপাততঃ অনেকটা শান্ত হইয়াছেন ত?

ফুলসাহেব বলিলেন, "হাঁ, এক রকম বুঝাইয়া আপাততঃ অনেকটা তাহাদিগকে শান্ত করিয়া অসিলাম; মতিবিবি আমারই একজন দূর-

সম্পর্কীয় আত্মীয়া ; এমন গুণবতী স্ত্রীলোক প্রায় দেখা যায় না। উহাকে আমি বড় স্নেহ করি। কই, কুলসমকে সেখানে দেখিলাম না, সে কি আবার এখানে কান্নাহাটি করিতে আসিয়াছিল নাকি?

অরিন্দম মৃদুহাস্যে সত্যকথাই বলিলেন, "কই, না, সে আর এখানে কান্নাহাটি করিতে আসে নাই।"

ফুলসাহেব বলিলেন, "এখন চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক্।"

অরিন্দম উঠিলেন। উভয়ে বাহির হইয়া একটা সোজা পথ ধরিলেন।

* * * * * *

কিছুদূর আসিয়া অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ফুলসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কতদূর যাইতে হইবে? এখন কি সেই রঘুনাথপুরেই ফিরিবেন?"

অরিন্দম বলিলেন, "না, কামদেবপুরে বাসা বাটিতে এখন যাইব।"

ফুল। সেখানেই কি এখন কিছু দিন থাকিবেন নাকি?

অ। হাঁ, একটি কাজ আছে; বোধ হয় সেইখানে এখন কিছুদিন থাকিতে হইবে।

ফু। কামদেবপুরে আমার দুই একজন রোগী আছে, মধ্যে মধ্যে আমাকে যাইতে হয়। এবার যখন ওদিকে যাইব, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব।

অ। যে আজ্ঞা।

কিছুদূর যাইয়া ফুলসাহেব একটি চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। তখন একবার অরিন্দমকে বলিলেন, "মহাশয়ের কি চুরুট খাওয়া অভ্যাস আছে?"

অরিন্দম একটু হাসিয়া বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে খেয়ে থাকি বটে, তবে তেমন অভ্যাস নাই।"

ফু। আমার এই চুরুট একটি খেয়ে দেখুন। একটু নূতন বোধ হইবে।

এই বলিয়া ফুলসাহেব পকেট হইতে আর একটি চুরুট বাহির করিয়া অরিন্দমের হাতে দিলেন।

অরিন্দম চুরুট লইয়া বলিলেন, "এখন থাক্, ইহার পর এক সময় খাইব, এখন শরীরটা বড় ভাল নাই।"

ফু। বেশ, যখন ইচ্ছা আপনি খাইয়া দেখিবেন; তখন বুঝিতে পারিবেন, এরূপ উৎকৃষ্ট চুরুট আপনি আর কখনও ব্যবহার করেন নাই। নিজের ব্যাবহারের জন্য আমি এই চুরুট স্বহস্তে তৈয়ার করিয়াছি। ইহার গন্ধ অন্যান্য চুরুটের মত নয়। ইহার এমন অনেক গুণ আছে, যাহা অপর চুরুটে নাই; বিশেষতঃ মুখের দুর্গন্ধ ও দন্ত-সংক্রান্ত যে কোন পীড়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে। একটা ব্যবহার করিয়া দেখিলে সে প্রমাণ পাইবেন।

তাহার পর তাঁহাদিগের অন্যান্য কথাবার্ত্তায় আরও কিছু পথ অতিবাহিত হইল। যখন উভয়ে কামদেবপুরের পথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন অরিন্দম বলিলেন, "তবে ডাক্তার বাবু, আমি এখন আসিতে পারি?"

ঘাড় নাড়িয়া, বিশেষ সৌজন্য দেখাইয়া ফুলসাহেব বলিলেন, "আসুন, এই পথেই আপনাকে যাইতে হইবে বটে। মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম। আসুন আপনি, এদিকেও সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আপনাকে অনেক দূর যাইতে হইবে।"

ফুলসাহেব গৃহাভিমুখে চলিলেন। অরিন্দম চিন্তিত মনে কামদেব-পুরের পথ ধরিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুলসম-সম্বন্ধে।

ফুলসাহেব যখন বলিলেন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে বিলম্ব ছিল না। এ সময় কামদেবপুরের পথ নির্জ্জন, কদাচিৎ দুই একজন লোকের গতিবিধি। পথের দুইধারে ছোট বড় ডোবা, বন জঙ্গল, বড় বড় গাছ পালা; কোথায় বড় বড় বাঁশঝাড় মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেখানকার পথটা একেবারে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইয়া মধ্যে মধ্যে এক প্রকার বিকট শব্দ হইতেছিল। শৃগালেরা এদিক ওদিক করিয়া সেই অন্ধকার পথের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল, কোন কোনটা দূরবনমধ্যে গিয়া হাঁকিয়া হাঁকিয়া নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিগদিগন্তে বিস্তৃত করিতেছিল। এবং নিজেদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া পরিশ্রান্ত কুক্কুরেরা নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে তাহাদিগকে নীরব থাকিবার জন্য কর্ত্তৃত্বের নিরতিশয় কর্কশকণ্ঠে বারম্বার ভৎর্সনা করিতেছিল। মাথার উপরের নিবিড় বাঁশঝাড় অশ্বত্থ বটের ঘন পত্রাচ্ছন্ন শাখা প্রশাখা, তদুপরিস্থিত কৃষ্ণমেঘাবৃত নীরব আকাশ সন্ধ্যাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পূর্ব্বে কামদেবপুরের পথ হইতে বিদায়-অভিনন্দনে পরিতুষ্ট করিয়াছিল। অরিন্দম সেই অন্ধকারময় পথ অতিক্রম করিতে করিতে তখনও কুলসম ও ফুলসাহেবের কথা ভাবিতেছিলেন। কুলসম তাঁহাকে ফুলসাহেবের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিল, কই, তিনি ফুলসাহেব তেমন ভয়ানক কিছু দেখিলেন না; ফুলসাহেব পূর্ব্বাপর

নিতান্ত ভদ্রলোকেরই ন্যায় ব্যাবহার করিয়াছেন। ফুলসমের কথা শুনিয়া আগে তাঁহার মনে হইয়াছিল, হয় ত পথে, ফুলসাহেব তাঁহাকে একা পাইয়া ছুরি ধরিবেন, না হয় ত পিস্তল ধরিবেন, কি অন্য কোন প্রকারে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। সে রকম কিছুই দেখিলেন না। সুতরাং তখন তিনি মনে করিলেন, ফুলসমের মস্তিষ্ক কোন কারণে বিকৃত হইয়া থাকিবে; হয় ত ফুলসাহেবের উপর তাহার কোন কারণে দারুণ ঘৃণা জন্মিয়া থাকিবে। যাই হোক্ ফুলসাহেবের লইয়া এখন ভাবিলে চলিবে না। এখন তাঁহার হাতে অনেক কাজ আছে, সে সকল কাজ সব ফেলিয়া আগে শেষ করিতে হইবে।

যথাসময়ে কামদেবপুরে আসিয়া, বাসায় যাইবার পূর্ব্বে অরিন্দম একবার যোগেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থানায় উপস্থিত হইলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া দুই একখানি প্রয়োজনীয় পত্র লিখিতে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। অরিন্দমকে দেখিয়া তখনকার মত লেখনী বন্ধ রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন; তিনি অরিন্দমকে উপবেশন করিতে বলিয়া তাঁহার নিকটে আর একখানি সতন্ত্র চেয়ারে উপবেশন করিলেন। বলিলেন, "হঠাৎ কি মনে করিয়া, অরিন্দমবাবু? সেই বালিকার মৃতদেহের কোনটার কিছু করিতে পারিলেন কি?"

অরি। না, এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারি নাই।

যো। রেবতী সংক্রান্ত ঘটনার সেই কেশব নামে লোকটার কোন সন্ধান হইল কি?

অ। না—তাহা হইলে আপনি সংবাদ পাইতেন। সে কথা থাক্, আমি এখন আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; ফুলসাহেব বলিয়া কোন লোক্কে আপনি জানেন কি?

যো। ফুলসাহেব? এখানকার সকলেই তাঁহাকে জানে।

অ। সকলেই কেন তাঁহাকে জানে, তা আপনি জানেন্ কি?

যো। লোকটা চিকিৎসা-বিদ্যায় খুব পারদর্শী। এখনকার অনেকের বাড়ীতে ফুলসাহেব চিকিৎসা করে থাকেন। কেন, অরিন্দম বাবু, তাঁর কথা আপনি বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কেন?

অ। আগে আমার কথার উত্তর দিন, তাহার পর আপনার কথার উত্তর করিব। আপনি তমীজউদ্দীনকে চিনেন কি?

যো। চিনি বৈকি, তিনি একজন বিখ্যাত জমীদার।

অ। তিনি প্রভূত ধনশালী, কেমন না?

যো। নিশ্চয়ই; তাঁর বিষয় আমি কিছু কিছু জানি।

অ। বলুন দেখি।

যো। আজ দুই বৎসর ধরিয়া তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তিনি এখন শয্যাশায়ী। ইতিমধ্যে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়, তাহার পর তিনি আবার বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হন্, কিন্তু তাহার কন্যা যাহাতে তিনি আর বিবাহ না করেন, সে জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। তমীজউদ্দীন তাঁহার সেই কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসেন, পাছে সে জানিতে পারে এজন্য গোপনে বিবাহ করেন। এবং যাঁহাকে বিবাহ করেন, শুনিয়াছিলাম, তিনি ঐ ডাক্তার ফুলসাহেবেরই একজন আত্মীয়ের কন্যা। সেই জন্য ফুলসাহেবই এ বিবাহের বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধ তমীজউদ্দীন আর একটি বড় বুদ্ধিমানের মত কাজ শেষ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মত কিছু রাখিয়া স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার কন্যাকে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছেন; তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সে সকল জানিতে পারেন। তখন তিনি আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া স্বামীকে বারম্বার ভয়

দেখাইতে লাগিলেন ; কারণ বিবাহের পূর্ব্বে দানপত্র সমাধা হইয়াছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার এক কপর্দ্দক পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কখন তিনি দড়ী লইয়া ঘুরিতেন, কখন তাঁহার বাক্সে আফিং থাকিতে দেখা যাইত, কাজেই তমীজউদ্দীন মহা বিভ্রাট পাড়িলেন। শুনিলাম, তাহার পর না কি তমীজউদ্দীন তাঁহার কন্যাকে অনেক বুঝাইয়া বলিয়া কহিয়া একলক্ষ টাকা চাহিয়া লইয়াছেন ; সেই টাকাটা তাহার স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফুলসাহেব-সম্বন্ধে।

অরিন্দম বলিলেন, "তমীজউদ্দীন যে মারা গিয়াছেন।"

সবিস্ময়ে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি বলিলেন !"

অরি। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমারই হাতের উপর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

যোগে। তারপর—তারপর—তারপর !

অ। তর পর আর কি—এখন তাঁহার কন্যা সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইল।

যো। তাহা ত হইবারই কথা।

অ। কত টাকার বিষয় হবে ?

যো। প্রায় বিশ লক্ষ টাকার।

অ। বিশ লক্ষ ! বলেন কি ? আচ্ছা বিশ লক্ষই যেন হইল। এখন বলুন দেখি, ফুলসাহেব অবিবাহিত কিনা ?

যো। হয় বিবাহিত, নয় তাঁহার স্ত্রী গতায়ুঃ হইয়া থাকিবেন। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?

অ। জিজ্ঞাসা করিতে দোষ কি আছে? হঠাৎ কথাটা মনে উঠিল, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

যো। আমার কাছে এতটা গোপন করা কি আপনার ভাল দেখায়?

অ। তমীজউদ্দীনের কন্যাকে ফুলসাহেব এখন বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন।

যো। বটে! ফুলসাহেব বড় চতুর লোক, তাঁহাকে দেখিলেই সেটি বেশ বুঝা যায়। তবে শুনিয়াছি, তমীজউদ্দীনের মেয়েটা কিছু পাগলাটে স্বভাবের।

অ। যাক্, ফুলসাহেব লোকটা কেমন দেখিতে বলুন দেখি। এমন ভাবে বলিবেন, যে কখনও দেখে নাই, সে যেন দেখিলেই চিনিতে পারে। মধ্যে মধ্যে আপনি পলাতক খুনী আসামীদিগকে ধরিবার জন্য যেমন অবিকল রূপবর্ণনা করিয়া চারিদিকে খবর পাঠান, বর্ণনাটা যেন ঠিক সেই রকমের হয়।

যো। বলিতেছি, কিন্তু, আমি যে আপনার এ সকল কথার মানে কিছুই বুঝিতেছি না।

অ। ইহার পর বুঝিবেন। এখন একবার ফুলসাহেবের রূপবর্ণনা করুন দেখি।

যো। লোকটা কিছু মোটা——

অ। কি রকম মোটা বলুন, সাধারণতঃ লোকে যেরূপ মোটা হইয়া থাকে, সেইরূপ মোটা না ব্যায়ামাদির দ্বারা লোকে যেরূপ চুয়াড় ধরণের মোটা হয়, সেইরূপ মোটা?

যো। মোটের উপর এখন এক রকম মোটা বলিয়াই মনে করুন না। লম্বায় পাঁচফুট ছয় সাত ইঞ্চির বেশি নয় গৌরবর্ণ, বয়স চল্লিশের

মধ্যে, মুখখানি একটু গোলাকার, কপালের পাশে একটা বড় আঁচিল আছে, নাকটা টানা ও একটু লম্বা, গোঁফদাড়ী কামানো, সর্ব্বদাই হাসিমুখ, চুলগুলি অল্প কোঁকড়া; চলিবার সময় একপাশে মুখখানি প্রায় বাঁকাইয়া চলেন, মুখে সর্ব্বদাই মিষ্টকথা লাগিয়া আছে, চোখ দুটির দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, ছোটর উপর টানা চোখ।

অ। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ফুলসাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হইয়াছে। লোকটা খুব আলাপী বটে।

যো। ফুলসাহেবকে যদ্যপি আপনি দেখিয়াছেন, তথাপি তাঁহার রূপ-বর্ণনা শুনিতে আপনার কি এত আবশ্যক, অরিন্দমবাবু?

অ। কিছুই না।

যো। আপনি আবশ্যক ছাড়া নিশ্বাস অবধি ফেলিতে কুণ্ঠিত হন, আর বলিতেছেন, কিছুই না? আমি কি আপনাকে জানি না?

অ। কিছুই না, তবে এইটুকু জানিবেন, যদ্যপি আমার হাতে একটা উপস্থিত খুনীকেসের ভার না থাকিত, তাহা হইলে আমি একবার ডাক্তার ফুলসাহেবের চরিত্রটা সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিতাম।

যো। ফুলসাহেবের উপর সহসা আপনার এমন কৃপাদৃষ্টিপাত কেন হইল?

অ। তিনি এখন তমীজউদ্দীনের মেয়েকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন।

যো। বটে! ফুলসাহেব বড় চতুর লোক; তাঁকে একবার দেখিলেই, সেটি বেশ বুঝিতে পারা যায়; শুনিয়াছিলাম, সে মেয়েটি নাকি কিছু মাথা-পাগলাগোছের?

অ। এই আপনি আমি যেরূপ মাথা-পাগলা গোছের সেই রকম,

তার বেশি বলিয়া আমার বোধ হয় না। আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার নাম কুলসম। যোগেন্দ্র বাবু, শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, কুলসমের অদৃষ্টে এই তিনটি ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিকে। হয়, কুলসম ফুলসাহেবের স্ত্রী হইবে; সেটি যদি না ঘটিয়া উঠে, কুলসম মরিবে; সেটিও যদি না ঘটে——"

যো। (বাধা দিয়া) তাহা হইলে কি হইবে?

অ। তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, অরিন্দমের এ সম্বন্ধে একটু মাথা-ব্যাথা পড়িবে; সে এ বিপদের মুখ হইতে একদিন কুলসমকে উদ্ধার করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অরিন্দমের বিপদ।

যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অরিন্দম বাসা-বাটীতে ফিরিলেন। বাটীর বহির্দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ভিতর হইতে ভৃত্যের গম্ভীর, উচ্চ ঘন ঘন নাসিকাধ্বনি আসিয়া অরিন্দমকে তাহার গভীর নিদ্রার পরিচয় দিল। তিনি অতিকষ্টে ভৃত্যের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মনে-মনে-বিরক্ত ভৃত্য উঠিয়া তাড়াতাড়ি দ্বারোন্মুক্ত করিল। অরিন্দম দ্বিতলে নিজের শয়ন-গৃহে গিয়া আহারাদির জন্য সর্ব্বাগ্রে ব্যস্ত হইলেন। উদরস্থ অগ্নিদেব সারাদিন একাদশী করিয়া বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন; ইতিপূর্ব্বে সুবুদ্ধি পাচক ঠাকুর সেই ঘরে আহার্য্য প্রস্তুত রাখিয়া নিজের নির্ব্বিঘ্ন দীর্ঘনিদ্রার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। অরিন্দমও তাহাতে তখন অনেকটা সুবিধা বোধ করিলেন।

যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না, তাঁহার মন কুলসম ও ফুলসাহেবের কথা লইয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। তখন তিনি ফুলসাহেবের প্রদত্ত চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া টানিতে লাগিলেন—আর ভাবিতে লাগিলেন—নিদ্রার নামগন্ধ নাই। ভাবিতে লাগিলেন, বোধ হয় আমি যাহার সন্ধানে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ভুলিয়া দিবারাত্র ঘুরিতেছি, সে আর কেহ নয়, ঐ ফুলসাহেব। ঐ বোধ হয় সেই খুনী। এত সংশয়-সন্দেহের ভিতর হইতে মন যেন বলিতেছে, ঐ ফুলসাহেব আর কেহই নয়—সেই হত্যাকারী।

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল; একটু তন্দ্রাবোধ হইল, মাথাটা একবার পশ্চাদ্দিকে ঢুলিয়া পড়িল; সেই সঙ্গে একটা হাই উঠিল।

অরিন্দম আপনার মনে বলিলেন, "এই যে দেখিতে পাই, এখন একটু ঘুম আসিতেছে। আকৃতিতে অনেকটা মিল আছে, লম্বা সাড়ে পাঁচ ফুট, মাংসপেশীতে বক্ষ ও স্কন্ধ অস্বাভাবিকরূপে প্রশস্ত, কোমরটা কিছু সরু, বয়সও চল্লিশ বৎসরের বেশি বলিয়া বোধ হয় না—"

তাহার পর অরিন্দম আবার একটি জৃম্ভণ ত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এবার কিছু বড়। অরিন্দম পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "দেখিতে গৌর-বর্ণ, তেমন উজ্জ্বল না হইলেও—" আবার একটা হাই উঠিল "—পরিষ্কার বটে, বিশেষতঃ মুখের চেয়ে হাত দুখানার রং কিছু বেশি পরিষ্কার,—" আবার একটা বড় ধরণের হাই উঠিল।

"একি! আজ এত ঘুম পাইতেছে কেন? বরং ইহার অপেক্ষা বেশি রাত্রেই প্রায় ঘুমাইয়া থাকি, কোন দিন ত এমন হয় না।" এই বলিয়া অরিন্দম উঠিয়া গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "চুলগুলি একটু কোঁকড়া, খুব কাল—"

আবার একটা হাই উঠিল—তাহার পর আর একটা—আর একটা "চুল-গুলি মাপেও সেইরূপ বড়—" আবার একটা হাই উঠিল "—নিশ্চয়ই এই ফুলসাহেব সেই বালিকাকে হত্যা করিয়া সিন্দুক-মধ্যে লাস চালান্ করিয়াছিল।"

অরিন্দম আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। বসিয়া পড়িলেন, হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। একটার পর একটা—তার পর একটা, আর একটা—ক্রমান্বয়ে হাই উঠিতে লাগিল।

চিন্তামগ্ন অরিন্দম তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ফুলসাহে-বেরও দাড়ি গোঁফ্ নাই—" আবার হাই উঠিল, "—লোকটা যেরূপ মিষ্টভাষী—" আবার হাই উঠিল "—দেখিলাম—" আবার হাই উঠিল —"তাতে—" আবার একটা হাই উঠিল "—কি—" আবার একটা হাই উঠিল "—বো—" আবার একটা হাই উঠিল "—ধ—" আবার একটা—অরিন্দম শেষে আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি সেই অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মাথার উপর দুইখানি হাত ঋজুভাবে তুলিয়া, দুইহাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংবদ্ধ রাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে কেবলই জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। একটার পর একটা—একটার সঙ্গে আর একটা—সেই সঙ্গে আর একটা, এইরূপ জৃম্ভণের উপর জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। একবার মুখ বন্ধ করেন, এমন অবসর টুকুও পাইলেন না। চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল; যদিও একবার জোর করিয়া চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—চারিদিকে ঘন অন্ধকার, ঘরে যদিও দীপ জ্বলিতেছিল, তথাপি তিনি অন্ধের ন্যায় হাঁতড়াইয়া বিছানা খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষে তখন এমন একটা যন্ত্রণা হইতেছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এমনই সাড় হইয়া আসিতেছিল যে, অপর কেহ হইলে এতক্ষণে ছিল।

তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত। অরিন্দম মৃদুস্বরে বলিলেন, "অবশ্যই আমি কিছু খেয়েছি, নতুবা এমন হইবে কেন? ওঃ! ঠিক হইয়াছে! ঐ চুরুটে কোন রকম বিষ ছিল। কি সর্ব্বনাশ! নিশ্চয়ই ফুলসাহেব নরঘাতী পিশাচ—এখন আর কোন সন্দেহ নাই—এখন ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, বালিকার হত্যাকারী আর ফুলসাহেব একই ব্যক্তি। পিশাচ পত্রে লিখিয়াছিল, একদিন অরিন্দমকে হত্যা করিবে, শীঘ্রই সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে।"

নবম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুমুখে অরিন্দম।

ঘরের এক কোণে একটা টেবিল ছিল; অরিন্দম দুই হাতে সেই টেবিলের একটা কোণ চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন। দুই তিনবার পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। সেইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি সেই উজ্জ্বল দীপালোকেও দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিছুতেই তিনি প্রকৃতস্থ হইতে পারিলেন না; হাই চাপিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। একটার পর একটা—তাহার পর আর একটা—তাহার পর আর একটা—সেইরূপ হাই উঠিতে লাগিল। তিনি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এখন না—এখন না—এখন কিছুতেই মরা হইবে না। মরিবার আগে যেমন করিয়া পারি, একটি কাজ শেষ করিবই।" এই বলিয়া তিনি টলিতে টলিতে উঠিলেন, অন্ধকারগৃহমধ্যস্থবৎ তিনি হাঁতড়াইয়া টেবিলের ভিতর হইতে একখানি চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। অতিকষ্টে একটি কলম ও দোয়াতের সন্ধান

করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কি লিখিতেছেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; অভ্যাসমত লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। যাহা লিখিলেন; তাহার কোন অক্ষর খুব বড়, কোনটি আবার তেমনি ছোট—কোনটার সঙ্গে কোনটা মিলে না। পংক্তিগুলিও আঁকাবাঁকা হইল; ঠিক তাঁহার হস্তাক্ষর বলিয়া কিছুতেই বুঝাইল না। তিনি অতিকষ্টে লিখিলেন;

"যোগেন্দ্র বাবু,

ফুলসাহেব বড় ভয়ানক লোক। যত শীঘ্র পারেন, তাহাকে গ্রেপ্তার করুন। সে খুনে—সেই বালিকার হত্যাকারী। সে চুরুটের সঙ্গে আমাকে বিষ দিয়াছিল; আমি সেই চুরুটের আধখানি মাত্র খাইয়াছি। বোধ হয় বাঁচিব না। ফুলসাহেবকে শীঘ্র না ধরিতে পারিলে সে এক-দিন আপনাকে—"

আর লিখিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রমশঃ অসাড় হইয়া আসিতেছিল; সেই অসম্পূর্ণ পত্রে তিনি নিজের নাম সহি করিয়া পত্র শেষ করিলেন। এবং একখানি খাম সংগ্রহ করিয়া পত্রখানি তন্মধ্যে বন্ধ করিলেন। আর একটি বর্ণও লিখেন এমন শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। এখনও শিরোনামা লিখিতে বাকী, ক্রমশঃ তিনি নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িতে ছিলেন, আর তখন তাঁহার নড়িবার শক্তিমাত্র ছিল না। হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছিল; তিনি আর কোন উপায় না পাইয়া করতলে সেই লৌহ লেখনী বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে হাতের সেই দারুণ অবসন্নতা তখনকারমত একটু দূর হইল; লেখনী সেইরূপ বিদ্ধ রহিল। তিনি অপর লেখনী লইয়া শিরোনামা লিখিলেন। যাহা লিখিলেন; তাহা সহজে অপরে পড়িতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

অরিন্দমের পত্রের প্রতিকৃতি।

তখনই ভৃত্যদ্বারা যাহাতে যোগেন্দ্রনাথের নিকট পত্রখানি পাঠা-ইতে পারেন, সে জন্য অরিন্দম ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার যে স্বরভঙ্গও ঘটিয়াছে, তাহা তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন। স্বর এত মৃদু হইয়া আসিয়াছে, নিম্নতলের নিদ্রিত ভৃত্য শুনিবে কি, সে যদি তখন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলেও বোধ হয় শুনিতে পাইত না। অরিন্দম নিজেও শুনিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিজেই ভৃত্যের নিকট যাইবার জন্য সেই কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে গেলেন। ইতিপূর্ব্বে আহারাদি শেষে নিজহস্তে তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া-ছিলেন, কিছুতেই এখন তিনি সেই রুদ্ধ দ্বারের সন্ধান করিতে পারিলেন না। সম্পূর্ণরূপে তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একপার্শ্বে একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, তিনি তাহাই দ্বার মনে করিয়া তন্মধ্য দিয়া বাহির হইতে গেলেন, কপালে সজোরে আঘাত লাগিল; তিনি পত্রখানি সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। পত্রখানি বাহি-রের বারান্দায় গিয়া পড়িল। অরিন্দম সেইখানে পড়িয়া গেলেন। মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন।

এসময়ে যোগেন্দ্রনাথ হয় ত পয়ঃফেননিভশয্যায় শয়ন করিয়া কত সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কেমন করিয়া তিনি জানিবেন, আজ তাহার বিনীত বন্ধু অরিন্দম শত্রুর চক্রান্তে মরণাপন্ন; নিঃসহায় অবস্থায় তিনি মরিতে বসিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসক না মূর্ত্তিমান মৃত্যু ?

পরদিন প্রভাতে পাচক ঠাকুর অরিন্দমের নিকট অন্যদিনের ন্যায় অদ্যও বাজার-খরচ লইতে আসিয়া দেখিল, তখনও অরিন্দম উঠেন নাই। তাঁহার শয়ন গৃহের কবাট বন্ধ রহিয়াছে, বাহির হইতে দুই চারি বার 'বাবু' 'বাবু' করিয়া ডাকিল, কোন উত্তর নাই। দ্বার ঠেলিল, তথাপি কোন উত্তর নাই। তখন গবাক্ষ দিয়া দেখিল, গৃহতলে অরিন্দম পড়িয়া আছেন। তাঁহার ললাটের একস্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে; দেখিয়া পাচক ঠাকুরের অত্যন্ত ভয় হইল। কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না; তাহার সেই ইতস্ততের সময় অরিন্দমের লিখিত সেই পত্রখানি তাহার নজরে পড়িল; তাহার একটু লেখাপড়া জানা ছিল, অনেক কষ্টে একটির পর একটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া একটি শব্দ, সেইরূপে আর একটি শব্দ, এইরূপে শব্দে শব্দে মিলাইয়া শিরোনামার কতক অংশ পাঠ করিল। কতক অংশ না পড়িতে পারিলেও আন্দাজে বুঝিয়া লইল।

পত্রখানি লইয়া নিম্নতলে আসিয়া গভীর নিদ্রা হইতে ভৃত্যকে জাগাইল। তাহাকে আগে তিরস্কার করিল; তাহার পর সে যাহা জানিত বলিয়া, নিজে সেই পত্র লইয়া থানায় যোগেন্দ্রনাথের নিকট চলিল।

* * * * * *

থানায় তখন যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন না। একজন দারোগা আর দুইজন জমাদার বসিয়াছিল। পাচক ঠাকুর গিয়া দারোগাকে সেই পত্রখানি

দিয়া যাহা ঘটিয়াছে সংক্ষেপে বলিল। তখনই দারোগা একজন জমাদারকে দিয়া সেই পত্রখানি যোগেন্দ্রনাথের বাটীতে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজে অরিন্দমকে দেখিতে চলিল। অপর জমাদার থানা রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল।

পাঁচক ঠাকুর দারোগাকে অরিন্দমের শয়নকক্ষের সম্মুখে লইয়া আসিল। দারোগা সেই উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া, অরিন্দমকে যেরূপ অবস্থায় অনাবৃত গৃহতলে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল, তাহাতে তাহার বড় ভয় হইল। তখনই রুদ্ধদ্বার ভাঙিয়া ফেলা হইল। সর্ব্বাগ্রে দারোগা, পাচক ঠাকুর ও ভৃত্যের সাহায্যে অরিন্দমকে পার্শ্ববর্ত্তী শয্যায় তুলিল। নাসিকায় হাত দিয়া দেখিল, নিশ্বাস পড়িতেছে না। কিন্তু দেহ শীতল নহে, বরং কিছু উষ্ণ। সেই জন্য তাহার মনে সন্দেহ হইল যে, অরিন্দমের তখনও মৃত্যু হয় নাই। দারোগা পাচক ঠাকুরকে তখনই একজন ডাক্তার ডাকিতে অনুমতি করিল।

পাচক ঠাকুর ছুটিয়া বাহির হইল। অনতিবিলম্বে সে একজন চিকিৎসককে সঙ্গে আনিল। চিকিৎসক আর কেহই নহেন—সেই ডাক্তার ফুলসাহেব। দারোগা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইয়া বলিল, "এই যে আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে—আপনাকে দেখিয়া অনেকটা ভরসা হইল।"

ফুলসাহেব বলিল, "হাঁ—আমি এইখানে একজন রোগী দেখিতে আসিয়াছিলাম; পথ হইতে তোমার লোক গিয়া ডাকিয়া আনিল। এখন ব্যাপার কি বল দেখি ?

দারোগা অরিন্দমকে দেখাইয়া দিল। ফুলসাহেব অরিন্দমকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর কি হইবে, লোকটার মৃত্যু হইয়াছে।"

মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া দারোগা চমকিত হইয়া উঠিল। বলিল, "মৃত্যু হইয়াছে! কি সর্ব্বনাশ! কি রোগে হঠাৎ ইনি মারা পড়িলেন?"

ফুল। সম্ভব হৃদ্‌রোগে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

দারো। এমন বলবান ইনি, ইনি যে হৃদ্‌রোগে আচম্বিতে মারা গেলেন, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?

ফু। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) আমি কি মিথ্যা কথা বলিলাম।

দারো। আত্মহত্যা করেন নাই ত?

ফু। তাহাও হইতে পারে। কই, আপাততঃ কোন প্রমাণ পাইলাম না।

দা। আপনি যেরূপ দেখিলেন, তাহাতে ইহার মৃত্যু-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই?

ফু। না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মিত্রের কার্য্য।

এমন সময় যোগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি অরিন্দমের পত্র পান নাই, জমাদার পত্র লইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইবার আগে, তিনি বাহির হইয়াছিলেন। থানাতে গিয়া সেখানে সেই জমাদারের মুখে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইয়া এখানে আসিতেছেন। দারোগাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে যাহা জানিত যোগেন্দ্রনাথকে বলিল। অরিন্দমের সেই পত্রের কথা বলিতে মনে হইল না।

যোগেন্দ্রনাথ বিশেষ ব্যস্ততার সহিত ফুলসাহেবকে বলিলেন, "আপনি কি কোন রকমে অরিন্দম বাবুকে রক্ষা করিতে পারেন না?

ফুলসাহেব বলিল, "আমার আর হাত নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে কি ইনি বাঁচিয়া নাই?

ফুলসাহেব বলিল, "না, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিতেন না। কি করিব এখন আর কোন উপায়ই নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে আর কি হইবে! ডাক্তার বাবু, হঠাৎ এরূপ মৃত্যুর কারণ কি? অরিন্দম বাবু বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছেন?"

ফুলসাহেব বলিলেন, "সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারিলাম না; আমার বোধ হয় হৃদ্‌রোগেই মৃত্যু হইয়াছে।"

ফুলসাহেব তখন যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উঠিল।

যাইবার সময় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার হাসিল; সেই হিংসাতীব্র চিরাভ্যস্থ মৃদুহাসি কেহ দেখিল না।

ফুলসাহেব চলিয়া গেলে অনতিবিলম্বে যোগেন্দ্রনাথ একখানি পাল্কীতে তুলিয়া অরিন্দমকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন।

সেখানে অরিন্দমকে একটি প্রশস্ত পরিস্কৃত গৃহমধ্যে রাখা হইল। বাটীতে আসিয়া অরিন্দমের সেই পত্র পাইয়া যোগেন্দ্রনাথ সকলই বুঝিতে পারিলেন। তখনই খ্যাতনামা চিকিৎসকদিগকে আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি তখন নিজে যাইয়া অরিন্দমের বাটী হইতে সেই অর্দ্ধদগ্ধ বিষাক্ত চুরুট সন্ধান করিয়া লইয়া আসিলেন কলিকাতা হইতে দুই তিন জন নামজাদা ডাক্তারকে আনাইলেন। সেই দিন রাত্রিশেষে তিনজন ইংরাজ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথের বাটী হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কুলসমের উদ্বেগ।

প্রভাতে যোগেন্দ্রনাথের গৃহদ্বারে একখানি পাল্কী আসিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্য হইতে একটি কৃতাবগুণ্ঠনা কিশোরী বাহির হইয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যোগেন্দ্রনাথ বাড়ীতেই ছিলেন। বাটীর বহিরঙ্গণে তাহার সহিত যোগেন্দ্রনাথের দেখা হইল। রমণী যোগেন্দ্র-নাথকে দেখিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন তিনি ?"

যোগেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিলেন, "কে কেমন আছেন ? কাহার কথা আপনি বলিতেছেন ?"

রম। অরিন্দমবাবুর। তিনি কি বাঁচিয়া নাই ?

যোগে। ডাক্তার ফুলসাহেব ত তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

র। (ক্রোধভরে) কে ডাক্তার ফুলসাহেব ? সেই পিশাচ—সেই ত অরিন্দম বাবুকে খুন করিয়াছে।

যো। বটে ! আপনি কে ?

র। আমি কুলসম। তমীজউদ্দীনের কন্যা।

এই বলিয়া কুলসম অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। বলিল, "আমি আগেই জানিতে পারিয়া, অরিন্দম বাবুকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। হায়, হয় ত তিনি আমাকে পাগল মনে করিয়া আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই।"

যো। তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, ডাক্তার ফুলসাহেব অরিন্দম বাবুকে হত্যা করিয়াছে ?

কুলসম। আমি ফুলসাহেবের মুখ দেখিলে, তাহার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারি। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না ?

যো। কেন বিশ্বাস করিব না ? তুমি কি বলিতে আসিয়াছ, বল।

কু। অরিন্দমবাবু কি ফুলসাহেবের সেই বিষাক্ত চুরুট খাইয়াছেন ?

যো। হাঁ।

কু। (অধীর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ ! কোথায় তিনি ? আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া চলুন। কেমন আছেন তিনি ?

যো। তুমি সেখানে গিয়া কি করিবে ?

কু। আমি তাঁহাকে বাঁচাইব। তিনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এ সময় আমি তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিব।

যো। কেমন করিয়া তুমি এখন তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে ?

কু। তিনি এখন মরেন নাই—বিষে মৃতবৎ হইয়া আছেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে কোন চিকিৎসক তাঁহাকে জীবিত বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। আমি ঐ বিষের সম্বন্ধে ফুলসাহেবের মুখে কিছু শুনিয়াছি। উহার ঔষধের নামও তার মুখে শুনিয়াছি। একদিন আমার বিমাতাকে ঐ কথা ফুলসাহেব বলিয়াছিল ; আমি গোপনে থাকিয়া সব শুনিয়াছিলাম।

যো। তিনি মরেন নাই—অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছেন।

শুনিয়া কুলসমের মাথায় যেন কেমন একটা সুখের বজ্রাঘাত হইল। একটা নিরতিশয় আনন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তাহার মস্তকের ভিতর সঞ্চালিত হইতে লাগিল। ঠিক সেই সময় অরিন্দম

তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অরিন্দমের মুখ ম্লান জ্যোতিঃহীন ; দেহ শীর্ণ চোখ দুটি ভিতরে বসিয়া গিয়াছে—যেন সে অরিন্দম নহেন তেমন উজ্জ্বল বলময় দেহে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। অরিন্দম মৃদুহাসিয়া কুলসমকে বলিলেন, "কি, কুলসম, তুমি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ ? আমি মরি নাই, বেশ বাঁচিয়া আছি। তুমি কেন আবার কষ্ট করিয়া এতদূর আসিলে ?"

কুলসম বলিল, "আপনি একদিন আমার জন্য নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করিতে পারিয়া ছিলেন ; আর আমি আপনার এরূপ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া একবার দেখিতে আসিয়াছি, ইহা কি বড় বেশি হইল ?"

অরি। কুলসম, তোমাকে আমার কতকগুলি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

কুল। বলুন, আমি আপনার নিকট একটি বর্ণও গোপন করিব না। আমি পিতৃমাতৃহীনা আপনার শরণাপন্না ; আমি আপনার নিকট অনেক উপকারের আশা করি। এ বিপদে আপনি যদি আমাকে না রাখেন আমার আর অন্য উপায় নাই। আমি আবার এক ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি, যদি না আমি দুই এক দিনের মধ্যে ডাক্তার ফুলসাহেবকে বিবাহ করিতে সম্মত হই। তাহারা আমাকে খুন করিবে তাহারা কাল যখন এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল, তখন আমি গোপনে থাকিয়া তাদের অনেক কথা শুনিয়াছি।

অ। তাহারা কে ? তুমি আর কাহার কথা বলিতেছ ?

কু। আর আমার সেই রাক্ষসী বিমাতা—

অ। তিনিও কি এই ষড়যন্ত্রের ভিতর আছেন নাকি ?

কু। তাঁহারই ত এই ষড়যন্ত্র, ফুলসাহেব উপলক্ষ্য মাত্র। আমার বিমাতাকে বড় সহজ মনে করিবেন না। সে না করিতে পারে, এমন

ভয়ানক কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। শুনিয়াছি, আমার বিমাতা ফুলসাহেবের ভাগিনেয়ী। ফুলসাহেব যোগাড়যন্ত্র করিয়া আমার পিতার সঙ্গে, তাহার সেই ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেয়। কিন্তু ফুলসাহেবের সহিত আমার বিমাতার যেরূপ ঘনিষ্টতা দেখি, তাহাতে মনে বড় ঘৃণা হয়—কখন ভদ্র ঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় না।

অ। তুমি গোপনে থাকিয়া কাল তাহাদের মুখে কি শুনিয়াছ? আমার কোন কথা উঠিয়াছিল কি?

কু। আগে আপনারই কথা হইতেছিল। ফুলসাহেব আপনাকে বিষাক্ত চুরুট খাওয়াইয়া কেমন করিয়া আপনাকে মরাণাপন্ন করিয়াছিল, তাহাই সে আমার বিমাতার নিকটে হাসিতে হাসিতে গল্প করিতেছিল। তার পর আমার কিসে সর্ব্বনাশ হইবে, কেমন করিয়া আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইবে, এই সব গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, যদি তাহাদের কার্য্যসিদ্ধ করিবার জন্য আমাকে খুন করিতে হয়, তাহাও করিবে। জানি না বিধাতা কেন ফুলসাহেবরূপী পিশাচকে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ঐ ফুলসাহেব আমার করুণাময় পিতাকে খুন করিয়াছে, স্নেহময়ী মাতাকে খুন করিয়াছে, আমার একমাত্র ভ্রাতাকেও খুন করিয়াছে; এমন ভাবে খুন করিল—কেহ জানিল না—কেহ বুঝিল না—অথচ তিনটি প্রাণী খুনীর বিষে এ জগৎ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। পিশাচ যে বিষ দিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহাতে মানুষ একদিনে মরে না—তিল তিল করিয়া মরিতে থাকে; কেবল আমিই এতদিন বাবাকে মরিতে দিই নাই, আমার বিমাতা বাবার খাবার জলের সঙ্গে প্রত্যহ বিষ মিশাইয়া রাখিত, আমি সুবিধা পাইলেই, সে জল ফেলিয়া দিয়া অন্য জল খাইতে দিতাম। সকল দিন সুবিধা হইত না। পিতা শয্যাশায়ী

হইয়াও এতদিন সেইজন্য বাঁচিয়াছিলেন, নতুবা বোধ হয় তিনমাসের মধ্যেই তাঁহাকে ইহোলোক ত্যাগ করিতে হইত। বিষ খাইয়াও বাবাকে এতদিন বাঁচিতে দেখিয়া ফুলসাহেব আর আমার বিমাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুইজনে কেবল পরামর্শ করিত; মধ্যে মধ্যে বিষের মাত্রা বাড়াইয়া দিত। বাবার নিকট একদিন এ কথা তুলিয়াছিলাম। তাঁহার যেরূপ সরল মন, আপনার মত সকলকেই সরল ভাবিতেন। নারকী ফুলসাহেবের উপর, আমার সেই দানবী বিমাতার উপর তাঁহার যেরূপ অগাধ বিশ্বাস, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না—হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। হায়, এমন দুর্ভাগিণী আমি, এত করিয়াও বাবাকে বাঁচাইতে পারিলাম না।

কুলসমের আয়ত চোখদুটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল। বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কুলসম আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কুলসমের দুঃখ ও ক্রোধ।

অরিন্দম বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কুলসম, যাহা হইয়া গিয়াছে, সে জন্য এখন কাঁদিলে কোন ফল নাই। এখন যাহাতে এই সকলের ঠিক প্রতিশোধ হয়, তাহা করিবে না কি? যাহাতে তোমার সেই পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন ভ্রাতৃঘ্ন পাপী নিষ্কৃতি না পায়, তাহাই কি এখন তো' একমাত্র কর্ত্তব্য নয়? উপযুক্ত প্রতিফল দিবে না?"

চক্ষু মুছিয়া কুলসম মুখ তুলিয়া ক্ষণেক অরিন্দমের মুখের দিকে ক্রোধ-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "সেই পাপীর গায়ে একটি আঁচড় লাগিবার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিব—

উপযুক্ত প্রতিফল ত দূরের কথা। ফুলসাহেব আমাদের সোণার সংসার শ্মশান করিয়া দিয়াছে, এখন আমাকে কোন রকমে হত্যা করিতে পারিলে পিশাচ নিষ্কণ্টক হইতে পারে। আমাদিগের বাটীতে আর একজন লোক থাকিতেন, তাঁহার নাম সিরাজউদ্দীন। আজ একমাস হইল, এমন কি পিশাচ আমার বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকেও কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। আজ অবধি তাঁহার কোন সংবাদ নাই। পিতা তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। তিনি ফুলসাহেবকে কখনও চিনিতে পারেন নাই, ফুলসাহেবের ষড়যন্ত্রে যে, সে কাজ হইয়াছিল, তাহা তিনি একবার সন্দেহও করিতে পারিলেন না। নিজে বিছানায় পড়িয়া; কি করিবেন, ফুলসাহেবকেই তাঁহার সন্ধান করিতে বলিলেন। কাজে কিছুই হইল না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ফুলসাহেব তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে; এখনও তাঁহাকে খুন করে নাই। সম্ভব সেই বিখ্যাত ডাকাত কালুরায়ের কাছে, তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।”

অরিন্দম বলিলেন, “তিনি তোমাদের কে হন?”

কুলসম বলিল, “সিরাজউদ্দীনের পিতা বসীরুদ্দীন আমার পিতার জমীদারীর প্রধান নায়েব ছিলেন, শুধু বসীরুদ্দীন কেন বসীরুদ্দীনের পিতা, পিতামহ বংশানুক্রমে আমাদিগের জমীদারীতে নায়েবী কাজে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বসীরুদ্দীন আমার পিতার আমল হইতে কাজ করিয়া আসিতে ছিলেন। তাঁহার সংসারে একমাত্র পুত্র সিরাজউদ্দীন ছাড়া আর কেহই ছিল না। আজ পনের বৎসর হইল বসীরুদ্দীনের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্রের বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। মৃত্যুকালে বসীরুদ্দীন আমার পিতার হাতেই সিরাজউদ্দীনকে সমর্পণ করিয়া যান; সিরাজউদ্দীন আবার যেরূপ নম্র, বিনয়ী

বাধ্য, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমার পিতার খুব স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। পিতা আপনার পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি সিরাজউদ্দীনের ভরণপোষণের জন্য, বিদ্যা শিক্ষার জন্য কিছুতেই এ পর্য্যন্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে এক কপর্দ্দক লইতেন না—নিজের ব্যয়ে সকলই নির্ব্বাহ করিতেন। সিরাজউদ্দীন ইদানীং কলিকাতায় একজন বিখ্যাত চিত্রকর সাহেবের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন, সে জন্য বেতন ও বাসাখরচ ইত্যাদিতে প্রায় মাসে পঞ্চাশ টাকা লাগিত। তাহাও আমার পিতা তাঁহাকে দিতেন। সিরাজউদ্দীন এখন কলিকাতায় থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন, তিন চারিদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। ফুলসাহেব হইতেই যে আমাদিগের সংসার ক্রমে ধ্বংসের দিকে যাইতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি বাবাকে কতবার বুঝাইয়াছিলেন; মায়াবী ফুলসাহেবের মোহমন্ত্রে বাবা এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই ফুলসাহেবের উপর তিলমাত্র সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তথাপি সিরাজউদ্দীন যখনই এখানে আসিতেন, বাবাকে ফুলসাহেবের জন্য অনেক বুঝাইতেন।"

অরি। এই এইমাত্র কারণেই কি ফুলসাহেব তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, না তাহার আর কোন উদ্দেশ্য আছে?

"আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, সেইটিই বোধ হয় প্রধান।" বলিয়া কুলসম একটু লজ্জিতভাবে নতমুখী হইল।

অরি। কি?

কুলসম উত্তর করিল না। সেইরূপ অবনত মস্তকে চুপ করিয়া রহিল। অরিন্দম বলিলেন, "লজ্জা করিয়া আমার কাছে কোন কথা অপ্রকাশ রাখিয়ো না।"

কুলসম নতমুখে বলিল, "তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল।"

অরিন্দম বলিলেন, "আমিও তাহাই মনে করিতেছিলাম। কালুরায় ডাকাতের নিকট তিনি যে বন্দী আছেন, এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

কু। একদিন ফুলসাহেব আমার বিমাতার এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল। আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়া ছিলাম।"

অ। কালুরায় যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত দস্যু তাহার হাত হইতে সিরাজউদ্দীনকে উদ্ধার করা সহজ কাজ নয়। তথাপি আমি তাঁহার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিব। এপর্য্যন্ত কোন গোয়েন্দা কালুরায়কে* ধরিতে পারে নাই। ধরা দূরে থাকুক, সে কোথায় থাকিয়া ডাকাতি করে, সে সন্ধানও কেহ করিতে পারে নাই। অনেকে তাহাকে ধরিতে গিয়া তাহারই হাতে প্রাণ দিয়াছে। আমিও তাহাকে ধরিবার জন্য অনেকবার অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি—কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

শুনিয়া কুলসমের মুখ শুখাইল। সে অরিন্দমের মুখে কালুরায়ের যে অখণ্ড প্রতাপের কথা শুনিল, তাহাতে তাহার হাত হইতে যে কখন সিরাজ মুক্তি পাইবেন, এ আশা তখন আর কিছুতেই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; নিরাশার অপরিহার্য্য উৎপীড়নে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। কুলসম সিরাজকে কত ভাল বাসিত, তাহা সে নিজেও কিছুই বুঝিতে পারিত না; সে ভালবাসা উদ্দাম, পরিপূর্ণ নিবিড় অথচ অতি চঞ্চল ও অধীর যৌবনের একটা আরও অধীর, আরও চঞ্চল আবেগময় মদিরোচ্ছ্বাস নহে; তাহা তাহার আজীবন ধরিয়া, তিল তিল করিয়া, খেলা ধূলায়, হাস্য পরিহাসে, গাথা গল্পে,

* দস্যুসর্দ্দার কালুরায়ের ভীষণ কাহিনী "শৈবলিনী" নামক পুস্তকে লিখিত হইবে।

একটা অতি গাঢ় আত্মীয়তার মধ্য দিয়া, দিনে দিনে তাহার হৃদয় এমন অল্পে অল্পে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল যে, কুলসমকে তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে দেয় নাই। তাহাতে বড় আসে যায় না। কুলসমের সেই অপার্থিব অগাধ অতি সরল একটা মনোবৃত্তি অটল নির্ভরতার সহিত প্রেমের মোহিনী মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া যাহার পদপ্রান্তে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল—সেই সিরাজ যে ইহার অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়া তিনি যে তাঁহার হৃদয়ের সকল দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, তাহারই জন্য সতত সমস্ত হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন, ইহাই কুলসমের যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত।

কুলসম শঙ্কাকুল হৃদয়ে অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তাঁহার উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই ?"

অরিন্দম বলিলেন, "এখন ত উপস্থিত কোন উপায় দেখিতেছি না ; তাঁহার উদ্ধারের জন্য শীঘ্রই আমি চেষ্টা দেখিব। তুমি ফুলসাহেবকে তোমার বিমাতার সহিত আর কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ করিতে কখনও শুনিয়াছ ? কামদেবপুরের থানায় একটি বালিকার লাস সমেত একটা কাঠের সিন্দুক চালান দিবার সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কখনও কি কোন কথা উঠিয়াছিল ?"

"তিন চারি দিন হইল. এক দিন ফুলসাহেব আমার বিমাতাকে ঐ রকমের একটা কি কথা বলিতেছিল, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই, সেই কথায় তখন তাহাদের মধ্যে একটা খুব হাসি পড়িয়া গিয়াছিল।"

"সেই সময় তাহাদিগকে কাহারও নাম করিতে শুনিয়াছ ?"

"তিন চারি জনের নাম করিয়াছিল, সে সব নাম আমি আগে কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই।"

"নামগুলি মনে আছে ?"

"হাঁ—গোরাচাঁদ, গোপালচন্দ্র,—"

"আর কি? তুমি যে তিন চারি জনের নাম শুনিয়াছ বলিলে।"

"আর দুইটি স্ত্রীলোকের নাম; বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের নাম আমাদের বড় মনে থাকে না—বিশেষতঃ সে নাম দুটি যেন কেমন একটু নূতন রকমের।"

"রেবতী? রোহিনী?"

"হাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন? ঐ দুটি নামই তখন তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম। এখন বেশ মনে পড়িতেছে।"

তখন অরিন্দমের চোখের উপর হইতে অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল, সম্পূর্ণ রহস্যময় একটা অতি জটীল প্রহেলিকার দুর্ভেদ্য যবনিকা সহসা দূরে সরিয়া গেল—অরিন্দম স্তম্ভিত হইলেন। কুলসমকে বলিলেন, "তোমার এখন বাড়ী যাওয়া হইবে না, এইখানে থাক। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তোমাকে আমি রাখিয়া আসিব।"

"কেন?"

"পরে জানিতে পারিবে।"

যোগেন্দ্রনাথ কুলসমকে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকট রাখিয়া আসিলেন। তাহার পর অরিন্দমকে লইয়া থানার দিকে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-মন্ত্রণা।

থানার একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দমের একটা গুপ্তমন্ত্রণা চলিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে উভয়ে বাহিরে আসিলেন। যোগেন্দ্রনাথ এক জন দারোগাকে ডাকিয়া তাহাকে ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধরিতে অনুজ্ঞা করিলেন, সহজে কেহ না চিনিতে পারে এমন একটা ছদ্মবেশে নিজেও সাজিলেন। অরিন্দম সেই বেশেই রহিলেন। তখনই তিন জনে একখানি গাড়ীতে উঠিয়া অতি সত্বর ফুলসাহেবের গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময় যোগেন্দ্রনাথ দশ জন পাহারাওয়ালাকে কিছুক্ষণ পরে ফুলসাহেবের বাটীর নিকটবর্ত্তী একটি গুপ্তস্থানে উপস্থিত হইতে বলিয়া গেলেন।

যথা সময়ে সকলে ফুলসাহেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফুল সাহেবের বাড়ীখানি মন্দ নহে, দ্বিতল—ছোটর উপর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; সম্মুখে একখানি ছোট ফুলের বাগান। বাগানে দুই একটি করিয়া অনেক রকম ফুলের গাছ। সেই বাগানের ধারে এক জন মালী বসিয়াছিল—তাহাকে যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু, এখন আছেন কি?"

মালী বলিল, "উপরে আছেন, একটু পরে নীচে আসিবেন।"

বাহিরের একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়া তিন জনে উপবেশন করিলেন। তখন সেখানে আর কেহই ছিল না। অরিন্দম নীরবে এক স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না—তিনি নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। সেখানে গিয়া একটি অবরুদ্ধ কক্ষমধ্যে দুই ব্যক্তিকে

কথোপকথন করিতে শুনিলেন। সেই দুইজনকে তিনি তখন না দেখিতে পাইলেও কণ্ঠস্বরে তদুভয়কে বেশ চিনিতে পারিলেন, এক জন ফুলসাহেব অপর লোকটি সেই গোরাচাঁদ। যে কক্ষে বসিয়া তাহারা কথোপকথন করিতেছিল, সেই কক্ষের দ্বারে একটি অঙ্গুলি দিয়া ধীরে ঠেলিয়া দেখিলেন, তাহা ভিতর হইতে অবরুদ্ধ। তিনি সেই কবাটের উপর কর্ণ রাখিয়া তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

ফুলসাহেব। কেমন, তুমি কি বোধ কর, এদিকের কাজ অনেকটা শেষ করিয়া আনিতে পারি নাই?

গোরা। এখন এই শেষটা রাখাই বড় শক্ত কথা।

ফুল। তুমি সহায় রহিয়াছ, জুমেলিয়া সহায় রহিয়াছে, ইহাতেও যদি শেষ রাখা শক্ত কথা হয়, তবে আর সহজ হইবে কিসে?

গো। জুমেলিয়ার সাহায্য না পাইলে বোধ হয়, আপনি এত শীঘ্র এতটা কাজ কখনই হাঁসিল করিতে পারিতেন না।

ফু। জুমেলিয়াই আমার দক্ষিণ হস্ত। সেই জন্যই ত কৌশল করিয়া আমি আগে তমীজউদ্দীনের স্ত্রীকে মারিয়া তাহারই আসনে জুমেলিয়াকে মতিবিবি করিয়া বসাই। তার পর সেই জুমেলিয়ারই খাতিরে তমীজউদ্দীনের সংসারে আমার একাধিপত্য। কিন্তু জুমেলিয়াকেও বিশ্বাস করিতে আমার প্রাণ চায় না—সে আমার একটা উপপত্নী ব্যতীত আর কেহই নয়। তা ছাড়া তার কূটবুদ্ধিতে তার সাহসে, তার পরাক্রমে অনেক সময় সে আমাকেও ছাড়াইয়া অনেক দূর উঠে। সেই জন্য একটু ভয় হয়, আমাকে আবার কোন রকমে ফাঁকি না দেয়।

গো। একজন স্ত্রীলোক আপনাকে ফাঁকি দেবে? সেই জন্য আবার আপনার ভয় হয়? শুনে হাসি পায়।

ফু। জুমেলিয়াকে যে সে স্ত্রীলোক মনে করিয়ো না, জুমেলিয়ার

যেরূপ ক্ষমতা—যেরূপ মনের বল, অনেক পুরুষেরও এমন নাই। সে না করিতে পারে এমন কাজ কিছুই নাই। জুমেলিয়ার সাহায্য না পাইলে তমীজউদ্দীনের সংসার হইতে তিনটি প্রাণীকে এত সহজে আমি মৃত্যু-মুখে তুলিয়া দিতে পারিতাম বলিয়া বোধ হয় না। দেখ দেখি, কেমন নির্ব্বিঘ্নে তিন তিনটি খুন হইয়া গেল, অথচ কেহ কিছুই জানিল না—কেহ একটু সন্দেহও করিতে পারিল না। এরূপ বেমালুম খুন করিবার এক শত আট রকম বিষ আমার হাতে আছে; তমীজউদ্দীনের বাড়ীতে যে বিষ ব্যবহার করিয়াছিলাম, প্রত্যহ খাবার জলের সঙ্গে এক বার এক ফোটা করিয়া দিলে, ঠিক ছয় মাসের মধ্যে মানুষ মরে, খুব বলিষ্ঠ হইলে আট মাসও লাগে—স্ত্রীলোককে চারি মাসের অধিক খাওয়াইতে হয় না। তবে শীঘ্র কাজ শেষ করিতে হইলে রোজ দুই ফোঁটা এমন কি তিন ফোঁটা করিয়া খাওয়ান চলে—তার বেশি দেওয়া চলে না—তাহা হইলে জলটা একটু কষায় বোধ হয়। অরিন্দমকে চুরুটের সঙ্গে যে বিষ দিয়া হত্যা করিলাম, উহাতে দশঘণ্টার মধ্যে যেমন বলবান লোক হউক না কেন নিশ্চয়ই মরিবে?

গো। অরিন্দমকে হত্যা করায় ঐখানেই সকল কার্য্যের গোড়া বাঁধা হইয়াছে। এখন আর কাহাকে ভয় করিব?

ফু। অরিন্দম বড় সহজ লোক ছিল না; আজ কাল না হক্, দুই দিন পরে না হক্, এক সময় না এক সময় সে আমাকে ধরিতে পারিত। লোকটি বড়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছিল, তা বলিয়া আমি তাহাকে কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য ভয় করি নাই। ঐ রকম সাতটা অরিন্দম যদি মিলিয়া একটা হইয়া আসিত—তাহা হইলেও ফুলসাহেব তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত না—ভয় কাহাকে বলে এপর্য্যন্ত ফুল সাহেবের অদৃষ্টক্রমে সে শিক্ষা হয় নাই।

গো। অরিন্দম শুধু বুদ্ধিমান ছিল না—বলবানও যথেষ্ট ছিল, সে দিন সেই মাঠে লইয়া তাহাকে হত্যা করিতে গিয়া সে প্রমাণ আমি বেশ পাইয়াছি। আগে আমার এমন বিশ্বাস ছিল না যে, কোন লোক আমাকে শীঘ্র কাবু করিতে পারে। সে যাই হোক আমার বোধ হয়, সেই সময়ে যদুনাথ গোস্বামীর সেই পত্রখানি অরিন্দম আমার কাছ থেকে হস্তগত করিয়া থাকিবে ; সে পত্রে অনেক কথা খুলিয়া লেখা ছিল। তাহাতেই সে তখন রেবতীর মাতামহকে খবর দিয়া যদুনাথের বাড়ী থেকে রেবতীকে সরাইয়া দেয়।

ফু। তুমি ভুল বুঝিয়াছ, রেবতী যে মাতামহের নিকট গিয়াছে এ কথা একটা ছলমাত্র—রেবতীর সন্ধান করিতে না পারিলে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যখন অরিন্দমকে এ সংসার হইতে বিদায় করিতে পারিয়াছি, তখন আর ভয় কি ? সকল কাজই আমরা নির্ব্বিঘ্নে অথচ খুব শীঘ্রই শেষ করিয়া উঠিতে পারিব।

গো। এদিকে রেবতীকে সন্ধান করিয়া শীঘ্র বাহির করিতে না পারিলে, গোপালচন্দ্রের নিকট একটি পয়সাও পাবার সম্ভাবনা নাই।

ফু। তাহাতো জানি, তুমি কি মনে কর, সে জন্য আমি কোন চেষ্টা করিতেছি না ? অরিন্দম যখন মরিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি ? আমি সকল সন্ধান রাখিয়া থাকি। ইদানীং যে, অরিন্দম কেশব চন্দ্রের সন্ধানে ঘুরিতেছিল, তাহাও জানি ; কিন্তু বোকারাম জানিত না যে, তার কেশবচন্দ্র এদিকে ফুলসাহেব-মূর্ত্তিতে তার চোখের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অরিন্দম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বটে—ততদূর নহে, কারণ পূর্ব্বেই তিনি অনেকটা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। আরও মনোযোগের সহিত, কবাটের উপর কাণ রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ বলিল, "এখন কুলসম যদি আপনাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করে, আপনি ত অনেকটা তফাতে পড়িলেন।"

ফুলসাহেব বলিল, "না স্বীকার করে তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা যেখানে গিয়াছে, কুলসমকেও সেখানে পাঠাইব।"

গো। কুলসমকে হত্যা করিলেই একটা গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ফু। কিছু না—কিছু না। এমনভাবে কাজ করিব যে কেহ জানিতে পারিবে? হা—হা—হা (হাস্য) তা হ'লে তুমিও এখন আমাকে ঠিক চিনিতে পার নাই, দেখিতেছি। দিনকে রাত করিতে পারে, রাতকে দিন করিতে পারে, এমন ক্ষমতা ফুলসাহেবের যথেষ্ট আছে।

গো। আমিও তা যথেষ্ট জানি। সিরাজউদ্দীনকে কতদিন সেই-খানে রাখিবেন?

ফু। যত দিন আবশ্যক বোধ করিব।

গো। কুলসমকে আগে বিবাহ করিয়া, তাহার পর তাহাকে কি ছাড়িয়া দিবেন?

ফু। তার কোন ঠিক নাই; হয় ত সিরাজও মরিবে। তাহাকে যে এত দিন খুন করি নাই, তাহার একটা কারণ আছে। শুধু কুলসমের জন্য তাহাকে আমি সেখানে আটক রাখি নাই। ইহার ভিতর আমার আর একটা অভিপ্রায় আছে।

গো। সে অভিপ্রায়টা কি?

ফু। পারে জানিতে পারিবে। এখন থাক্।

এই বলিয়া ফুলসাহেব উঠিল, উঠিয়া বলিল, "তুমি বসো, আমি নীচে থেকে এখনই আসিতেছি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ফুলসাহেব ধরা পড়িল।

অরিন্দম তখন তাড়াতাড়ি নীচের সেই বৈঠকখানায় আসিলেন। সেখানে ছদ্মবেশী যোগেন্দ্রনাথ ও সেই দারোগা বসিয়াছিলেন। উভয়েই অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?" "ডাক্তার আসিতেছে।" বলিয়া অরিন্দম সেইখানে এক খানা বেঞ্চের উপর নিজের দীর্ঘ দেহটি ছড়াইয়া দিলেন, এবং তখন তাঁহাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন। তাহার পর নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুদিলেন।

তখনই ডাক্তার ফুল সাহেব সেই বৈঠকখানার দ্বারের উপর দেখা দিলেন।

ছদ্মবেশী দারোগা বলিল, "আমরা অনেকদূর হইতে আসিতেছি। (অরিন্দমকে দেখাইয়া) এই লোকটির মূর্চ্ছারোগ আছে; প্রত্যহ দুই বার তিন বার মূর্চ্ছা যায়; এতক্ষণ ভাল ছিল—এখানে আসিয়া আবার রোগে ধরিয়াছে; ভালই হইয়াছে, ইহাতে রোগ কি আমাদিগকে আর ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না—আপনি রোগীকে দেখিয়াই ঠিক করিতে পারিবেন।"

কোন কথা না কহিয়া ফুলসাহেব অরিন্দমের দিকে অগ্রসর হইল। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিয়া—চিনিয়া—অভাবনীয়রূপে চমৎকৃত হইয়া দুই পদ পশ্চাতে হটিয়া আসিল। মুখ চোখের ভাব বদলাইয়া গেল। সে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত—তখনই তাড়াতাড়ি পকেটের ভিতর হইতে

একখানি শাণিত, দীর্ঘছুরি বাহির করিয়া অরিন্দমের বুকে বিদ্ধ করিবার জন্য উর্দ্ধে তুলিল। বাতায়নপ্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মি লাগিয়া ছুরিখানা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ পশ্চাদ্দিক হইতে দুই হাতে ফুল সাহেবের সেই হাতখানি ঘুরাইয়া ধরিয়া ফেলিলেন। অরিন্দম উঠিয়া তাহার অপর হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন, এবং দারোগাও তদুভয়ের সাধ্যমত সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। চারি জনে তখন সেই ঘরের ভিতর একটা ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। ফুলসাহেব এত বলবান যে, অরিন্দম, যোগেন্দ্রনাথ আর দারোগা তিন জনে মিলিয়াও শীঘ্র তাহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না। সেই ঘরের ভিতর একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল—ফুল সাহেব সহজ নহে, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পরে সেই তিন জন পুলিস-কর্ম্মচারীর একান্ত জেদাজেদি ও আগ্রহাধিক্যে অতি পরিশ্রমের পর ফুলসাহেবের হাতে তিন যোড়া হাতকড়ি দৃঢ়সংলগ্ন হইল।

ফুলসাহেব ধরা পড়িল।

তার পর গোরাচাঁদের অনুসন্ধান করা হইল—তাহাকে পাওয়া গেল না। সে বাহিরের গোলযোগ শুনিয়া ইতোমধ্যে ভিতর বাটীর একটা জানালা ভাঙ্গিয়া, নিজের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল।

অরিন্দম উপহাসের মৃদুহাস্যে ফুলসাহেবকে বলিলেন, "কেমন গো ডাক্তারবাবু, এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, অরিন্দম মরে নাই—ঠিক আগেকার মত বাঁচিয়া আছে?"

অরিন্দমের কথা শুনিয়া ফুলসাহেবের মুখে একবার সেই চিরাভ্যস্ত অপূর্ব্বভঙ্গীতে-এক-অপূর্ব্বরহস্যপ্রাপ্ত অমঙ্গলের মৃদু হাসি দেখা দিল। সদর্পে সেই হাসির সহিত মিষ্টকণ্ঠে বলিল, "যতক্ষণ ফুলসাহেব বাঁচিয়া আছে, ততক্ষণ অরিন্দম না মরিলেও মরিতে বেশিক্ষণ নয়—ততক্ষণ

জেকে নিরাপদ মনে করা অরিন্দমের মহা ভ্রম।" তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল, "শোন, অরিন্দম, যদি কোন রকমে কখনও তোমাদের হাত হইতে পলাইতে পারি, তখন দেখিয়ো আবার এই ফুলসাহেব আরও কি নিদারুণভাবে—আরও কি এক আশ্চর্য্য কৌশলে তোমাকে মরণের মুখে তুলিয়া দেয়।" বলিয়া অয়স্কঙ্কনাবদ্ধ হাত দুইখানি রাগ ভরে সম্মুখে উৎক্ষিপ্ত করিল—হাতকড়াগুলি পরস্পর আঘাত পাইয়া সেই সঙ্গে ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল।

সকলে মিলিয়া ফুলসাহেবকে থানার দিকে লইয়া চলিলেন। পূর্ব্বে যে দশ জন পাহারাওয়ালাকে যোগেন্দ্রনাথ আসিতে বলিয়াছিলেন, পথে তাঁহাদের সহিত দেখা হইল।

অরিন্দম এক জন পাহারাওয়ালা ও সেই দারোগাকে সঙ্গে লইয়া কুলসমের বাটী-অভিমুখে চলিলেন। আর সকলে ফুলসাহেবকে লইয়া থানায় উঠিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জুমেলিয়া ধরা পড়িল।

ফুলসাহেব ধরা পড়িয়াছে। সে খুনী—সে দস্যু—সে জালিয়াৎ এবং সে ভয়ানক লোক, সুতরাং তাহার ফাঁসী হইবে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে কথাটি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাটীতে বসিয়া জুমেলিয়া ওরফে মতি বিবি সে কথা শুনিল। প্রথমে বিশ্বাস করিল না—হাসিয়া কথাটাকে মন হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিল। তাহার পর অনেকের মুখে সেই একই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইল। তখন আপনার শয়ন-গৃহে যাইয়া, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মতিবিবি

ঝটিকাছিন্ন মাধবীলতার ন্যায় নিজের অবসন্ন দেহখানিকে প্রশস্ত বিছানার উপর বিস্তৃত করিয়া দিল। অনেক রকম দুর্ভাবনায় তাহার সমস্ত হৃদয় উপদ্রুত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিল।

এমন সময় বাহির হইতে সেই অবরুদ্ধ দ্বারের উপর করাঘাতের গুম্ গুম্ শব্দ হইতে লাগিল। জুমেলিয়া সচকিতে উঠিয়া বসিল—(আমরা জুমেলিয়াকে মতিবিবি না বলিয়া জুমেলিয়াই বলিব।) জুমেলিয়া দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

বাহির হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি আমিনা।"

আমিনা তমীজউদ্দীনের সংসারের নবীনা দাসী। কিন্তু সে দাসীর মতন থাকিত না—সে নিজের বুদ্ধিচাতুর্য্যে প্রভু-কন্যার সহচরীপদ লাভ করিয়াছিল।

জুমেলিয়া বলিল, "কেন ? কি দরকার ?"

আমিনা বলিল, "দরজা খোল—বলিতেছি—অনেক কথা আছে।"

জুমেলিয়া উঠিয়া কবাট খুলিয়া দিল, দেখিল, বারান্দার উপর দ্বারের সম্মুখে অরিন্দম, একজন দারোগা, একজন পাহারাওলা ভীষণ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া এবং আমিনা হাসিয়া পলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, বুঝিতে বাকী রহিল না ফুলসাহেব ধরা পড়ায় সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে, আর আমিনা কৌশল করিয়া তাহাকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিল। নিদারুণ রোষে তাহার মুখ চোখ আরক্ত হইয়া গেল এবং চোখ দুটি উল্কাপিণ্ডবৎ জ্বলিয়া উঠিল—কোন কথা কহিতে পারিল না; সেই মুহূর্ত্তেই—এই অংশটি পাঠ করিতে পাঠকের যতটুকু সময় ব্যয় হইল—তাহার শতাংশের একাংশও লাগিল না জুমেলিয়া সবেগে গিয়া বাম হস্তে আমিনার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—সেই সঙ্গে অপর হস্তে কটীর বসনাভ্যন্তর হইতে এক

নি শাণিতোজ্জ্বল তীক্ষ্ণাগ্র অতি দীর্ঘ কিরীচ বাহির করিয়া তাহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল—পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া কিরীচের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল; জুমেলিয়া তখনই কিরীচ টানিয়া তুলিয়া লইল। "বাবারে—মারে—গেছিরে" বলিয়া আমিনা সেইখানে পড়িয়া শোণিতাক্ত কলেবরে লুটাইতে লাগিল এবং প্রবলবেগে রক্ত বাহির হইয়া সেখানকার অনেকটা স্থান প্লাবিত করিল। তখন সেই পিশাচীর সম্মুখীন হওয়া কতদূর শঙ্কাজনক তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। দারোগা ও পাহারাওয়ালা ভয়ে দুই পদ হটিয়া দাঁড়াইল। অরিন্দম বুঝিলেন, এ সময় ভয় করিলে চলিবে না—বরং তাহাতে বিপদ আছে; যেমন বুক হইতে জুমেলিয়া কিরীচখানি টানিয়া তুলিয়াছে, অমনি ছুটিয়া গিয়া অরিন্দম সেই কিরীচ সমেত হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। দারোগা ও পাহারাওয়ালা তখন সত্বর হইয়া জুমেলিয়ার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল। কিন্তু জুমেলিয়া সেই সময়ে অকর্ম্মণ্য দক্ষিণ হস্ত হইতে বামহস্তে সেই কিরীচখানি লইয়া ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি অরিন্দমকে আঘাত করিতে গেল—অরিন্দমকে না লাগিয়া সেই লক্ষভ্রষ্ট কিরীচ পার্শ্ববর্ত্তী পাহারাওয়ালার কটিদেশে লাগিয়া, অনেকটা বিদ্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে ক্ষত স্থান চাপিয়া, আমিনার মতন সেও রক্তপ্লাবিত দেহে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দারোগা তখন দুইহাতে জুমেলিয়ার কিরিচ সমেত হাতখানি চাপিয়া ধরিল; অরিন্দম জোর করিয়া জুমেলিয়ার হাত হইতে কিরিচখানি কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে নিজের হাতের দুই এক স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল; অরিন্দম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, জুমেলিয়ার হাতে ডবল হাতকড়া লাগাইয়া দিলেন।

জুমেলিয়া ধরা পড়িল।

অরিন্দম পূর্ব্বে জুমেলিয়াকে যত সহজে গ্রেপ্তার করিবেন ম করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। অরিন্দম তখন বুঝিতে পারিলেন, জুমেলিয়ার মত এমন প্রখরা, প্রবলা, দুর্দ্দমনীয়া, মরিয়া স্ত্রীলোক আর কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দুইজনকে আহত করিয়া তাহার পর সে ধরা পড়িল। দৃঢ়স্বরে জুমেলিয়া অরিন্দমকে বলিল, "বড় জোর কপাল তোমার, অরিন্দম! তাই তুমি আমার হাত হইতে আজ পার পাইলে, যদি আর একটু অবসর পাইতাম—যদি এত শীঘ্র আমাকে নিরস্ত্র হইতে না হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে কেমন করিয়া তোমার রক্তে আমি স্নান করিতাম।"

অরিন্দম বলিলেন, "ফুলসাহেবের উপপত্নীর পক্ষে এ বড় আশ্চর্য্য কথা নহে।"

জুমেলিয়া বলিল, "আমি ফুলসাহেবের উপপত্নী? এ মিথ্যাকথা তোমায় কে বলিল?"

অরিন্দম বলিলেন, "জুমেলিয়া, আমি ফুলসাহেবের মুখে শুনিয়াছি, তুমি বিষ দিয়া কুলসমের পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছ, তাহাও আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি।"

জুমেলিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! ইহাও কি ফুলসাহেব স্বীকার করিয়াছে?"

অরিন্দম বলিলেন, "হাঁ।"

জুমেলিয়া বলিল, "তবে আমিও স্বীকার করিতেছি। (ক্ষণপরে) এখন আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?"

অরিন্দম বলিলেন, "যেখানে তোমার পাপের ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

জুমেলিয়া বলিল, "চল যাইতেছি, কিন্তু শুনিয়া রাখ, নির্ব্বোধ

রিন্দম! সর্পিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী জুমেলিয়াকে ঘাঁটাইয়া তুমি ভাল কাজ করিলে না, তুমি সাধ করিয়া সাপের গায়ে হাত দিয়াছ—ইহার উপযুক্ত প্রতিফল তোমাকে এক দিন ভোগ করিতেই হইবে।"

অরিন্দম ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "সেজন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না—আমার ভাবনা ভাবিতে আমার যথেষ্ট অবসর আছে। অরিন্দম তোমার মত সাতটা জুমেলিয়াকে তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করে।"

জুমেলিয়া একটা উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া—হাসিতে হাসিতে বলিল, "আরে যাও, অরিন্দম, আর মুখ তুলিয়া কথা কহিয়ো না, ছি ছি —তাই একটা স্ত্রীলোককে ধরিতে একলা আসিতে সাহস কর নাই— দল বাঁধিয়া আসিয়াছ—ধিক্ তোমায়! এখন দেখিতেছি, তোমার মত কাপুরুষের দেহে অস্ত্রাঘাত না করিয়া আমি ভালই করিয়াছি— তাহাতে আমার হাত কলঙ্কিত হইত।"

জুমেলিয়াকে লইয়া অরিন্দম ও দারোগা থানায় চলিলেন। সেই কথা লইয়া তখনই গ্রামের মধ্যে আবার একটা ঢি ঢি পড়িয়া গেল।

অনতিবিলম্বে আমিনার প্রাণ বিয়োগ হইল। আঘাত তেমন সাংঘাতিক না হওয়ায়, সেই পাহারাওয়ালার প্রাণটা তখনকার মত থাকিয়া গেল।

ফুলসাহেব ও জুমেলিয়াকে তথাকার জেলখানার এক ঘরে দুই জনকে হাজত-বন্দী রাখা হইল। অধিকন্তু তদুভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে এক জন প্রহরী চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে ফিরিতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড

সর্পিণী—সুবর্ণরূপা

Think not I love him, though I ask for him;
*   *   *   *   *   *   *
I love him not, nor hate him not, and yet
I have more cause to hate him than to love him:
For what had he to do to chide at me?
He said mine eyes were black, and my hair black
And now I am remember'd, scorn'd at me.

Dodd's Beauties of Shakspeare.

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু-চুম্বন।

যে দিন ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া ধরা পড়ে, সেই দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আকাশ মেঘ করিয়া বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল। সেই দিগন্তব্যাপী মেঘে বাতাস বন্ধ হইয়া এমন একটা গুমোট করিল যে, নিশ্বাস ফেলাও একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারময় কৃষ্ণমেঘ হইতে অন্ধকারের পর অন্ধকার নামিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঢাকিয়া—ভূতল হইতে আকাশতল ব্যাপিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল। সেই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে উন্নত, দীর্ঘশীর্ষ, শাখাপ্রশাখাপল্লববহুল বৃক্ষগুলি বিকটাকার দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক, নিকটে অন্ধকার—দূরে আরও অন্ধকার—বহুদূরে তদপেক্ষা আরও অন্ধকার—সেখানে দৃষ্টি চলে না। সেই ভয়ানক বিভীষিকাময় অন্ধকার রাত্রির দ্বিপ্রহরের শেষে হাজতঘরের ভিতর হস্তপদবদ্ধ ফুলসাহেব একপাশে পড়িয়া

অমানুষিক নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিজের গভীর নিদ্রার পরিচয় দিতে-ছিল। একটু দূরে জুমেলিয়া জাগিয়া বসিয়াছিল—এবং বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছিল, তাহারই কতক অংশ গরাদাযুক্ত লৌহনির্ম্মিত দ্বারের ভিতর দিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে পড়িয়াছিল; তাহারই এক খণ্ড আলোক লাগিয়া জুমেলিয়ার মুখমণ্ডল বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল; সে মুখ ম্লান নহে—বিষণ্ণ নহে—তাহাতে চিন্তার কোন চিহ্ন নাই। বরং কিছু প্রফুল্ল, দ্বার সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী ঘন ঘন পরিক্রমণ করিতেছিল —আর সেই প্রফুল্ল মুখ সতৃষ্ণ নেত্রে দেখিতেছিল। সেই চন্দ্রশূন্য, তারাশূন্য, দিগ্‌দিগন্তশূন্য, শব্দশূন্য, মেঘময় অন্ধকারময়, বিভীষিকাময় রজনীর অনন্ত ভীষণতার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি কত সুন্দর—পাঠক, তুমি আমি ঠিক বুঝি না—প্রহরীর তখন সে সৌন্দর্য্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। প্রহরীর মুখ চোখের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া জুমেলিয়ার বুঝিতে বাকি ছিল না, যে প্রহরী পতঙ্গ তাহার রূপাগ্নিতে ঝাঁপ দিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিয়া, যখন প্রহরী আর একবার ঘুরিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তখন জুমে-লিয়া তাহার সেই যেমন চঞ্চল তেমনই উজ্জ্বল-নেত্রে প্রহরীর প্রতি এক বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বেচারা বড় বিভ্রাটে পড়িল, সে সচেতন থাকিয়াও অচেতনের মত হইল, এবং তাহার আপাদ মস্তক ব্যাপিয়া একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, পা কাঁপিতে লাগিল, বুক ধড়ফড়্ করিয়া উঠিল, সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল, কান ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল এবং দেহের লোমগুলি পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া —সেখান হইতে সরিয়া—দূরে গিয়া একটি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুকের ভিতর সেই দব্‌দবানিটা কিছুতেই গেল না। প্রহরী

তখন নিজের অবস্থা যত বুঝিতে নাই পারুক্ ; জুমেলিয়া সম্পূর্ণরূপে পারিল। ভাবিল, ঔষধ ধরিয়াছে।

প্রহরী আবার ঘুরিয়া দ্বার-সম্মুখে কম্পিতপদে ফিরিয়া আসিতে, জুমেলিয়া তাহাকে বলিল, "পাহারাওয়ালাজী, আমাদের জন্য তোমার কত কষ্ট হচ্ছে—"

প্রহরী মোলায়েমস্বরে বলিল, "আরে স্থহি স্থহি—ইএ হাম্‌রা আপ্‌না কাম্ হ্যায়।"

জুমেলিয়া পূর্ব্ববৎ মিষ্টকণ্ঠে বলিল, "তা যাই বল পাওরলাজী, এ মানুষের উপযুক্ত কাজ নয়—এই রাত্রে কোথায় স্ত্রীকে বুকে নিয়ে ঘুমুবে, না বন্দুক ঘাড়ে করে, হরঘড়ি একবার এদিক, একবার ওদিক করে ঘুর্‌ছো।"

প্রভুভক্ত প্রহরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যিস্‌কো নিমক্ খাঁয়্, উস্‌কো কাম্ জান্ দেকে কর্‌না চাহিয়ে।"

তাহার পর জুমেলিয়া এ কথা সে কথা অনেক আবান্তর কথা পাড়িল, তাহার পর অনেক সুখ দুঃখের কথা উঠিল, বিরহব্যাথার কথা উঠিল, জুমেলিয়া প্রহরীর দুঃখে অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইল। তাহার সহানুভূতিসূচক কথাগুলি বীণাগীতিবৎ প্রহরীর শ্রুতিতে সুখজনক আঘাত করিতে লাগিল। জুমেলিয়া বলিল, "আচ্ছা পাহারাওলা সাহেব, তুমি ত, আজ পাঁচ বৎসর বাড়ী যাও না—তোমার স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে কেমন করে আছে। আমি হলেত তোমায় এক দণ্ড চোখের তফাৎ কর্‌তেম না—তাতে খেতে পাই ভাল,বহুৎ আচ্ছা—না খেতে পাই, সে বহুৎ আচ্ছা।"

পাহারাওয়ালা সহাস্যে বলিল, "আপ্ লোক বড়া আদ্‌মী, সভ্‌ভি কর্ সক্‌তা। অউর্ হম্‌লোগ্ গরীব আদ্‌মী, আগে পেট্‌কা ধান্দা কর্‌নে পড়্‌তা।"

জুমেলিয়া বলিল, "তোমার কয়টি ছেলে?"

প্রহরী। দো লড়্কা অউর ছও মাহিনেকী এক্ লেড়্কী হুয়া।

জু। তুমি ত আজ তিন বৎসর দেশে যাওনি, তবে এর মধ্যে আবার ছয় মাহিনেকী এক লেড়্কী এল কোথা থেকে?

প্রহরী মাথা নাড়িয়া সগর্ব্বে বলিল, "আরে ক্যায়াবাৎ, হম্ হর্ মাহিনো চিঠ্ঠি ভেজ্তা, অউর জবাব্ভি আতা, ইসি হাল্সে মেরা বড়্ লড়্কা ভিখুরাম্ নে পয়দা হুয়া থা?"

জু। আরে পোড়ার মুখ, চিঠি লিখ্লে লেড়্কা পয়্দা হবে কি করে?

প্র। হম্লোগ্কো চিঠ্ঠিমে সব কাম হোতা।

কথা শুনিয়া জুমেলিয়া খুব একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "তুমি ভিখুর মাকে খুব ভাল বাস?"

প্র। ক্যায়া ভিখুমায়কি ভালা বুরা?

জু। না না—তোমরা যাকে পিয়ার করা বলো।

প্র। হাঁ হাঁ, বহুৎ পিয়ার কর্তে হেঁ।

জু। ভিখুর মা দেখিতে আমার চেয়ে সুন্দরী?

প্র। আরে রাম রাম—তোম্রে মাফিক্ খাপসুরৎ হনেসে হম্রা হাজার রূপয়া তলব মিল্নেসে এক ঘড়ি নহি ছোড়্ দেতা।

জু। এখন একথা বলিতেছ, তখন বোধ হয় মুখের দিকে ফিরিয়াও চাহিতে না; হয়ত—হয়ত কেন? নিশ্চয়ই দেশে আমাকে একা ফেলে রেখে এখানে এসে কোম্পানির সাজগোছের সঙ্গে, চাপরাসের সঙ্গে, আর সঙিন্দার বন্দুকটির সঙ্গে প্রণয় বেশ জাঁকিয়ে ফেল্তে। পাহারাওলাজী, তুমি ত এখানে কোম্পানী বাহাদুরের পাহারা দিচ্ছ, সেখানে ভিখুর মার পাহারার ভার কার উপর দিয়ে এসেছ? সেখানে যদি লুট হয়ে যায়।

প্রহরী জুমেলিয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এয়্সা জহরৎ ছোড়্কে কোই সিসা লুট্নে যাতা হ্যায় ?"

জু। আমি কি খুব ভাল জিনিষ ? একেবারে জহরৎ ?

প্র। আলবৎ—ইস্‌সে ক্যায়া সক্ হ্যায় ?

জু। দেখ, দুর্ব্বল সিং।

প্র। হাম্‌রা নাম দুর্ব্বল সিং নহি হ্যায়।

জু। তবে কি মরণাপন্ন সিং ?

প্র। নহি নহি—হাম্‌রা নাম লঙ্কেশ্বর সিং।

জু। বাহবা কি বাহবা! চমৎকার নাম, ওই যে কি বল্‌ছিলেম, ভাল,—হাঁ মনে হয়েছে, দেখ লঙ্কেশ্বর সিং, বলিতে লজ্জা হয়—তোমাকে দেখে অবধি আমার মন্‌টা যেন কিস্ মাফিক্ হচ্ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। তোমার ওই আলু চেরা চোখ, ওই হাতীর মত নাক, ওই শতমুখীর মত গোঁফ, আর ঝাউবনের মত দাড়ী আমার মাথা খেয়েছে,—ইচ্ছা করে তোমাকে নিয়ে বনে গিয়ে দুজনে মনের সুখে বাস করি। তা বিধাতার কি মর্‌জি, তোমার হাতে আমাকে না দিয়ে (ফুল-সাহেবকে দেখাইয়া) এই খুনের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছে। তুমি যদি এখন পায়ে স্থান দাও, তবে এ জীবনটা সার্থক হয়।" এই বলিয়া জুমেলিয়া আবার এক কটাক্ষ করিয়াছিল। তাহাতেও লঙ্কেশ্বর সিং এখনও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, সুতরাং লঙ্কেশ্বর ধন্যবাদার্হ। সে যে তখনও ঘুরিয়া পড়ে নাই, ইহাই যথেষ্ট; কিন্তু, সে তখনও না ঘুরিয়া পড়িলে তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল এবং প্রাণটা বুকের ভিতর মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। সে শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া অবাঙ্মুখে জুমেলিয়ার কথা শুনিতেছিল। শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইল এবং লোভটা অত্যন্ত প্রবল এবং অদম্য হইয়া উঠিল। বলিল, "আরে, নহি নহি এয়্সা বাৎ মৎ বলো; তুম্

হাম্‌কো পায়ের মে রাক্কো তো হম্‌ তুম্‌কো শির্‌মে র‍্যাক্কে। মেরে নসিবকা জোর এয়াসা হোগা, তুম্‌ হম্‌কো এত্তা মেহেরবানী করেগী।

জু। আমি ত মেহেরবানি কত্তে খুব রাজি আছি, এখন তুমি যদি একটু মেহেরবানি কর তবে বুঝ্‌তে পারি।

প্র। তুম্‌ হাম্‌সে দিল্লগী কর্‌তী হৈ।

জুমেলিয়া বলিল, "না লক্ষেশ্বর সিং, তোমার দিব্বি, আমি একটুও দিল্লাগী করিনি—আমি সত্যি কথাই বল্‌ছি, তোমাকে দেখে অবধি আমার মনটা একদম্‌ মজে গেছে। দেখ, লক্ষেশ্বর সিং, যদি কোন রকমে তুমি একটা চাবি যোগাড় করিতে পার, তাহা হইলে এখানে যে পাঁচ সাত দিন থাকি, এমনি রাত্রে আমার স্বামী ঘুমাইলে রোজ দুই দণ্ড তোমার সঙ্গে আমোদ করিতে পারি।"

প্রহরী অতিশয় উৎসাহিত হইয়া বলিল, "একঠো পুরাণা চাবি হ্যায়; ও চাবি সব হাতকড়িমে লাগ্‌তা যাতা।

তালার পরিবর্ত্তে দ্বারে হাতকড়ি লাগানো ছিল। এখানে তালার পরিবর্ত্তে হাতকড়ির ব্যবহার হইয়া থাকে। লক্ষেশ্বর কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া হাতকড়ি খুলিয়া জুমেলিয়াকে বাহিরে আনিল। আবার হাতকড়ি লাগাইয়া দিল।

জুমেলিয়া সর্ব্বাগ্রে লক্ষেশ্বর সিংহকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, ধরিয়া তাহার সেই শ্মশ্রুগুম্ফ পরিব্যাপ্ত মুখমণ্ডলে ঘন ঘন চুম্বন করিল। পরক্ষণেই প্রহরীর সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। পড়িয়া কৃষ্ণকে জবাব দিল।

জুমেলিয়ার চুম্বনে লক্ষেশ্বরকে মরিতে দেখিয়া পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়ো না—সে সর্পিনী, তাহার নিশ্বাস লাগিয়াও দেহস্থ শোণিত বিষাক্ত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দানব ও দানবী।

ভিতরে নিদ্রার ভাণে পড়িয়া ফুলসাহেব সকলই দেখিতেছিল—শুনিতেছিল। প্রহরীকে পড়িতে দেখিয়া ফুলসাহেব কপট নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিল। বলিল, "কাজ হাঁসিল ?"

জুমেলিয়া প্রহরীর হাত হইতে সেই হাতকড়ির চাবিটি লইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ফুলসাহেবকে বাহিরে আনিয়া, তাহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া বলিল, "এই এতক্ষণে হাঁসিল হইল।"

ফুলসাহেব জুমেলিয়ার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সোহাগ ভরে বলিল, "তোমার এত গুণ না থাকিলে আমি তোমার এত অনুগত হইব কেন ?"

জুমেলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "লঙ্কেশ্বরের প্রাণটা আগেই আমি প্রায় সবটা হস্তগত করিয়াছিলাম—আর অমন একটা নির্ব্বোধ মেড়ুয়াকে যদি ভুলাইতে না পারিব—তবে আর হইল কি ? তাহার পর যখন দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া একটা চুম্বন দিলাম—তখন তার প্রাণের যে টুকু অবশিষ্ট ছিল, সে টুকু অবধি দখল করিলাম। যখন সব প্রাণটা হস্তগত হইল—তখন তাহাকে উকুনটির মত নখে টিপিয়া অনায়াসে মারিব তার আর আশ্চর্য্য কি ? সেই বিষ কাঁটাটি পিঠে ফুটাইয়া দিলাম।"

ফুলসাহেব বলিল, "টের পায় নাই ?"

জুমেলিয়া বলিল, "টের পাইলেই বা ক্ষতি কি, যদি টের পাইয়া

চীৎকার করিয়া উঠে, এই জন্য চুম্বনের ছলে তার মুখখানি ব করিয়া রাখিয়াছিলাম—তা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতেই আনন্দে তার জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল—একটা কাঁটা ফুটিলে কি—বোধ হয়—তখন তাহার পিঠে সহস্র শেল ফুটিলেও তখন তাহার অনুভবেই আসিত না।"

ফুল সাহেব বলিল, "চল, এখনও অনেক কাজ বাকী।"

ফুলসাহেব জুমেলিয়ার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল, কিছু দূর গিয়া ফুলসাহেব সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "জুমেলিয়া, দাঁড়াও তাড়াতাড়িতে একটা কাজ ভুল করিলাম; এখনই আসিতেছি।" বলিয়া, জুমেলিয়াকে তথায় রাখিয়া ফুলসাহেব আবার সেই হাজত ঘরের সম্মুখে আসিল; মৃত প্রহরীর বন্দুকের সঙ্গীণ, ও কোমর হইতে কিরীচ-খানি খুলিয়া লইল। তাহার পর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরীচাস্ত্র দিয়া ভিতরের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখিল—

"অরিন্দম, সাবধান, এক সপ্তাহ মধ্যে তোমাকে খুন করিব—তবে আমার নাম

তোমার চিরশত্রু ফুলসাহেব।"

তখনই ফিরিয়া আসিয়া ফুলসাহেব, জুমেলিয়াকে সেই কিরীচখানি দিল; নিজের হাতে সেই তীক্ষ্ণমুখ সঙ্গীণটি রাখিল। তাহারা উভয়ে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়া পূর্ব্বদিকের প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া চলিল।

ঘনান্ধতমোময়ী রাক্ষসী নিশি, নরপ্রেত ফুলসাহেবের ও রাক্ষসী জুমেলিয়ার সহায়তায় আরও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে।

সেই রাত্রি।

প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিয়া তখন সেই মেঘচ্ছায়ান্ধকারভীষণা রাত্রি সমস্ত জগৎ বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে এবং ঝটিকাসংক্ষুব্ধ প্রকাণ্ড গাছগুলা মাতৃহারা দৈত্যশিশুর মত বিকটরবে মর্ম্মকাতরতা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিতেছে; রূপকথার রাজ-অতিথি ছদ্মবেশী নিশীথে-কর্ত্তব্য-পরায়ণ বুভুক্ষিত রাক্ষসের মত ঝড় বিকট গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে। সেই প্রবল ঝড়ের সহিত মিলিয়া, কৃষ্ণ, নিবিড়, ছিদ্রশূন্য মেঘ ও অকাতরবর্ষণসচেষ্ট বৃষ্টি একটা তুমুল বিপ্লবের মধ্যে ফেলিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে একটা পৈশাচিক তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

এমন সময় জেলখানার ভিতরে পূর্ব্বদিক্‌কার অত্যুচ্চ প্রাচীরের কিঞ্চিৎদূরে একটা বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়া, ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া। কাহারও মুখে কথা নাই—উভয়েই চিন্তামগ্ন। এখন কোন রকমে এই শেষ বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেই, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারে। প্রত্যেক দিক্‌কার প্রাচীরের উপর সশস্ত্র প্রহরীরা নতশিরে দ্রুতপদে ফিরিতেছে। মস্তকের উপর অনবরত ধারাপাত হইতেছে, ভীষণ ঝটিকায় তাহাদিগকে পতনোন্মুখ করিতেছে, তথাপি প্রভুভক্ত তাহারা কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ নহে। এক একবার গগনভেদী "জুড়ীদার হো" শব্দে পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বের প্রমাণ লইতেছে।

এখন সকল কয়েদীই যে যাহার ঘরে আবদ্ধ। সারাদিনের অস্থিভেদী উৎকট পরিশ্রমের পর তাহাদিগের এখনও যে কেহ জাগিয়া আছে, এমন বোধ হয় না; তথাপি প্রহরীরা আজ এত সাবধান কেন? কেবল সেই শঠ-শিরোমণি ফুল সাহেবের জন্যই তাহারা ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া আজ এই দুর্য্যোগেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত বোধে প্রাচীরের উপর সতর্কচিত্তে সত্বরপদে পরিক্রমণ করিতেছে।

এমন সময় জেলখানার ঘড়িতে একটা বাজিল। যে প্রহরী পূর্ব্ব-দিক্‌কার প্রাচীরের উপর পরিক্রমণ করিতেছিল, সে অভ্রভেদী কণ্ঠে হাঁকিল, "জুড়ীদার ভেইয়া হো।" প্রতিধ্বনির ন্যায় সেই সঙ্গেই বহুদূরে অপর দিক হইতে পরবর্ত্তী প্রহরী তীব্রতরকণ্ঠে হাঁকিল, "জুড়ীদার ভেইয়া হো।" তাহার পর এক দিক হইতে অপর এক দিকে—এইরূপ চারিদিকে "জুড়ীদার ভেইয়া হো" শব্দে বহুদূর পর্য্যন্ত সেই মেঘকৃষ্ণ নৈশগগন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শুনিয়া ফুলসাহেব একবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, "জুমেলা, আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি। এখন গোরাচাঁদ যদি নিজের কর্ত্তব্য না ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা মুক্ত হইব। কাল হইতে অরিন্দম পলাতক কয়েদীর অনুসন্ধানে ফিরিবে।" শেষের দুই একটি কথা মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যসর্পগর্জ্জনবৎ ফুলসাহেবের মুখ হইতে বাহির হইল, তাহা কিছুতেই মনুষ্যের মুখনিঃসৃতের মত শুনাইল না। যদি সেই অন্ধকারের মধ্যে কোন রকমে ফুলসাহেবের মুখখানা তখন দেখা যাইত, তাহা হইলে পাঠক, দেখিতে পাইতেন, তখনও সেই দানবচেতার মুখে সেই অমঙ্গলজনক—বিভীষিকা ও মৃদুতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব রহস্যপ্রাপ্ত, সম্পূর্ণ অশুভসূচক ভীতিপ্রদ হাসি লাগিয়াছিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপ, সংযত নিশ্বাসে ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে প্রহরী তিমিরে অনন্তকায় তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে তাঁহাদিগের মাথার উপর দিয়া একদিক হইতে অপর দিকে চলিয়া গেল। প্রহরী অনেক দূর চলিয়া গেলে ফুলসাহেব একখণ্ড ক্ষুদ্র ইষ্টক লইয়া প্রাচীর-গাত্রে ধীরে ধীরে আঘাত করিল। তাহার পর প্রাচীরের উপর কাণ পাতিয়া দিল। তখন বাহির হইতে আবার সেইরূপ আঘাতের মৃদু শব্দ হইল। শুনিয়া অতি সাহসে ফুলসাহেবের বুক ফুলিয়া উঠিল এবং মুখ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইল। ফুলসাহেব আবার সেইরূপ শব্দ করিল। জুমেলিয়াকে বলিল, "গোরাচাঁদ ভুলে নাই, সে আসিয়াছে—আর ভয় করি না, একবার কোন রকমে প্রাচীরটা ডিঙ্গাইতে পারিলে হয়; তখন একবার অরিন্দম আর যোগেন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব, ফুলসাহেবকে ঘাঁটাইয়া তাহারা ভাল কাজ করে নাই। আরও তাহারা দেখিবে, ফুলসাহেব কেমন করিয়া অতি সহজে তাহার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারে। তাহারা ফুল সাহেবকে এখনও চেনে নাই, তাই তাহাদের মূর্খতা সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে এতদূর উঠিয়াছে।"

জুমেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "গোরাচাঁদ এখন তোমার কি উপকার করিবে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

ফুলসাহেব সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিল, "আমি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি আমি কখন জেলের ভিতর আটক পড়ি, সে যেন প্রত্যহ রাত্রে—রাত একটার পর প্রাচীরের উপর এক গাছি দড়ি ঝুলাইয়া দেয়।"

বলিতে না বলিতে নৌকা বাঁধিবার কাছির মত মোটা এক গাছি

দড়ী তাহাদিগের নিকটে উপর হইতে ঝপ্ করিয়া পড়িল। ফুলসাহে সেই দড়ীটি ধরিয়া সাধ্যমত জোরে একটা টান দিল, দড়ীর অপর প্রাং বাহিরের দিকে ছিল, বাহির হইতে সেইরূপ একটা টান পড়িল। তখন ফুলসাহেব নিকটস্থ কোন বৃক্ষের মূলে দড়ীটি বাঁধিলেন ; তাহার পর জুমেলিয়াকে কোমরের কাপড় আঁটিয়া ধরিতে বলিয়া জুমেলিয়াকে লইয়া ধীরে ধীরে সেই দড়ী ধরিয়া উঠিতে লাগিল। জুমেলিয়া ফুলসাহেবের কটিদেশ দুই হাতে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া প্রথমে ধীরে ধীরে—তারপর দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত উপরে উঠিতে লাগিল। যখন সেই অত্যুচ্চ প্রাচীরের ঊর্দ্ধসীমার সন্নিকটস্থ হইয়াছে—তখন যে প্রহরী প্রাচীরের উপর পাহারা দিতেছিল সে অপর দিক হইয়া সত্বরপদে ফিরিতেছিল।

ফুলসাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। ভয় হইল, এইবার এই খানেই বুঝি তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ঘাটের নিকটস্থ হইয়া যদি নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এইবার এই বুঝি প্রথমবার ফুলসাহেবের সেই ভ্রূকুটিকুটিল, চিরহাস্যময় মুখখানি হাস্যশূন্য হইয়া শুখাইয়া গেল। তখন এক হস্তের উপর নিজের ও জুমেলিয়ার দেহভার বহন করিয়া অপর হস্তে কটিদেশ হইতে সেই বন্দুকের সঙ্গীণটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল। সেইরূপ অবস্থায় এক গাছি দড়ীর উপর নির্ভর করিয়া, এক হস্তে দুইটি দেহ-ভার বহন করিয়া এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করা যতদূর কষ্টকর ব্যাপার আমরা মনে করিতেছি, ফুলসাহেব যেরূপ অসীম ক্ষমতাশালী তাহাতে ইহা তাহার নিকট

। কটা-কঠিন কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না। তাহার মনে ভয় হইতেছিল, পাছে প্রহরী সেই দড়ীগাছটি দেখিতে পায়। যদিও অন্ধকারে দেখিতে না পায়, যাইবার সময় যদি তাহার পায়ে ঠেকে, তবে কি হইবে? তাহা হইলে—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীণটা প্রহরীর বুকে সমূলে বসাইয়া দিবে—তাহার পর যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে। একান্ত অকর্ম্মণ্য বা নিশ্চেষ্টের ন্যায় বন্দী হওয়া নিতান্ত কাপুরুষতা। এইরূপ ভাবিয়া ফুলসাহেব সেই তীক্ষ্ণমুখ সঙ্গীণহস্তে প্রহরীর—কেবল প্রহরীর নহে—একটা আশু বিপদের—একটা ভয়ানক দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নিজের অসাবধানতার জন্যই হউক বা ফুলসাহেবের সৌভাগ্যবশতঃই হউক, প্রহরী সেই দড়ীটি দেখিতে পাইল না—পায়েও ঠেকিল না। সে দড়ীগাছিটি পার হইয়া অপর দিকে অগ্রসর হইল।

পথ পরিষ্কার হইল। ফুলসাহেব তখন সেই সঙ্গীণটা দন্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিল। আর বেশি দূর উঠিতে বাকী ছিল না; এখন পাঁচ হাত উঠিতে পারিলেই প্রাচীরের উপরিভাগে উপস্থিত হওয়া যায়। দুই তিন বার হস্ত চালনায় ফুলসাহেব প্রাচীরের উপর উঠিয়া সেইরূপে অপর পার্শ্বে অবতরণ করিতে লাগিল। জুমেলিয়া সেইরূপ ফুলসাহেবের কটিদেশে সংলগ্ন রহিল।

অনেকদূর নামিয়া যখন আর দুই তিন হাত মাত্র নামিতে বাকী আছে, তখন ফুলসাহেব লাফাইয়া ভূতলে পড়িল। যেখানে পড়িল, সেখানে একটা ইষ্টকস্তূপ ছিল ও তদুপরি কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছিল; সেখানে লাফাইয়া পড়িতে ইষ্টকখণ্ডগুলি পরস্পরে ঠেকিয়া, আগাছাগুলির শুষ্ক শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া একটা শব্দ হইল। তেমন বেশি

শব্দ না হইলেও শব্দটা প্রহরীর কাণে গেল; সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যেখানে শব্দ হইয়াছিল, সে স্থান নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, সেইখানে বসিয়া ঝুঁকিয়া নিম্নভাগে সতর্ক-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। নীচে যেরূপ অন্ধকার, সেখানে দৃষ্টি চলে না; তথাপি প্রহরী সন্দিগ্ধমনে সেইরূপ ভাবে সেইখানে বসিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া দৃষ্টিশক্তির উপর সাধ্যমত বল-প্রয়োগ করিতে লাগিল। নীচে যেমন অন্ধকার, উপরের উন্মুক্ত স্থানে সেরূপ নহে; ফুলসাহেব সেইখানে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া প্রহরীকে বেশ দেখিতে পাইতেছিল, এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া তাহার অভি-প্রায়টিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রহরী-হত্যা।

ফুলসাহেব আবার নিঃশব্দে উঠিতে লাগিল। আবার প্রাচীরের উপরে উঠিল। উঠিয়া প্রহরীর দিকে অগ্রসর হইল। এক হাতে সেই শাণিত সঙ্গীণ। নিঃশব্দে প্রহরীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল। প্রথম সুযোগেই বামহস্তে প্রহরীর গলদেশ সম্মুখদিক হইতে সবলে চাপিয়া ধরিল। প্রহরী একটিও শব্দ করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রহরীকে সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া, ফুলসাহেব অপর হস্তে সেই সঙ্গীণটা প্রহরীর বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। প্রহরী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। প্রহরীর হস্তপদাদির উৎক্ষেপে প্রাচীরগাত্রে দুম্ দুম্ করিয়া শব্দ হইতেছে দেখিয়া, ফুলসাহেব বামহস্তে তাহার গলদেশ ধরিয়া শূন্যে লম্বিতভাবে ঝুলাইয়া ধরিল, আর অপর

স্তে তাহার বক্ষে সেই তীক্ষ্ণাগ্র কীরিচ দিয়া সবলে বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। প্রহরীর বক্ষঃনিস্সৃত রক্তধারা বৃষ্টিজলের সহিত মিশিয়া প্রাচীরতল প্লাবিত করিতে লাগিল।

তখন ফুলসাহেবের সেই ভ্রূকুটিকুটিলমুখে সেই ভীষণ অমঙ্গলময় মৃদুতায়-তীব্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফুলসাহেব মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরিয়া পিশাচ, এ পিশাচে সকলই সম্ভব।

অনতিবিলম্বে প্রহরী মরিল। ফুলসাহেব তাহাকে সেই প্রাচীরের উপর শোয়াইয়া দিল। তাহার বুক হইতে সঙ্গীণটা খুলিয়া লইয়া তাহারই রক্তসিক্ত পরিচ্ছদে ভাল করিয়া মুছিয়া লইল। প্রহরীর কোর্ত্তার ভিতরে একটা কীরিচ ছিল, সেটি বাহির করিয়া লইল। তাহার পর দ্রুতগতিতে সেইরূপ দড়ী বহিয়া নিঃশঙ্কমনে নামিয়া আসিল।

নীচে নামিয়া আসিলে গোরাচাঁদ তাহার সম্মুখে একটা কাপড়ের বুঁচ্‌কী ফেলিয়া দিল। ফুলসাহেব বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গোরাচাঁদকে বলিল, "তুমি এখন এইখানে থাক; কোথায় কি হয়—কাল আমাকে খবর দিবে—আমি এখনই জুমেলিয়াকে লইয়া পলাসীর বাগানে, সেই বাগানবাড়ীতে চলিলাম। সেইখানে দেখা করিয়ো, দেখা হইবে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "এখন যেরূপ স্রোতের টান্—গঙ্গা যেরূপ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া পার হইয়া যাইবেন? আপনি যদিও পারেন, কিন্তু জুমেলিয়াকে লইয়া কিরূপে পার হইবেন?"

ফুলসাহেব সবিরক্তিতে বলিলেন "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না—আমার কাজ আমি বুঝি, তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি তাহা কর। এখন আমার বেশি কথা কহিবার সময় নাই।"

"যে আজ্ঞা।" বলিয়া গোরাচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাবক্ষে।

সম্মুখে গঙ্গা—বর্ষাকালে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া অগাধ জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া গঙ্গাতটে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝড়বৃষ্টিতে জলস্রোতঃ দ্বিগুণবেগে—প্রচণ্ডরূপে তরঙ্গায়িত হইয়া শৃঙ্খলছিন্ন উন্মত্তের ন্যায় উধাও হইয়া ছুটিতেছে। সশব্দে সবেগ তরঙ্গ তটে ঘন ঘন প্রহৃত হইতেছে। গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের ছায়ায়—ঘনীভূত অন্ধকারের ছায়ায়—বিমল শুভ্র গঙ্গা-বক্ষ মসীময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই মসীময় অন্ধকারমাত্রাত্মক গঙ্গাবক্ষে সহস্র বিভীষিকা একসঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে—এখানে অশ্রান্ত জল গর্জ্জিতেছে—সেই সঙ্গে উন্মত্ত বায়ু গর্জ্জিতেছে—সেই সঙ্গে অনব-রতবর্ষণশীল মেঘ গর্জ্জিতেছে; তিন গর্জ্জনে মিলিয়া ধরণীর বিপুল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া সেই-তৃণটি-পড়িলে-খণ্ড-বিখণ্ড-স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। উভয়েই সন্তরণপটু; তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া, স্রোত কাটিয়া, উভয়ে সন্তরণ করিয়া অপর তটাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। স্রোতের বেগ তাহাদিগকে তাহাদিগের পথ হইতে নিজের পথে অনেকটা করিয়া টানিয়া লইতেছিল। মাঝখানে গিয়া জুমেলিয়ার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল—সে আর সাঁতার দিতে পারে না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একান্ত কাতর করিয়া তুলিল। সে স্রোতের মুখে পড়িয়া ফুলসাহেবের নিকট হইতে অনেক দূরে গিয়া

ড়ল। ফুলসাহেব গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "তুমি আমার কোমরে ভর দিয়া এস।" জুমেলিয়া দুইহাতে ফুলসাহেবের কটির বসন ধরিল। ফুলসাহেবেরও হস্তপদাদি ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে জুমেলিয়াকে লইয়া সন্তরণ করিতে তাহার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সন্তরণে পূর্ব্বের ন্যায় বলপ্রয়োগ করিতে না পারিয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল; সেইরূপ অবস্থায় প্রাণপণ চেষ্টায় একটু করিয়া তটের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে ফুলসাহেব অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল—ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল—তরঙ্গাঘাতে চোখে মুখে জল ঢুকিতে লাগিল। অনেক দূরে আসিয়াছে—তট আর বেশি দূর নহে—কোন রকমে আর এইটুকু যাইতে পারিলে হয়; কিন্তু সেখানে মাঝখানের অপেক্ষা টান বেশি; সেখানে ফুলসাহেবের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতে লাগিল। তাহাকে প্রবলবেগে এক দিক হইতে অপর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ফুলসাহেব কিছুতেই একহাতমাত্রও আর অগ্রসর হইতে পারিল না; বারম্বার বলপ্রয়োগে হাত দুখানা তখন একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; ফুলসাহেব ভাসিয়া চলিল। অনেকদূরে ভাসিয়া গিয়া ফুলসাহেব একটা আশ্রয় পাইল। একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ তট হইতে জলের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; তাহার প্রকাণ্ড শাখা হইতে অনেকগুলি শিকড় জলের উপর পড়িয়া লুটাইতেছিল; সেই শিকড় অবলম্বন করিয়া ফুলসাহেব সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। জুমেলিয়া সেইরূপভাবে তাহার পৃষ্ঠে সংলগ্ন রহিল। প্রবল জলস্রোতঃ তাহাদিগকে অবলম্বনচ্যুত করিবার জন্য বারম্বার সবেগে ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দৃঢ়মুষ্টিতে সেই শিকড় ধরিয়া ফুলসাহেব এক প্রকার বিশ্রাম করিতে লাগিল। এখন একবার যদি হাত ছাড়িয়া যায়—ফুলসাহেব যেরূপ ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতে সেই তরঙ্গায়িত ফেণিল জলরাশি তাহা৫
কোথায় লইয়া টানিয়া ফেলিবে, কে জানে? হয় ত তাহাতে জুমে-
লিয়াকে হারাইতে হইবে—এমন কি তাহাতে তাহারও জীবনের শেষ
হইতে পারে। অবসন্ন হস্ত ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, তথাপি প্রাণপণে ফুল
সাহেব সেই শিকড় ত্যাগ করিল না। বিশেষতঃ অদূরে একটা
ঘূর্ণাবর্ত্ত—সেখানে জল গর্জ্জিতেছিল—ঘুরিতেছিল—উথলিতেছিল।
উথলিয়া, এক পাশ দিয়া চতুর্গুণ বেগে ছুটিতেছিল। ফুলসাহেব বুঝিয়া-
ছিল, যদি একবার হাত ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে টানের মুখে
তাহাদিগকে সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়া পড়িতে হইবে; সেখানে পড়িলে
জীবনের আশামাত্র থাকিবে না।

এমন সময় নিকটস্থ তটভূমির নিবিড়তম অন্ধকারের ভিতর হইতে,
প্রাকৃতিক তুমুল বিপ্লবের তীব্রতর কোলাহল ভেদ করিয়া নারীকণ্ঠ-
নিঃসৃত খল্ খল্ তীব্রতম হাস্যধ্বনি সম্মুখস্থ অনন্ত বারিরাশি কাঁপাইয়া,
গঙ্গার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পার হইয়া, ঝড়ের বেগে বহিয়া
দূর দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া গেল। সেই অট্টহাসির অতিতীব্রতায় চরাচর
যেন পরক্ষণেই ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই নিভৃত বিপুল বিজনতার মধ্যে, এই তারা হীন চন্দ্রহীন মেঘময়
অন্ধকারময় গভীর নিশীথের ভীষণতার মধ্যে দাঁড়াইয়া, সর্পসঙ্কুল, দীর্ঘ
তৃণ পরিব্যাপ্ত সিক্ত তটভূমিতে কে এ উন্মাদিনী, উদ্দাম ও প্রবল
হাস্যের বেগ কিছুতেই বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না?

ক্ষণপরে সেইরূপ অট্টহাসির সহিত স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিল, "কি গো, প্রাণ
নাথ, কেমন আছ? এ দাসীকে কি এখন মনে পড়ে?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফুলসাহেবের ভয় হইল; শুষ্কমুখ আরও শুখাইয়া
গেল; দেহে যেটুকু বল ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল। সে স্বর তাহার

হৃদিনের পরিচিত—সেই মোহিনীর। যেখান হইতে মোহিনী এই প্রশ্ন করিল, সেই দিকে ফুলসাহেব ভ্রূকূর্চ্চ সঙ্কোচ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। দেখিল, তটের উপর সেই বটবৃক্ষের তলে অত্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে এক নারীমূর্ত্তি একখানি অনৃজু দীর্ঘ ছুরিকাহস্তে দাড়াইয়া। অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারা গেল না—কিন্তু সে যে রাক্ষসী মোহিনী ছাড়া আর কেহই নহে—সে বিষয়ে ফুলসাহেবের মনে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। সেই অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যে তাহার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকার অপেক্ষা তাহার উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষুদুটি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া বেশি জ্বলিতেছিল; তন্মধ্য হইতে প্রতিক্ষণে অমানুষিক ঈর্ষার অনলকণারাশি—জ্বলন্ত অন্তর্দ্দাহের একটা ভীষণোজ্জ্বল দীপ্তি-শিখা ও অতিশয় রোষতীব্রতা প্রতিক্ষণে বিকীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

দেখিয়া ফুলসাহেবের ভয় হইল। ভীতহৃদয়ে, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "এখানে—এমন সময়ে—মোহিনী, তুমি কোথা হইতে আসিলে?"

মোহিনী বলিল, "অনেক দূর হইতে। কেন আসিয়াছি শুনিবে? শুন, তুমি তোমার প্রিয়তমাকে লইয়া জলকেলিতে কেমন মনো-নিবেশ করিতে পারিয়াছ, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।" বলিয়া সেইরূপ উন্মাদিনীর ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সেই বিদ্রূপব্যঞ্জক, অভ্রভেদী হাস্যধ্বনি গুরুগম্ভীর বজ্রনাদ ভেদ করিয়া, ঝটিকাগর্জ্জন ভেদ করিয়া, অশ্রান্ত জলকল্লোল ভেদ করিয়া অনেক দূর অবধি উঠিল—অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হইল। ফুলসাহেবের গভীর, অবসন্ন হৃদয়ে প্রবলবেগে একটা দুঃসহ আঘাত করিল। তখন মোহিনী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, "বিনোদ, এখন কি হয়? এখন একবার সমস্ত জীবনের অশেষ পাপের কথা এই মহিমাময়ী গঙ্গার সুশীতল অসীম পুণ্য-প্রবাহের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, একটা

অতি দুর্ব্বল, ক্ষীণতম নারীহৃদয় সহস্র প্রলোভনের মধ্যে লইয়া গিয়া শেষে অক্ষালনীয় কলঙ্কের মধ্যে চিরবিসর্জ্জন? আরও মনে পড়ে কি, বিনোদ, একটি মুগ্ধা, মোহজে প্রলুব্ধা, কর্ত্তব্যহীনা, জ্ঞানহীনা, বিমূঢ়া অবলাকে সংসারের সহস্র স্নেহবাহুর দৃঢ়বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অপরিমেয় পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত করিয়া, অগাধ অসীম অনন্ত অভ্রান্ত ভালবাসার স্বর্গীয়সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ, চিত্রবিচিত্র, স্নিগ্ধচ্ছায়াময় যবনিকার সূক্ষ্ম আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিয়া, নারী-জীবনের প্রিয়তম রত্ন—সকল সৌন্দর্য্যের সার—সকল পবিত্রতার কেন্দ্র—সকল ঐশ্বর্য্যের ঐশ্বর্য্য—সকল সুষমার ঔজ্জ্বল্য—সেই সতীত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অসহায় অবস্থায় উত্তপ্ত বালুকাময় দিগ্‌দিগন্তশূন্য, কর্কশতায় পরিশুষ্ক মরুভূমির স্নেহহীনতার মধ্যে—মমতা-হীনতার মধ্যে—প্রেমপরিশূন্যতার মধ্যে চিরনির্ব্বাসন। সে সকল আজ মনে পড়ে কি? তাহার পর আবার লোভে পড়িয়া একজন মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করিয়া জাতি ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে; শেষে স্ত্রীর পৈতৃক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য স্বহস্তে স্ত্রীহত্যাও অবধি করিয়াছ। একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহাকেও গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছ—তোমার মুখ দেখিলেও পাপ আছে। তুমি কি মনে করিয়াছ, বিনোদ! এই সকল পাপের ফল তুমি কখনও এড়াইতে পারিবে? কখনও নয়। এখনও দিন রাত হয়—চন্দ্র সূর্য্য উঠে—বায়ু বহে—এখনও বিশ্বেশ্বরের পবিত্র সিংহাসনতলে পাপপুণ্যের বিচার হয়।"

বলা বাহুল্য প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত মোহিনীর সেই বিনোদ আর ফুলসাহেব একই ব্যক্তি। যৌবনে ফুলসাহেবের বিনোদ নাম ছিল, সেই সময়েই বিধবা মোহিনী আপনা-হারাইয়া, প্রাণ দিয়া তাহাকে ভাল

:াসিয়াছিল। তখন মোহিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে পাপ-প্রণয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছিল; এখন তাহাতে বিষময় ফল ধরিয়াছে। সে সকল ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই মোহিনীর মুখেই সে সব কাহিনীর অনেকটা অবগত হইতে পারিয়াছি। এক্ষণে মোহিনী হতাশ হইয়া, ফুলসাহেব কর্ত্তৃক শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া, সমাজবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া. দুর্ব্বিসহ .ক্রোধে, ঈর্ষায়, দ্বেষে মরিয়া—উন্মাদিনী। সে এখন কোন রকমে ফুলসাহেবকে এ জগৎ হইতে বিদায় করিতে পারিলে, তাহার নাম জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে, তবে সে তৃপ্তচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারে। তাহার বুকের ভিতর রুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া একটা যে প্রতিহিংসা মণিহারা ফণিনীর ন্যায় আপনা-আপনি দংশন করিয়া, আপনার বিষে আপনি জ্বলিয়া, দিবারাত্র গর্জ্জন করিয়া কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল, ফুল সাহেবকে যতক্ষণ না দংশন করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহা শান্ত হইতে পারিতেছে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সর্পিণী ও সর্পিণী।

ফুলসাহেব মোহিনীর কথাগুলি শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তাহার পর বলিল, "সে সকল কথা এখন কেন? মোহিনি! এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে রক্ষা কর; তোমার অঞ্চলটা ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয়। এখানকার জলের টান্ এত অধিক, কিছুতেই আমি উঠিতে পারিতেছি না। এরূপ অবস্থায় আর এক মুহূর্ত্তও কাটে না—বড় কষ্ট হইতেছে। একবার হাত ছাড়িয়া গেলে সম্মুখের দহে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। মোহিনি! বাঁচাও—রক্ষা কর—আমি এখন বড়ই বিপন্ন। এরূপভাবে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেছি না।"

"এরূপভাবে যাহাতে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে না হয়, তাহার উপায় করিতেছি।" বলিয়া মোহিনী সেই বটশাখার অপর একটি শিকড় ধরিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া, যে শিকড় ধরিয়া ফুলসাহেব অতিকষ্টে জীবনটাকে মৃত্যুর মুখ হইতে এতক্ষণ তুলিয়া রাখিয়াছিল, তদুপরি সেই ছুরিকার আঘাত করিতে লাগিল।

ফুলসাহেব কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ! মোহিনী, তুমি কি করিতেছ, আমাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়ো না—রক্ষা কর—বাঁচাও—মোহিনী, আমাকে ক্ষমা কর—বাঁচাও।"

মোহিনী সহাস্যে বলিল, "তোমার অপরাধের ক্ষমা নাই—থাকিলে করিতাম। এমন এক বাণে দুটি পাখী মারিবার লোভ কি সহজে ত্যাগ

করা যায়, বিনোদ? তোমাকে জলে ডুবাইয়া কি, যদি তোমাকে পোড়াইয়া মারিতে পারিতাম, তাহা হইলে আরও সুখী হইতাম।" সেইরূপভাবে মোহিনী আবার সেই শিকড় ছেদন করিতে লাগিল।

ফুলসাহেব ব্যাকুলান্তঃকরণে, প্রাণভয়ে প্রাণপণে, কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মোহিনি! এখনও—এখনও এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর—এখনও বাঁচাও—এখনও রক্ষা কর—আমি যোড়হাতে তোমার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতেছি, দয়া কর—ক্ষমা কর—"

বাধা দিয়া মোহিনী রোষতীব্রকণ্ঠে বলিল, "কিসের দয়া—কিসের ক্ষমা? পাপী তুমি—তোমার মৃত্যু এ জগতের বাঞ্ছনীয়। পাপী, পিশাচ, তুমি যে গঙ্গার পবিত্র সলিলে মরিতে পাইতেছ, ইহা একটা তোমার মত নারকীর পরম সৌভাগ্য বিবেচনা না করিয়া কাতর হইতেছ? ধিক্ তোমায়!" মোহিনী পূর্ব্ববৎ ছুরিকা দিয়া সেই শিকড়ের উপর, আঘাতের উপর আঘাত করিতে লাগিল।

আসন্নবিপদে নিরুপায় হইয়া ফুলসাহেব আত্মহারা হইয়া উঠিল—মাথা ঘুরিয়া গেল। আঘাতপ্রাপ্ত স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল, "মোহিনী—পিশাচী—রাক্ষসী—এখনও কথা রাখ্—যদি কোন রকমে বাঁচিতে পারি, ইহার সমুচিত প্রতিফল পাবি। ফুলসাহেবের হাত হইতে কখনই রক্ষা পাইবি না।"

উন্মাদিনী মোহিনী ছুরিকা-চালনায় পূর্ব্ববৎ তৎপর থাকিয়া বলিল, "এখন নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর; ইহার পর আমার ভাবনা ভাবিবার অনেক অবসর পাইবে। পিশাচ, তুমি কতদিন প্রসন্নমুখে কত নিরপরাধের প্রাণ লইয়াছ; তোমার বিষে-ছুরিতে কত লোকের প্রাণ এ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইয়াছে; তাহাদের যন্ত্রণাময় মৃত্যু হাসিমুখে দেখিয়াছ। আর আজ তুমি

কি না, একটা এত বড় বীরপুরুষ হইয়া, নিজের মৃত্যু-ভয়ে ব্যাকুল হইতেছ? মৃত্যু ত নিশ্চয়ই এক দিন হইবে, এখন আর ইহার পর—ইহার জন্য এত কাতরতা? ছি—ছি! তোমাকে এত শীঘ্র মারিবার আরও একটা প্রয়োজন, বড় দুঃখের বিষয় কিছুতেই আমি তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তা যদি পারিতাম, তোমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে আসিতাম না। তোমাকে না মারিয়া আমি কিছুতেই মরিতে পারিতেছি না; এ জগতে তোমাকে পাইলাম না, দেখি, তোমাকে মারিয়া, তাহার পর আমি নিজে মরিয়া, পর জগতে —তা নরকেই হোক্—আর যেখানে হোক্—তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি কি না। দেখি, যে ভাবে প্রথমে একবার দেখা দিয়াছিলে, সেই ভাবে তোমাকে পাই কি না।"

ফুলসাহেব বলিল, "মোহিনী, আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার উপর আমি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আমাকে বাচাও—আবার আমি তোমারই হইব—সেইরূপ তোমাকে ভালবাসিব।"

হাসিয়া মোহিনী বলিল, "বিনোদ, আর ভুলাইতে চেষ্টা করিয়ো না। একবার ভুলিয়া নিজের মাথা নিজে খাইয়াছি। তুমি কি মনে কর আবার তোমার মত একটা প্রতারকের কথায় মোহিনী আবার ভুলিবে? এ মোহিনী এখন আর সে মোহিনী নাই—এ এখন তোমার ভালবাসা চাহে না, তোমার আদর চাহে না, তোমার স্নেহসিক্তস্বরের সুমধুর আলাপ চাহে না, চাহে তোমার রক্ত—তোমার মৃত্যু, তোমার পাপদেহ পদতলে দলিত করিতে। বড়ই দুঃখের বিষয়, বিনোদ, সে মোহিনীর এমনি একটা অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে।"

ফুলসাহেব তখন হতাশ হইয়া মর্ম্মভেদীস্বরে বলিল, "মোহিনী পিশাচী—রাক্ষসী, কিছুতেই তোর দয়া হইল না।"

বিদ্রূপ করিয়া মোহিনী কহিল, "রাক্ষসীর কাছে, পিশাচীর কাছে দয়া ভিক্ষা করা তোমার যে একটা মস্ত ভুল, বিনোদ।"

জুমেলিয়া দেখিল, শিকড় দ্বিখণ্ড হইতে আর বড় বিলম্ব নাই, অনতিবিলম্বে অদূরস্থ ঘূর্ণাবর্ত্তের তিমিরময় গর্ভে তাহাদিগকে চির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সে এতক্ষণ নীরবে অন্তরস্থ শঙ্কার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল, আর থাকিতে পারিল না; একান্ত বিনীতভাবে স্নেহমধুরসম্বোধনে মোহিনীকে বলিল, "ভগিনি, এ বিপদে তুমি যদি আমাদিগকে দয়া না কর আর কোন উপায় নাই—"

বাধাদিয়া মোহিনী কহিল, "চুপকর্ পিশাচী—মরিবার সময় আল্লার নাম নে—অনেক পাপ করিয়াছিস্।"

জুমেলিয়া অপমানিত হইয়া শীঘ্র আর কোন কথা কহিতে পারিল না। এ অপমানটা শক্তিশেলের মত তাহার বুকে গিয়া বিঁধিল। এবং বুকের ভিতর তীব্র জ্বালাময় বিষ ঢালিয়া দিল। লাঙ্গুলামৃষ্ট সর্পিণীর ন্যায় সে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার দীপ্তকৃষ্ণতার চক্ষুদিয়া বহ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। জুমেলিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া সরোষ-গর্জ্জনে বলিল, "যদি কোন রকমে তোর্ নিকটস্থ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই পিশাচীর পরিচয় তোকে আজ ভাল করিয়া দিতাম; দেখিতিস্, এক পলকে কেমন করিয়া তোর রক্তাক্ত দেহ আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িত। দেখি মরিতে বসিয়াও পিশাচী জুমেলিয়া তোর কোন অপকার করিতে পারে কি না।"

এই বলিয়া জুমেলিয়া কটিদেশ হইতে মৃত প্রহরীর নিকটে প্রাপ্ত সেই কিরীচখানি লইয়া সজোরে মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। যে বামহস্তে শিকড় ধরিয়া মোহিনী নিজ দেহভার সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, সেই বামহস্তের মধ্যস্থলে কিরীচখানি

অমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে প্রবলবেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল মরিয়া উন্মাদিনী মোহিনী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া দ্বিগুণ উদ্যমে সেই শিকড় ছেদনে মনোনিবেশ করিল। তেমন আঘাতেও ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখে যন্ত্রণা প্রকাশের কোন চিহ্ন প্রকটিত হইল না। তেমনি নিরুদ্বিগ্ন, তেমনি অটল, স্থির ও অবিচলিতভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিল।

ফুলসাহেব দেখিল, মোহিনীর নিকট তখন আর তিলমাত্র দয়া-লাভের আশামাত্রও নাই; তখন সে মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া সেই বন্দুকের সঙ্গীণটা সজোরে ছুড়িয়া মারিল। অন্ধকারে লক্ষ্য ঠিক হইল না; সেটা সেই বটবৃক্ষমূলে সশব্দে—এত জোরে গিয়া পড়িল যে, অর্দ্ধাংশ তন্মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল।

মোহিনী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকৃতকার্য্য হইয়া ফুল সাহেব অবনত মস্তকে রহিল। মোহিনী তখন আরও জোরে ছুরিকা দিয়া সেই শিকডের উপর আঘাত করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সেই শিকড় দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। সেই সঙ্গে ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া প্রবল স্রোতের মুখে সবেগে ভাসিয়া গিয়া অদূরস্থ সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়া পড়িল। দুই একটা পাক খাইয়া অনন্ত জলরাশির মধ্যে তাহারা কোথায় বিলীন হইয়া গেল, আর দেখা গেল না।

তাহার পর জল সেইখানে পূর্ব্ববৎ তেমনি ঘুরিতে লাগিল। তেমনই উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল এবং তেমনি গর্জ্জন করিতে লাগিল, জল তেমনি অশান্ত বেগবান্, ঘূর্ণ্যমান সশব্দ। তখন আর একবার মোহিনীর সেই অট্টহাসি নৈশগগন কম্পিত করিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। দূরবনান্তরে গঙ্গার অপর পারে তাহারই একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়া ঝটিকাগর্জ্জনের সহিত, অবিরাম জলকল্লোলের সহিত মিশিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শেষরাত্রে।

সেই দুর্ঘটনাপূর্ণ রাত্রেরই কথা বলিতেছি।

যখন রাত দুইটা, তখন প্রহরী সকল বদ্‌লী হইতে লাগিল। তখন সেই পূর্ব্বদিক্‌কার প্রাচীরের সেই নিহত প্রহরীর পরিবর্ত্তে একজন প্রহরী সেইদিকে আসিল। সে যাহার বদ্‌লীতে আসিয়াছে, তাহাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল। তাহার পর প্রাচীরের উপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল। তথায় তাহার সম্মুখে, যাহাকে না দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারই রক্তাক্ত শবদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে আরও বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং ভীত হইল। দেখিল, বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত কর্ম্মঠ প্রহরী শতছিন্ন বক্ষে, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, প্রাণহীন দেহে পড়িয়া। ভাবিয়া পাইল না—কে ইহাকে এমন নিষ্ঠুরতার সহিত খুন করিল।

তখনও যে বৃষ্টি হইতেছিল না, তাহা নহে। পূর্ব্বাপেক্ষা বেগটা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ঝড়ের বেগও মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার কি হইল—মরিল কি উঠিল জানি না—তাহাদের দুইজনকে, আর এই নিরীহ নিরপরাধ নিহত প্রহরী দুইজনকে গ্রাস করিয়া ক্ষুধাতুরা, ভয়ঙ্করী রাক্ষসী নিশি যেন কথঞ্চিৎ শান্ত ও সুস্থির হইতে পারিল। মেঘান্ধকার আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই—শীঘ্র যে হইবে এমন সম্ভাবনাও নাই—এখনও তারা ঢাকিয়া, চন্দ্র

ঢাকিয়া, কোমল নীলিমাচ্ছবি ব্যাপিয়া মেঘ তেমনি পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। তটিনীতীরবর্ত্তী খদ্যোতখচিত ঝিল্লিমন্দ্রিত সুদূরব্যাপী বনতল তেমনি বায়ু চঞ্চল হইয়া, আলোড়িত-বিলোড়িত হইয়া সেই অন্ধকার সমুদ্র উত্তালভাবে তরঙ্গায়িত হইতেছে।

একটা যে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই শোণিতাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া প্রহরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। ফুলসাহেবকেই প্রথমে সে সন্দেহ করিল; কারণ এ দুঃসাহসিকতা তাঁহাকেই সম্ভবে। ফুলসাহেব বন্দী হওয়ায় এইরূপ একটা অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিয়া কারাধ্যক্ষ হইতে প্রহরীরা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হইতে সন্ত্রাসিত ছিল।

প্রহরী তখন ফিরিয়া গিয়া, সেখানে আর একজনকে মোতায়েন রাখিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিল। নিশ্চিন্ত জেলখানা পরিপূর্ণ করিয়া তখনই একটা ব্যাকুলতা, একটা অধীরতা সজীব হইয়া উঠিল। সর্ব্বাগ্রে ফুলসাহেবের সন্ধান লওয়া হইল—

সেখানে ফুলসাহেব নাই।

সে জুমেলিয়াও নাই।

প্রকোষ্ঠ শূন্য।

দ্বারসম্মুখে লক্ষেশ্বরের জীবনবিচ্যুত দীর্ঘ দেহ ভূলুণ্ঠিত, নীরব এবং নিস্পন্দ। তখনই ফুলসাহেবের সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল। পুলিসে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল। শুনিয়া যত পুলিসের মস্তক অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—যোগেন্দ্রনাথের মস্তক অধিকতর চঞ্চল হইল।

গ্রামের লোকেরা একদিনেই ফুলসাহেবের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল; পরদিন প্রত্যূষে তাহার পলায়ন-কাহিনী সকলে সবিস্ময়ে শুনিল। শুনিয়া সশঙ্ক হইল, সাবধান হইল। পাছে গ্রামে আসিয়া ফুলসাহেব হঠাৎ কাহার সর্ব্বনাশ করে এই ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইল।

সকলেই একাগ্রমনে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার নিকট কায়মনোবাক্যে তাহার পুনর্বন্দীত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিল। কেহ মনে মনে একেবারে তাহার ফাঁসিকাষ্ঠের আয়োজন করিতে লাগিল। সে যে জেলখানার তেমন অত্যুচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া, পড়িয়া মরিল না—তাহার অস্থিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া, রেণু রেণু হইয়া গেল না, সে জন্যও দুই চারি জন আন্তরিক আক্ষেপ করিয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাসে বর্ষাপ্রভাতের শীতল বায়ু উষ্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রহরীর ছুরি ফুলসাহেবের বুকে না বিঁধিয়া, ফুলসাহেবের ছুরিখানা যে প্রহরীর বুকে বিঁধিয়াছিল, এবং সেটা যে তেমন অন্ধকারে বিধাতারই একটা মহাভ্রম ঘটিয়া গিয়াছিল; সে জন্যও আবার লঘুপাপে গুরুদণ্ডের বিধানে কেহ একেবারে বিধাতার মুখাগ্নির, কেহ দগ্ধ কচু ও রম্ভার, কেহ পুরাতন-নিত্য-ব্যবহারে-অর্দ্ধাংশ-ক্ষয়প্রাপ্ত সন্মার্জ্জনীর, এমন কি কেহ মৃত্যুর অবধি ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরে কতকটা সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাত্রিশেষে।

প্রত্যূষে যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমকে লইয়া জেলখানায় আসিলেন। ফুলসাহেবের এক রাত্রের কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিয়া পাইলেন না কেমন করিয়া, কোন্ কৌশলে দানব ও দানবী দুইজন প্রহরীকে খুন করিয়া, একমাত্র দড়ীর সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বহির্জগতের এক জনের সাহায্য ব্যতীত যে কথনই এতটা ঘটিতে পারে না, তাহা অরিন্দম অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। অমানুষিক সাহসের জন্য, অমানুষিক বুদ্ধির জন্য, অমানুষিক বিক্রমের জন্য, অমানুষিক কৌশলের জন্য, আরও সেই প্রাচীরের উপরিস্থ প্রহরীকে যেরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে, সে জন্যও ফুলসাহেবকে তিনি কিছুতেই মনুষ্য-তালিকা-ভুক্ত করিতে পারিলেন না, দানবদলভুক্তের সে যে একজন প্রধান বলিয়াই ধারণা হইতে লাগিল। এবং মনে মনেতাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

সেই হাজত-ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই ফুলসাহেবের লিখিত ভিত্তিগাত্রের বৃহদক্ষরগ্রথিত সেই তিনটি পংক্তি সর্ব্বাগ্রে অরিন্দমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মৃদুহাস্যে অরিন্দম বলিলেন, "যোগেন্দ্রবাবু, শীঘ্রই আমি আবার ফুলসাহেবকে ধরিতে পারিব। সে নিরুদ্দেশ হইবে না, শীঘ্রই এ গ্রামে আবার আসিবে।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন ?"

অরি। সে আমাকে খুন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেওয়ালের উপর কি লেখা রহিয়াছে একবার পড়িয়া দেখুন।"

যোগে। তাই ত! কি ভয়ানক লোক! এমন আমি আর দেখি নাই।

অ। দিন রাত চোর ডাকাত, খুনেদের সন্ধানে থাকিয়া আমার এমন একটা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, বোধ হয় আপনিও তাহা জানেন, যে আমি তাহাদের বলবুদ্ধির পরিচয় প্রথম দর্শনেই অনেকটা বুঝিতে পারি—তা ফুলসাহেবকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে উহাকে আমার একজন যোগ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই আমার স্থিরবিশ্বাস।

যো। ফুলসাহেবের শারীরিক শক্তি-সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

অ। আমাকে দুই দিয়া গুণন অঙ্কে কষিয়া দেখিলে আমার কি মত বুঝিতে পারিবেন।

যো। একথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, অরিন্দম বাবু।

অ। শুনিয়াছি, এখানে অনেকেই আমাকে বলবান দেখিয়া, আমার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে দ্বিতীয় ভীম বলিয়া সে কথার উপসংহার করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা যদি ফুলসাহেবের সম্যক্ পরিচয় পাইত, তাহা হইলে তাহাকে আসল ভীম বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না; ফুলসাহেব শারীরিক বলে আমার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলিষ্ঠ।

যো। আর মানসিক বলে তাহাকে কিরূপ বুঝিয়াছেন ?

অ। সে আমার সমতুল্য। তাহার বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যতৎপরতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদিতে সে প্রশংসনীয়। যাই হোক, বুঝিয়াছি সহজে কিছুই হইবে না; একদিন আমি আবার তাহাকে যেমন করিয়া হোক গ্রেপ্তার করিবই—সে কখনই আমার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারিবে

না। সে আমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী—তাহার জন্য আমি প্রাণপণ করিব।

যো। যদি সে এমনই ভয়ানক লোক হয়, তবে এক কাজ করুন; আপনি একা আর একাজে হাত দিবেন না; আপনার সাহায্য করিতে যেরূপ লোকবল আবশ্যক বোধ করেন, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

অ। না, সেটি হইবে না—তা যদি আপনি বলেন, তবে আমি একাজে আর হাত দিব না। আমি একাকী এ কাজ হাতে লইয়াছি একাকী এ কাজ শেষ করিতে চেষ্টা করিব, সে জন্য আপনি কোন আপত্তি করিবেন না।

যো। কিন্তু, অরিন্দম বাবু—

অ। (বাধা দিয়া) ক্ষমা করুন, কিছুতেই তাহা হইবে না; আপনি যখন যে কাজের ভার দিয়াছেন—যখন যা আদেশ করিয়াছেন, আমি কখন আপনার কোন কথা অস্বীকার করি নাই, সে জন্যও অন্ততঃ আপনি একবার আমার অনুরোধ রাখিতে স্বীকৃত হন—যতক্ষণ না আমি পরিত্যাগ করি, ততক্ষণ যেন এ কেস্ আমারই হাতে থাকে।

যো। আমার কথা রাখুন অরিন্দম বাবু, ফুলসাহেব যে বড় সহজ লোক নয়, তাহা ত আপনি জানেন।

অ। জানি বলিয়াই ত আপনার কথায় কিছুতেই সম্মত হইতে পারিতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যদি কখনও কোনরূপ সাহায্য আমার আবশ্যক হয়, আপনাকে তখনই জানাইব—সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কে এ সুন্দরী?

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সপ্তাহ পরে।

এক দিন শরতের নির্ম্মলীকৃত, আকাশে স্নিগ্ধ কিরণময় চন্দ্র উঠিয়াছে। তাহার নিম্নে চঞ্চল, তরল, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি একখানির পর আর এ কখানি, তাহার পর আর একখানি, চন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তচিত্তে দূর দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাত্রি তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। এমন সময়ে একখানি নৌকা একটি যুবক আরোহীমাত্রকে লইয়া হুগলীর গঙ্গা বহিয়া কলিকাতাভিমুখে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। পরিপ্লব চন্দ্রালোকে মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত। গঙ্গার উভয় তটে কোথায় অতি-দূর-বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদু পবনে তরঙ্গায়িত; এবং কোথায় অতি দীর্ঘ তাল, তমাল ও নারিকেলের ঘনশ্রেণী নিঃশব্দ নিশ্চঞ্চল; কোথায় দিগন্ত বিস্তৃত নিবিড় শ্যাম বনরেখা—চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত, বায়ুচঞ্চল, ঝিল্লিমন্দ্রিত, খদ্যোৎ-খচিত, পাখীকলগীতিমুখরিত। কোথায় আমের বাগান, ভিতরে বসিয়া দোয়েল শিস্ দিতেছিল এবং পাপিয়ার শব্দতরঙ্গে কোমল আকাশ বিদীর্ণ হইতেছিল; কোথায় দীর্ঘতৃণময় সুদূরব্যাপী চন্দ্রালোকিত প্রান্তর, অতি মনোহর; সেখানে সেই শরৎ-প্রারম্ভের সুকোমল শ্যামল তৃণাস্তরণের উপর জ্যোৎস্না নিদ্রিত ছিল। সেখানে নিস্তব্ধতা এত নিবিড়, সেখানে কেবল একটি সীমাশূন্য দিশাশূন্য শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নৌকারোহী যুবক মুগ্ধচিত্তে অনন্ত-

মনে ও অতিশয় বিস্ময়ের সহিত এই সকল দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। গঙ্গাবক্ষ নিস্তরঙ্গ জ্যোৎস্নাময়। নৌকা উজান ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল; নৌকার দুই পাশে জল কল্ কল্ ডাকিয়া ছুটিতেছিল। সেই জলকলতান, অপর পারস্থ জ্যোৎস্নামণ্ডিত ঝাউশ্রেণীর অনুচ্চ, দূরাগত শন্ শন্ শব্দ সেই প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে, দিগন্ত বিস্তৃত বিজনতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব অপার্থিব ও অচিরশ্রুত সঙ্গীত-স্রোত সুমধুর ভাবে প্রবাহিত করিয়া দিতেছিল। তাহারই তালে তালে, মাত্রায় মাত্রায় দাঁড় নিক্ষেপের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ মৃদুমন্দ আঘাত করিতেছিল। এক একবার সেই ক্ষেপণীর শব্দ লয়চ্যুত ও তজ্জন্য শ্রুতিকটু হইয়া পরিশ্রান্ত নীড়স্থ কাকগুলিকে বিনিদ্র ও মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

নৌকা গঙ্গার পূর্ব্বতট ঘেঁসিয়া যাইতেছিল। গঙ্গার সে দিকে তৃণাচ্ছাদিত সেই বিস্তৃত প্রান্তর। যুবক দেখিল, সেইখানে তটের উপর দাঁড়াইয়া এক শুভ্রবসনাবৃতা নারী-মূর্ত্তি। নাসাগ্র অবধি লম্বিত অবগুণ্ঠনে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত। সেই সুন্দর মুখমণ্ডলের যেটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহাতেই অপরিসীম সৌন্দর্য্যের বেশ একটি আভাস হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত হইতেছিল। যুবক ভাবিয়া পাইল না, কে এই শুক্লবসনা সুন্দরী, ভয়হীনা? এত রাত্রে এমন নির্জ্জনে, এই জনমানবশূন্য প্রদেশে? তাহার পশ্চাতে দূরব্যাপী প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। যুবক ভাবিল, মাথার উপরে অসীম নীলিমার বুকে তরল অনিবিড় শ্বেতাম্বুদ-আবৃত চন্দ্রেরই কি এই অসীম প্রান্তর-প্রান্তে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মানা শুক্লবসনা নবীনা একটি অবিকল প্রতিচ্ছবি? না, ক্ষেপণী সঞ্চালনের শব্দে সেই প্রান্তরের সুকোমল তৃণশয্যা হইতে ঘুমন্ত জ্যোৎস্না জাগিয়া উঠিয়া এখানে মূর্ত্তিমতী? ভাবিয়া যুবক ঠিক করিতে পারিল না; মনের ভিতর বড় গোলমাল বাঁধিয়া গেল। যুবক নির্নিমেষ

মুগ্ধনেত্রে, বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে নৌকা সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যখন নৌকা ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইল, তখন সেই অবগুণ্ঠিতা তটের উপর হইতে দ্রুতপদে নিম্নে আজানু জলে নামিয়া আসিল। যখন নৌকা দশ হাত দূরে—তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল, তখন কাতরকণ্ঠে সেই অবগুণ্ঠিতা রমণী নৌকারোহী যুবককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মহাশয়, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; এখানে এত রাত্রে আর কাহারও সাহায্য পাইব, এমন আশা নাই। একা আমি স্ত্রীলোক, আমার কি হইবে, কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি যদি এ সময়ে আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ না করেন, তবে আমার অন্য উপায় নাই।"

কথাগুলি স্পষ্টরূপে যুবকের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। যুবক মাঝিকে কিনারায় নৌকা লাগাইতে কহিল। নৌকা মুখ ফিরাইয়া তটে গিয়া আঘাত করিল। যুবক সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "বলুন আমাকে কি করিতে হইবে? আমার দ্বারা আপনার যে কোন উপকার সম্ভব হয়, তাহাতে আমি স্বীকৃত আছি।"

রমণী ব্যাকুলহৃদয়ে সবিনয়ে কহিল, "আমি কুলস্ত্রী। এতরাত্রে একজন অপরিচিতের সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অবিধি; বরং মৃত্যুও ভাল। কেবল নিজের জন্য হইলে কুলস্ত্রীর অমূল্য সম্মান খোয়াইয়া, এই অবিধেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না। অসহায় অবস্থায় মরিতে হইত মরিতাম; কেবল আমার স্বামী—তিনি পীড়িত রুগ্ন তাঁহাকে কে দেখিবে? তাঁহার কি হইবে? মহাশয়, দয়া করিয়া যদি আমাকে আমার বাটীতে রাখিয়া আসেন, কি বলিব, তাহা হইলে আপনি এ অসহায় স্ত্রীলোকের কতদূর উপকার করিবেন?"

যুবক বলিল, "আপনার বাড়ী এখান হইতে কতদূর ? নিকটে ?"

রমণী বলিল, "না—এই প্রান্তরের উত্তর দিকে অনেকদূরে। ঐ যে একটা আমবাগান দেখা যাইতেছে ; আপনি বোধ হয় আসিবার সময় দেখিয়া থাকিবেন ; ঐ আমবাগানের মাঝখান দিয়া পূর্ব্বমুখে গ্রামের মধ্যে যাইবার একটা পথ আছে, ঐ পথ দিয়া কিছুদূর যাইতে হইবে। আমি একাকী যাইতে ভরসা করিতেছি না, পথে সহায়হীন স্ত্রীলোকের অনেক বিপদ আছে।"

কথা শুনিয়া, বেশভূষা দেখিয়া, ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ভদ্র-মহিলা বলিয়া যুবকের বোধ হইল। এবং তাহার এরূপ অবস্থার কারণ জানিবার জন্য যুবকের মন অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কুলস্ত্রী হইয়া এই ভয়ঙ্কর স্থানে, এত রাত্রে কি জন্য আসিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সুন্দরীর অনুরোধে।

সেই কৃতাবগুণ্ঠনা বলিতে লাগিল, "আমার স্বামী আজ দুই বৎসর হইতে পীড়িত। অনেক চিকিৎসক দেখিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কি রোগ অথবা রোগের কারণ কি, কেহ কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই ; সুতরাং তাহাদিগের ঔষধেও কোন ফল হইল না। দুই একজন কবিরাজ এক প্রকার বায়ুরোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছু উপকার হয় নাই। বরং আমার স্বামীর ব্যারাম বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ; আগে এক একবার মূর্চ্ছা যাইতেন, এখন প্রতিদিন দুই তিন

বার. মূর্চ্ছা হইতে লাগিল; আগে একঘণ্টা মূর্চ্ছিত থাকিতেন, মূর্চ্ছা শেষে বেশ জ্ঞান হইত; এখন একবার মূর্চ্ছিত হইলে দুই ঘণ্টায় সংজ্ঞালাভ করিতে পারেন না। মূর্চ্ছা ভাঙিলেও তাহার পর আধঘণ্টা সে ঘোর লাগিয়া থাকে, উন্মত্তের মত প্রলাপ বকিতে থাকেন। কলিকাতার অনেক দক্ষিণে বেহালা নামে যে একটি গ্রাম আছে, সেখানে মূর্চ্ছা রোগের একটি দৈব্য ঔষধ পাওয়া যায়। কাল শনিবার, শনিবার প্রাতে সে ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়, তাই আজ রাত্রেই আমার স্বামীকে লইয়া, নৌকায় করিয়া সেখানে যাইতে ছিলাম। এই প্রান্তরটি পার হইয়াই আমার স্বামী বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন; আজ যাওয়া হইবে না বলিয়া অনেক আপত্তি করিতে লাগিলেন। মাঝিকে নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। আমি মাঝিকে মানা করিয়া দিলাম। নৌকা ধার দিয়া যাইতেছিল, আমার স্বামী লাফাইয়া তটে উঠিলেন; উঠিয়াই চীৎকার করিয়া বাড়ীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। আমিও তখন সেইসঙ্গে নামিয়া পড়িলাম। সেখানে বড় বন জঙ্গল, তাহার ভিতর তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন আর দেখিতে পাইলাম না। সম্ভব তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। হয় ত সেখানে গিয়া তিনি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন; অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মনের এইরূপ একটা চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে।”

যুবক অনন্যমনে সেই অপরিচিতা সুন্দরীর কথাগুলি আকর্ণণ করিলেন। তাহার কাতরোক্তিপূর্ণ কথায় এবং উৎকণ্ঠিত ভাব ইত্যাদিতে যুবক বিশ্বাসী ও দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, “চলুন, আমি আপনাকে রাখিয়া আসিব। আমিও ডাক্তার, যদি বলেন, আপনার স্বামীর রোগারোগ্যের জন্য একবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারি।”

রমণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি, ডাক্তার! তবে ভালই হইয়াছে; কিন্তু—কিন্তু।"

যুবক রমণীকে অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন, "বলুন কি বলিতেছেন।"

রমণী বলিল, "বহুদিন হইতে ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসা করাইয়া কোন উপকার দূরে থাকুক বরং অপকার হওয়ায় আমার স্বামী আজ কাল ডাক্তার কবিরাজের নামে জ্বলিয়া আছেন; এমন কি তাঁহার দুই একজন বন্ধু নামজাদা ডাক্তার; এখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপও করেন না—ডাক্তার কবিরাজের উপর আজ কাল যেরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে পাছে তিনি আপনাকে কোন প্রকার অপমানের কথা বলিয়া বসেন, তাহাই ভাবিতেছি।"

যুবক কহিলেন, "সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

রমণী। এক কাজ করিবেন আপনি যে ডাক্তার, এ পরিচয় তাঁহাকে দিবেন না।

যুবক। সে যাহা ভাল হয়, আমি করিব।

র। না মহাশয়, আপনি তাঁহাকে জানেন না। তিনি বড় উগ্র-প্রকৃতির লোক, আপনি আমার কথা রাখিবেন।

যু। তাহাই হইবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর যুবক সেই অপরিচিতা সুন্দরীকে আপনার নৌকায় উঠাইয়া লইলেন। মাঝি তাঁহাকে নিষেধ করিল। প্রেতিনীরা এইরূপ ভাবে সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তিতে পথিককে বিপথে চালিত করে, সে ভয়ও দেখাইল; এবং বলিল অনেক স্ত্রীলোক দস্যুর নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়া এইরূপে নিশাচরীর ন্যায় সারারাত শিকার সন্ধান

করিয়া বেড়ায়, অনেক রকম কৌশলে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া দস্যুপতির করতলগত করিয়া দেয়। প্রেতিনী বা অপদেবতার ভয় যুবকের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পাইল না। তিনি মাঝির এই কুসংস্কারপূর্ণ যুক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিতে পারিলেন না; তিনি শিক্ষিত, সাহসী, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, যৌবনোষ্ণ। তিনি সে অপরিচিতা সুন্দরীকে নৌকায় উঠাইয়া লইয়া নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। মাঝি অনিচ্ছায় নৌকা ফিরাইয়া লইয়া চলিল। তাহার মনে মনে বড় ভয় হইতে লাগিল, না জানি কি একটা ভয়ানক কাণ্ডই ঘটিবে; হয় ত নৌকা বন্‌চাল্ হইয়া যাইবে, নৌকা ডুবিবে, নৌকার সঙ্গে তাহাকে যে প্রেতিনী ডুবাইয়া মারিবে না, এমনও কি হইতে পারে? দম্ আটকাইয়া প্রাণটা যাইবে? তখন তাহার গৃহিণীর কথা মনে পড়িল, সন্তান-সন্ততির কথা মনে পড়িল; এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল, এবং শরাহত পক্ষীটির ন্যায় রুদ্ধপঞ্জর পিঞ্জরের ভিতরে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তাহার পর যখন স্রোত-মুখে নৌকা দ্রুত চালিত হইয়া অনতিবিলম্বে প্রান্তর পার হইয়া, সেই আম বাগানের ধারে গিয়া উপস্থিত হইয়া, কিনারায় লাগিল, যুবক সেই রমণীকে লইয়া তটে অবতরণ করিলেন। তখন সুদক্ষ মাঝি একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল ভাবিয়া ঈশ্বরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

যুবক যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, যতক্ষণ না তিনি ফিরিয়া আসেন, নৌকা যেন সেইখানে বাঁধিয়া রাখা হয়।

যুবকের যে প্রত্যাগমন ঘটিবে না, মাঝি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরীর কৃতজ্ঞতা।

আমবাগানের ভিতর দিয়া সেই স্ত্রীলোকটি অগ্রগামিনী হইল। যুবক তাহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

যুবকের বয়ঃক্রম আটাশ বৎসরের অধিক নহে। মুখশ্রী সুন্দর, সুকৃষ্ণ গুম্ফ ও অনিবিড় শ্মশ্রু, মস্তকের অনতিকুঞ্চিত ঈষদ্দীর্ঘ কেশ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ও দীর্ঘনেত্র সে মুখমণ্ডলের সমধিক শোভাবর্দ্ধন করিতেছ। দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, বলময়, মাংসপেশীতে সকল অংশ স্ফীত, ও পরিণত। বর্ণ গৌর। মুখ চোখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান বলিয়াই বোধ হয়।

তাঁহারা আমবাগান পার হইয়া একটা বড় বনের ধারে আসিয়া পড়িল। বনের ভিতর দিয়া একটি শীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ কিছু দূরে গিয়াই দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়াছে। সেই অপরিসর দীর্ঘ বনপথে পত্রান্তরালচ্যুত শীর্ণ জ্যোৎস্নালেখাগুলি মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া। যুবকের চক্ষে সেই অতুল সৌন্দর্যময়ী নবীনার প্রতি পদবিক্ষেপে, সুকোমল চরণস্পর্শে সেই মূর্চ্ছিত জ্যোৎস্না-লেখাগুলি যেন সজীব হইতে উঠিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু-প্রবাহে তাহার চঞ্চল অঞ্চল উড়িয়া এক একবার যুবকের গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল, এবং ঝিল্লিরবে সেই বিজনবনপথ মুখরিত হইতেছিল, এবং অগণ্য বৃক্ষলতা-পরিব্যাপ্ত বনভূমি ছায়ালোক-

চিত্রিত হইয়া একখানি উন্মুক্ত আলেখ্যবৎ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রিমা, বন্যকুসুমের গন্ধ, মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ মলয়ানিল, এবং মধু-কণ্ঠ বনবিহগের স্বরলহরী, সেই চিত্রাঙ্কিতবৎ বনস্থলী প্রতিক্ষণে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিল।

চুম্বকের সহিত একখণ্ড লৌহের যে সম্পর্ক, আর নারী-সৌন্দর্য্যের সহিত একটা পুরুষ-হৃদয়েরও ঠিক সেই সম্পর্ক। চুম্বকের ন্যায় নারী-সৌন্দর্য্যের এমন একটা অব্যর্থ আকর্ষণ শক্তি আছে, যাহাতে পুরুষ-হৃদয় অতি সহজে ও অজ্ঞাতভাবে, আকৃষ্ট হইতে থাকে। যুবক এতদূর পথ সেই আকর্ষণেই কথাটি না কহিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যন্ত্রচালিতের ন্যায় অতিক্রম করিতেছিল। সেই আকর্ষণেই আমবাগানের অতি দীর্ঘপথ ছাড়াইয়া বনে পড়িল এবং সেই আকর্ষণে সর্পসঙ্কুল ভীতিপূর্ণ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইল না, সেইরূপ নীরবে। তাহার পর যখন সেই বনের বিপুল গভীরতার মধ্যে, একান্ত বিজনতার মধ্যে পড়িয়া আর পথ পাইলেন না, তখন স্বপ্নশেষে আকস্মিক চেতনার ন্যায়, অকস্মাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় একটা শঙ্কা আসিয়া যুবকের হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি তখন সেই অপরিচিতাকে বলিলেন, "আমাকে আর কতদূর যাইতে হইবে? এ গভীর বনের ভিতর আমাকে অনিলেন কেন? নিকটে যে কোন লোকালয় আছে, এমন ত বোধ হয় না। এ বন যে কিছুতেই শেষ না। শীঘ্র যে শেষ হইবে এমনও বোধ হয় না। আমি কোন্ দিকে যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার দিক্‌ভ্রম হইয়াছে। আপনি আমাকে এখন কোথায় লইয়া যাইতেছেন, এ কোন্ দিকে যাইতেছি, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণে?"

অগ্রগামিনী অনুচ্চস্বরে বলিল, "এখন দক্ষিণ মুখে আমরা যাইতেছি আর বেশী দূর নাই, দক্ষিণদিকে আর কিছুদূর গিয়া পূর্ব্ব

দিকের একটা পথ পাইব সেই পথ ধরিয়া অল্পদূর গেলেই আমরা ব-
ছাড়াইয়া একটা বাগানে পড়িব, সেই বাগানে আমাদের বাড়ী।”

যুবক কহিলেন, “তাহা যেন হইল, কিন্তু, আপনি যেরূপ গোলমেলে পথ দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে ইহার পর পথ চিনিয়া একাকী নৌকায় ফিরিয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।”

কৃতাবগুণ্ঠনা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল, “সে জন্য আপনি ভাবিবেন না; আর একটি সোজা পথ আছে সে পথ দিয়া গেলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়; বাড়ীতে শীঘ্র পৌঁছাইবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎ-কণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্য এই বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইতেছি। মনেও বুঝিতেছি আপনার ন্যায় ভদ্রলোককে এ দুর্গম পথে আনিয়া ভাল করি নাই; কিন্তু কি করিব? আপনি আমার মনের উৎকণ্ঠা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। যাই হোক, ফিরিবার সময় আমাদের একজন ভৃত্যকে আপনার সঙ্গে দিব; সে আপনাকে ওদিক্‌কার সোজা পথ দিয়া লইয়া আপনার নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে। না জানি এ বনপথে আনিয়া আমি আপনাকে কত কষ্ট দিলাম। সে জন্য এ দুর্ভাগিনীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন।”

যুবক তাহার বিনয়পূর্ণ বচনে আত্মবিস্মৃত হইলেন। তাঁহার সবল হৃদয়ের মধ্যে দুঃসাহসিকতার উপর যে একটা অশুভসূচক শঙ্কার অনি-বিড় ছায়াপাত হইয়াছিল, সেই অবগুণ্ঠিতা সুন্দরীর অত্যধিক শিষ্টতায় ও বাক্যের ততোধিক মিষ্টতায়, তাহা বালুকাস্তূপে জলরেখার ন্যায় নিমেষে মিলাইয়া গেল। যুবক কহিলেন, “না, সে জন্য আপনি কেন এত কিন্তু হইতেছেন? আমার কোন কষ্ট হইতেছে না। আমার দ্বারা যে আপনার সামান্য উপকার হইল, তাহাতে বরং আমি সুখী হইলাম। মনুষ্য মাত্রেরই যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বেশি আমি কিছুই করি নাই।”

রমণী বলিল, "মহাশয়, আপনি এ বিপদের সময়ে আমার কতদূর উপকার করিলেন, কেমন করিয়া জানাইব? যদি আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হই, তাহা হইলেও আপনার কথা বোধ হয় আজীবন স্মরণ থাকিবে। আপনার নিকট আমি কতদূর ঋণী রহিলাম, তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। যদি আপনি এতদূর কষ্ট স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমার কি হইত বলুন দেখি? হয় ত কোন নারকীর হাতে পড়িয়া আমার কি সর্ব্বনাশ হইত? এত রাত্রে এ সকল ভয়ঙ্কর স্থান গৃহস্থ স্ত্রীলোকের পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা আপনার ন্যায় হৃদয়বান ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলা বাহুল্য। আপনার চিত্ত অতিশয় উদার, মহৎ; আপনার ন্যায় পরোপকারী, দয়ালু ব্যক্তি এ সংসারে খুব কমই আছে। আপনি যদি আমাকে এরূপ দয়া প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে কে বলুন দেখি, আমার এ বিপদে মাথা দিত? কে বলুন দেখি, নিজের সময় নষ্ট করিয়া একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হইত? সাহায্য করা দূরে থাকুক, এ অপরিচিতার উপর কেহ যে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত, এমন বোধ হয় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বাগান-বাটী।

তাহার পর সেই যুবক ও অবগুণ্ঠনবতী অনতিবিলম্বে একটি বাগানের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বাগানটি প্রকাণ্ড, এমন কি পঞ্চাশ বিঘার কম নহে; বাগানের চারিপ্রান্তের বড় বড় জ্যোৎস্নাস্নাত গাছগুলি দৃষ্টিসীমার যবনিকার উপর সুদৃশ্য রঞ্জিতচিত্রবৎ অতি সুন্দর। কোথায় সুদীর্ঘ ঝাউ, কোথায় ততোধিক দীর্ঘ নিবিড়তর দেবদারুর শ্রেণী চলিয়াছে। তাহার সম্মুখে, আম, নিচু, কাঁটাল, তাল, নারিকেল আরও কত কি ফলের গাছ। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পুরাতন দ্বিতল অট্টালিকা, বহুদিন মেরামত না করায় একান্ত শ্রীহীন। অনেক স্থানে বালি খসিয়া পড়ায় তাহার ইষ্টকপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

রমণী যুবককে লইয়া সেই দ্বিতল অট্টালিকার দ্বার-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ী কি আপনাদিগের?"

রমণী কৃতজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। বলিল, "অনেক রাত হইয়াছে, বোধ হয় চাকরেরা সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মনিবের শাসন না থাকিলে চাকরবাকরদিগের স্পর্দ্ধা এইরূপ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিয়া থাকে।" এই বলিয়া দ্বার ঠেলিয়া দিতে খুলিয়া গেল, তখন যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বাঁচ্লেম, এই যে কবাট খোলা আছে, তবে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, দেখিতেছি।"

যুবক বলিলেন, "তবে আপনি বাড়ীর ভিতরে যান, যদি তিনি

াসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে খবর দিবেন; আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

"সে কি, মহাশয়, তাহা হইবে না।" এই বলিয়া সেই রমণী কিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে একটা দম্‌কা বাতাস লাগিয়া াহার অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখনই সেই রমণী অতিশয় লজ্জিত ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অবগুণ্ঠনটি আবার বেশি করিয়া টানিয়া দিল। সেই ক্ষুদ্র অবসরে যুবকের সতৃষ্ণদৃষ্টি একবার সেই সুন্দরীর সুন্দর মুখমণ্ডলের অসম্পূর্ণভাবে সৌন্দর্য্যসুধা ক্ষণেকের জন্য পান করিয়া লইল। রমণীর তখনকার ভঙ্গিটি যুবকের মুগ্ধহৃদয়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিল। সেই ক্ষণেকের মধ্যে যুবক দেখিল, একটি মলিনতার ছায়াপাতে, বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সলজ্জ অথচ উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক চাঞ্চল্যে, এবং ঈষদ্‌প্রোদ্ভিত অধরৌষ্ঠের শ্রমজনিত মৃদুকম্পনে, সেই মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, মুখশ্রী আরও উজ্জীবিত হইয়াছিল; তাহাতে যুবকের অপরিতৃপ্ত তৃষিত নেত্রের তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া উঠিল।

পরস্ত্রী-দর্শনে এরূপ একটা অধৈর্য্য আকুল তৃষ্ণা একজন সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবকের পক্ষে বড় পাপের বিষয় হইলেও যুবকের মনে কোনরূপ কলুষিত ভাব ছিল না। স্ত্রীসৌন্দর্য্যের জন্য পুরুষ হৃদয়মাত্রেই যে একটি আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকে, ইহা তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যখন বিন্দু-বিসর্গ পাপ মিশিতে পারে, তখন ইহা মনুষ্যের একান্ত অদম্য, ও অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। যাই হোক্, যুবকের সম্বন্ধে এত ওকালতী করিয়া পুঁথি বাড়ানো আমার ভাল দেখায় না, বরং তাহাতে অনেক পাঠকের বিরক্তির আশঙ্কা করিতে হয়। এই যুবক এজন্য দণ্ডার্হ কি মার্জ্জনীয়, সে বিচারের ভার সদ্বিবেচক

পাঠক ও পাঠিকার উপর; তাঁহাদিগের সদ্বিচারে যাহা হয়, আমাদে এ যুবক তাহাই।

বাজে কথায় আমাদিগের দেরি হইয়াছে। রমণী অবগুণ্ঠনের পুনঃ স্থাপনা করিয়াই বলিল, "আপনি ভিতরে আসুন, আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন; বাহিরে একাকী এরূপ অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন?"

যুবক দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং সেই সুন্দরীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই একটি প্রাঙ্গণে পড়িলেন। প্রাঙ্গণটি খুব বড়, বড় অপরিষ্কার। তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে একটি হল্‌ঘর; সেখানে আলোক ছিল না; তথায় গভীর অন্ধকার আর একান্ত নিস্তব্ধতা নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিল। তন্মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রমণীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না; নিজেকে নিজেই দেখিতে পাওয়া যায় না, সে স্থানটি এমনই অন্ধকারময়। মৃদুপদশব্দ, কঙ্কণের মৃদুমধুর কিঙ্কিণী সেই সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে, দুর্ভেদ্য তিমিররাশির মধ্যে অগ্রগামিনী অদৃশ্য সুন্দরীর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছিল।

* * * * * * * *

সেই হলঘরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে দ্বিতলে উঠিবার একটা সোপান ছিল। রমণী সোপানের উপর পদার্পণ করিয়া যুবককে বলিল, "আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা আলো আনিতেছি।" পরমুহূর্ত্তে রমণীর চঞ্চল চরণবিক্ষেপের শব্দ ক্রমশঃ উর্দ্ধে মিলাইয়া গেল।

তখন যুবক সেখানে একা।

যুবকের চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রোগী-কক্ষে।

সেইখানে সেইভাবে একাকী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে যুবকের কষ্ট হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সিক্তভূমিতল হইতে এমন একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছিল, যুবকের তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। বায়ুর গতিবিধির জন্য কোন বন্দোবস্ত না থাকায়, সেই অসহ্য দুর্গন্ধে যুবকের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। দিবারাত্র অবরুদ্ধ ও অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় এই হল্‌ঘর যে, এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহা যুবক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রমণীর ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া যুবক রুদ্ধ বাতায়নের সন্ধানে ভিত্তিগাত্রে উভয় হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যদিও সন্ধান করিয়া একটা রুদ্ধ গবাক্ষ দেখিতে পাইলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাহা উন্মুক্ত করিবার কৌশল সেই অন্ধকারে তখনকার মত আনাবিস্কৃত রহিয়া গেল। সম্ভব তাহা বাহির হইতে বন্ধ। তখন ইহা অপেক্ষা তথা হইতে বাহির হইয়া—বাহিরে অপেক্ষা করা ভাল, মনে করিয়া যুবক যেমন দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় সহসা সোপানের ঊর্দ্ধভাগ হইতে একটি উজ্জ্বল আলোক রশ্মি আসিয়া, সেই সুবৃহৎ হল্‌ঘরের কিয়দংশ আলোকিত করিল।

যুবক ঊর্দ্ধমুখে সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই রমণী, সেইরূপ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একটি লণ্ঠন লইয়া সত্বর নামিয়া আসিতেছে। সোপানের অর্দ্ধাংশমাত্র নামিয়া আসিয়া রমণী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল,

"মহাশয়, শীঘ্র আসুন, এতক্ষণ যে ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে তিনি এখানে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। হায় হায়, না জানি কতক্ষণ তিনি এইভাবে আছেন, কি হইবে?"

"ভয় নাই, ব্যস্ত হইবেন না" বলিয়া যুবক সত্বর তাহার অনুসরণ করিলেন। সোপানাতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটি বারান্দায় পড়িলেন। তথা হইতে তিন চারিটি ঘর পার হইয়া একটি প্রশস্ত ও উচ্চ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী লণ্ঠনটি বারান্দার উপর রাখিয়া দিলেন। সে উজ্জ্বল আলোক রোগীর কক্ষে লইয়া যাইতে তাহার সাহস হইল না। সেই ঘরের একপার্শ্বে একটি অৰ্দ্ধদগ্ধ মোম্‌বাতী জ্বলিতেছিল। যুবক সেই ক্ষীণালোকে দেখিল, তথায় একপার্শ্বে একটি পরিস্কৃত শয্যার উপর এক জন প্রৌঢ়ব্যক্তি—তাহার বয়স চল্লিসের কম নহে—নিস্পন্দ দেহে মৃতবৎ পড়িয়া। তাহার মুখ মৃত্যুবিবর্ণীকৃত, চক্ষু নিমীলিত, এবং হস্তপদাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বিছানার অবস্থাও তদ্রূপ, বালিসগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে এখানে সেখানে. ও মাথার বালিসটি কক্ষতলে পড়িয়া আছে। আচ্ছাদনের বস্ত্রখানা ওলট পালট হইয়া গিয়াছে।

যুবক সর্ব্বাগ্রে সেই সংজ্ঞাশূন্য লোকটির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া সহজ লোকেরই ন্যায় বোধ হইল; তখন হঠাৎ তাঁহার মনে একটু সন্দেহও হইল; মনে হইল, লোকটির এ একটি ভাণ মাত্র। নতুবা এ রোগ এ জগতে এই নূতন।"

রমণী ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখিলেন?"

যুবক। নাড়ী দেখিয়া রোগের কিছু বুঝিতে পারিলাম না; সহজ লোকের নাড়ীর গতি যেরূপ থাকে, ইহারও তদ্রূপ।

রম। অনেক ডাক্তার কবিরাজ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আপনিও তাহাই বলিতেছেন।

যু। ইনি মূর্চ্ছা যাইবার পূর্ব্বে কি বড় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন?

র। হাঁ, তখন কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না।

যু। বিছানার অবস্থা দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে। আপনি বাহিরের লণ্ঠনটি এইদিকে একবার লইয়া আসুন।

র। কেন?

যু। নাড়ী দেখিয়া যখন রোগ নিরূপণ হইল না, তখন অন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

র। ইহাতে আপনার কি রোগ-পরীক্ষা হইবে?

যু। আমার বোধ হইতেছে, ইনি ভাণ করিয়া পড়িয়া আছেন।

র। এমনও কি হইতে পারে?

যু। সেটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

রমণী লণ্ঠনটি আনিলে যুবক তন্মধ্যস্থিত শিখাটিকে আগে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর সেটি সেই মূর্চ্ছিত ব্যক্তির মুখের উপর ধরিবার জন্য আদেশ করিলেন।

তখন যুবক সেই নিঃসংজ্ঞ লোকটির চোখের পাতা দুইখানি তুলিয়া ধরিলেন; দেখিলেন, তাহার চোখের তারা দুটি স্থির, তেমন উজ্জ্বল আলোক লাগিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না, চিত্রলিখিতবৎ স্থির ও নিস্পন্দ। যুবক মনে করিলেন, সত্যই যদি লোকটি ভাণ করিয়া এরূপভাবে থাকে, তাহা হইলে লোকটি এ বিষয়ে সুদক্ষ এবং এ ভাণও তাহার প্রশংসনীয়।

যুবক তাহাতে নিরস্ত হইতে পারিলেন না; তাহার আগ্রহ ও কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি সেই রমণীকে লণ্ঠনটি রোগীর চোখের নিকট সঞ্চালন করিতে বলিলেন। রমণী তদ্রূপ করিলে, অচেতন লোকটির চোখের তারা দুটিও তদ্রূপ নড়িতে

লাগিল। যুবকের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তখন যুবক একটি চোখের পাতা ছাড়িয়া দিয়া, অপর চোখের তারা অঙ্গুলি দ্বারা যেমন স্পর্শ করিতে যাইবেন, তখন সেইব্যক্তি সে চোখ কুঞ্চিত করিল; ইহাই যথেষ্ট।

রমণী পূর্ব্ববৎ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন?"

মৃদুহাস্যে যুবক উত্তর করিলেন, "এ রোগ আমি আরোগ্য করিয়া দিব—কোন ভয় নাই।"

রমণী বলিল, "এখন কি করিলে জ্ঞান হইবে?"

যুবক মনে করিলেন, জ্ঞান বেশ টন্‌টনে আছে; রোগী নিজে ইচ্ছা না করিলে অন্য কিছুতেই তাহার জ্ঞানলাভ হইবে না। প্রকাশ্যে বলিলেন. "এখন আপনি ইঁহার চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে পারেন। আরও পারেন যদি, আপনাদের নিদ্রাতুর কোন ভৃত্যকে ডাকিয়া যতক্ষণ জ্ঞানলাভ না হয়, ততক্ষণ পাখার বাতাসের একটা বন্দোবস্ত করুন।

রমণী সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য রোগী।

রমণী চলিয়া গেলে, রোগী দুই একটি যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। যুবককে দেখিয়া তাহার দৃষ্টিতে একটা বিস্ময় ভাব প্রকটীকৃত হইল। অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি? আপনার নাম?"

যুবক। আমার নাম দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র।

রোগী। কৈ, এ নাম ত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই?

যু। আমি এখানে থাকি না; আমার বাড়ী ভবানীপুর; কলিকাতার কিছু দক্ষিণে।

রো। হবে। তা আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন? কে আপনাকে এখানে আনিল?

যু। আপনি আপনার স্ত্রীকে নদীর ধারে একা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এতদূর একা ফিরিয়া আসিতে সাহস করিতেছিলেন না। সেই সময় আমি সেইখান দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছিলাম, আমাকে দেখিয়া আপনার স্ত্রী তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলেন; তাই তাঁহাকে রাখিতে আসিয়াছিলাম। তাঁহার মুখে শুনিলাম, আপনি পীড়িত। আমি ডাক্তার, তাই একবার আপনাকে দেখিতে এখানে আসিলাম।

রো। ডাক্তার আপনি? ডাক্তারের উপর যে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাহা কি আপনি আমার স্ত্রীর মুখে শুনেন নাই?

যু। হাঁ, তিনি একবার বলিয়াছিলেন বটে।

রো। তবে আপনি আবার কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন কেন? তিনিই বা আপনাকে অনর্থক আনিলেন কেন?

যু। আপনি মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া ছিলেন। এখন আপনাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি, আর আমার এখানে থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমি এখন যাইতে পারি। (গমনোদ্যোগ)

রো। বসুন। রাগ করিলেন নাকি? আমাকে মাপ করিবেন। আপনার সহিত যেকালে সাক্ষাৎ পরিচয় হইল, তখন আপনার হাতে একবার ডাক্তারী চিকিৎসার শেষ পরীক্ষা লইতে পারি। আপনি আমার এ রোগের যাহাতে শীঘ্র উপশম হয়, এমন কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন কি?

যু একবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। তবে, কথা হইতেছে, আগে রোগী আর চিকিৎসকের পরস্পর পরস্পরকে বুঝিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। তাহার পর রোগের চিকিৎসা; আপনি যদি আমার নিকট রোগ গোপন করেন, আর আমি আজীবন ধরিয়া অনবরত যদি চেষ্টা করি, তথাপি আপনার রোগের কিছুই করিতে পারিব না। আমার মনের ভাব আমি আগেই বলিতেছি, আমি যখন প্রথমে আপনাকে আসিয়া দেখিলাম, তখন আপনি মূর্চ্ছিতবৎ ছিলেন বটে, কিন্তু আপনি যথার্থ মূর্চ্ছা যান্ নাই—ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। কি বলেন?

রো। আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি অজ্ঞানের ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিলাম, তখন আমার বেশ জ্ঞান ছিল।

যু। এরূপ করিবার কারণ কি?

যুবকের এরূপ প্রশ্নে রোগীর চক্ষু একবার ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া

উঠিয়া পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। তাহার পর শূন্যদৃষ্টিতে একবার দ্বারের দিকে চাহিয়া, চারিদিকে চাহিল; আবার সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উদ্বেগকম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কেবল আমার স্ত্রীর জন্য—আর কিছু না। ডাক্তারবাবু, কোন রকমে আমার এই মূর্চ্ছাটি চব্বিশ ঘণ্টা স্থায়ী করিয়া দিতে পারেন, এমন কোন্ উপায় আছে কি? যখন মূর্চ্ছিত থাকি, তখন আমি নীরোগ, তখন আমি বেশ ভাল থাকি। তাহার পর যখন জ্ঞান হয়, তখন কেবল যন্ত্রণা, বুকে যন্ত্রণা—মাথায় যন্ত্রণা—বুক ফেটে যায়—মাথা ছিঁড়ে পড়ে—এমনই ভয়ানক যন্ত্রণা। আমি জানি, আমার এ যন্ত্রণা ইচ্ছাকৃত। আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতেই যে একদিন আমার এ জীবনের অবসান হইবে, তাহাও আমি জানি। সাধ করিয়া যে আমি নরকাগ্নি বুকের মধ্যে জ্বালিয়াছি, তাহাও আমি জানি। কিন্তু প্রাণান্তেও আমি সে কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই—পরেও করিব না। আপনি এখন এক কাজ করুন, আপনি এখন অন্য ঘরে গিয়া বসুন। আমি এখন একা থাকিতে পারিলেই অনেকটা সুস্থ হইব। আপনাকে যে সকল কথা বলিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীর নিকট তাহার একটি বর্ণও প্রকাশ করিবেন না। তাহাকেও এখন এখানে আসিতে মানা করিবেন। আমি আপাততঃ কিছুক্ষণ একা থাকিতে চাই। একটু সুস্থ হইলে, পরে আপনাকে ডাকিব।" এই বলিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়া একটি উন্মুক্ত গবাক্ষের সম্মুখে করতললগ্নশীর্ষ হইয়া বসিলেন। এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

যুবক তাহার কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, লোকটার মাথা বোধ হয় কোন রকমে খারাপ হইয়া গিয়াছে। তখন

"তিনি সেই অদ্ভুত রোগীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়া-লেন। এমন সময়ে সেই রুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রী দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "আপনি যে একাকী এখানে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি কি—"

যুবক বাধা দিয়া বলিলেন, "তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছেন। উঠিয়া জানালার নিকট বাতাসের মুখে বসিয়াছেন; এখন তিনি একা থাকিতে চাহেন। বোধ করি, আপনার স্বামীর মনের ভিতর শোক বা দুঃখের এমন একটা আঘাত লাগিয়াছে, যে জন্য তিনি একান্ত অধৈর্য্য ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বোধ করি, মস্তিষ্কও কিছু বিকৃত হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই তিনি আপনাকে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের ছায়া।

রমণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে নতমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কই, তেমন ত কোন ঘটনা ঘটে নাই। আপনি এখন (অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) বারান্দার ওদিককার কোণের ঘরে গিয়া বসুন; সে ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইবেন। আপনার বড় বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে, সে জন্য কিছু মনে করিবেন না; বড় দায়ে পড়িয়াই আপনাকে কষ্ট দিতেছি।" বলিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী রোগীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর যখন যুবক দুই পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে সেই রোগীর কক্ষ হইতে দুই একটি বড় ভয়ানক কথা তাঁহার কাণে গেল।

কথাগুলি খুব মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও, বেশ বুঝিতে পারা গেল, যুবক সেইখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

রমণী বলিল, "সেই লোক ঠিক্ ? তুমি ঠিক চিনিতে পারিয়াছ ?

রোগী বলিল, "হাঁ, সেই লোকই ঠিক।"

রমণী। ইহারই নাম দেবেন্দ্রবিজয় ?

রোগী। ইহারই নাম।

রম। তবে আমার কোন ভুল হয় নাই ?

রো। কোন দিন যাহা হয় নাই, আজ হইবে ?

এই বলিয়া রোগী অনুচ্চস্বরে হাসিল। সে শব্দও সেই যুবক বাহির হইতে বেশ শুনিতে পাইলেন।

তাহার পর—

রম। এখন কি করিতে হইবে ?

রো। যাহা তোমার অভিরুচি।

রম। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব ?

রো। খুন কর।

রম। খুন করিব !

রো। আশ্চর্য্য হইয়া গেলে যে ! কই, এমন কথা ত তোমার মুখে আর কখনও শুনি নাই ? আজ খুনের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িতেছ ! আগে খুন করিতে তোমারই আগ্রহ অধিক দেখিতাম। কি জানি, যুবকের রূপ দেখিয়া সহসা আত্মহারা হইয়া পড় নাই ত ? দেখিয়ো, আমাকে যেন শেষে পথে বসাইয়ো না।

রমণী। সে ভয় নাই, তাহা হইলে অসংখ্য বিপদের বোঝা মাথায় লইয়া তোমার সঙ্গে এত কাল ধরিয়া ঘুরিয়া মরিতাম না। তুমি কি আমাকে এমনই মনে করিয়াছ ? আগে এই লোকটির সম্বন্ধে যেরূপ

পরামর্শ করা হইয়াছিল, সেই পরামর্শ মতে কাজ করিলে ভা: হইত না কি?

রোগী। সেই পরামর্শ মতেই কাজ কর। বিশেষতঃ সেইজন্যই লোকটাকে বেশি দরকার।

শুনিয়া যুবকের চক্ষুস্থির। শুনিয়া এক জটিল রহস্য হইতে ততোধিক জটিল ও দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। মুখে তাঁহারই নাম! তাঁহারই নাম দেবেন্দ্রবিজয়—তাঁহাকেই খুন করিবার কথা—আগেকার পরামর্শ মতে কাজ হইবে! এ সকল কথার অর্থ কি? যুবক কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তালভাবে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। সাহসে বুক বাধিয়া যুবক আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যখন তাহাদিগের আর কোন কথা শুনা গেল না, তখন তিনি তথা হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, অপর পার্শ্বে বারান্দার রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানেও অত্যন্ত অন্ধকার। যুবক সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আপনার অদৃষ্ট ও বিপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং চারিদিকের নিবিড় অন্ধকার তাঁহার চক্ষের উপর আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ ও ভয়।

অগৌণে সেই রমণী একটি প্রজ্জ্বলিত দীপহস্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকট উপস্থিত হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার অবগুণ্ঠনের সে দীর্ঘতার এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়াছে; তাহার স্বেদবিজড়িত চূর্ণালকবিশোভী অপ্রসর ললাটের কিয়দংশ আবৃত রাখিয়াছে মাত্র। কাণের পাশ দিয়া তাহার বিপুলকৃষ্ণকেশরাশির একটা দীর্ঘ ও স্থূল গুচ্ছ তাহার সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত পীন, পীবর ও উন্নত বক্ষের উপর তরঙ্গায়িতভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেই অপ্রশস্ত অবগুণ্ঠন ও কৃষ্ণকেশগুচ্ছে সেই আলোকজ্জ্বল মুখখানি বোধ হইতেছে, যেন একখণ্ড শ্বেত ও একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ বসন্তপূর্ণিমার চন্দ্রকে উভয় পার্শ্ব হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। হস্তস্থিত দীপালোকে রমণীর ঈষল্লোহিতাভ মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া ও সেই চঞ্চল, হাস্যময় কৃষ্ণোজ্জ্বল আকর্ণ চক্ষুর, প্রাখর্য্যে মনোহর ও তীক্ষ্ণতায় মধুর এবং চাঞ্চল্যে মধুরতর সে দৃষ্টির মধ্য দিয়া একটা মুগ্ধকরী রমণীয়তা সম্পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে।

সেই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনী বিলোলকটাক্ষশালিনীর আগমনে ও তাহার সেই ললিতকোমলভাবভঙ্গিতে মুগ্ধ দেবেন্দ্রবিজয় পূর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইলেন। আপনার বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন; মনে আর পূর্ব্বের ভাব কিছুই রহিল না। তখন মনে হইতে লাগিল, বৃহদরণ্যমধ্যবর্ত্তী অন্ধকারময় ভগ্নপ্রায় সেই প্রকাণ্ড জনবিরল নির্ব্বান্ধব পল্লীটাই তাঁহার

ভয়ের একমাত্র কারণ, আর সেইখানে সেই অপরিচিতা রমণীই তাঁহার একমাত্র পরিচিতা। আর ও মনে হইতে লাগিল, অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার মুখে যে সকল ভয়াবহ কথা আকর্ণন করিয়াছিলেন, সে আর কিছুই নহে, তাঁহার অলস মনকে চঞ্চল করিতে একটা অমূলক কল্পনা কখন অন্ধকারে অদৃশ্য ও অজ্ঞাতভাবে তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করিয়া, সেখানে একটা বাসা বাঁধিবার আয়োজন করিতেছিল। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা ভুল—তাহা নিরর্থক—এবং তাহার কোন মানে হয় না।

যখন দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের ভিতর এইরূপ বিপ্লব, তাঁহাকে রমণী মৃদুহাস্যে বলিল, "আপনি যে এখানে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছি, আমার সঙ্গে আসুন।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আর কেন, অনেকক্ষণ আসিয়াছি—আপনি একজন ভৃত্যকে বলুন, আমাকে নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। নিজে পথ চিনিয়া যাইতে পারিব না।"

রমণী বিনীতভাবে বলিল, "মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, কিছু জলযোগ না করিয়া আপনি কিছুতেই যাইতে পাইবেন না।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "সে জন্য আমাকে আপনি ক্ষমা করিবেন।"

রমণী বলিল, "তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। মহাশয়ের নামটি কি শুনিতেপাই না? এরূপ উপকারীর নাম আমাদের চিরকাল স্মরণ রাখা উচিত।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "দেবেন্দ্রবিজয়।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরীর মনের ভাব।

দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া রমণী সেই সুদীর্ঘ বারান্দার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল। সেখানে একটি ঘর চাবিবন্ধ ছিল। রমণীর নিকটে চাবি থাকায়, তখনই খুলিয়া ফেলিল; উভয়ে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; এবং রমণী ভিতর হইতে দ্বার আর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। সেখানে উপরে উঠিবার একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া উভয়ে উপরে উঠিলেন। সেখানে মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা। জ্যোৎস্নালোকপরিপূর্ণ, উন্মুক্ত-ছাদ অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। সেখানে আসিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আমাকে কোথায় লইয়া য়াইতেছেন?"

রমণী মৃদু হাসিয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি একটা অত্যন্ত তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আপনি এত ভীত হইতেছেন কেন? আমি কি আপনাকে খাইয়া ফেলিব? আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ—আপনার সে ভয় নাই, আসুন।"

দেবেন্দ্রবিজয় তাঁহার প্রশ্নের এইরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপূর্ব্ব সদুত্তর পাইয়া নিরুত্তরে রমণীর সহিত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক তখন অসম্ভবরূপে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এ সকলই যেন একটা অভাবনীয় ও অনপেক্ষিত স্বপ্নের মতন তাঁহার মনোমধ্যে বোধ হইতেছিল। হইবারই কথা। সেই নির্জ্জন নদীতীরে, প্রস্ফুটচন্দ্রালোকে, মধুর

জলকলতানে, সহসা যে মোহ একবার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যুবকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়া, তাঁহার বুকের মধ্যে যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখন তেমনই শীঘ্র অপনীত হইবার নহে।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রমণী বলিল, "আপনি অপরিচিত, রূপবান্ যুবক, বিশেষতঃ পরপুরুষ, আর আমি, আমি স্ত্রীলোক, আমারও রূপ আছে, যৌবন আছে. বিশেষতঃ পরস্ত্রী, এরূপ সময়ে কেহ যদি আমাদিগকে এই রাত্রে নির্জ্জন ছাদের উপর দেখিতে পায়, সে কি মনে করে বলুন দেখি?"

এ কি প্রশ্ন, ইহার কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে মনে অস্থির হইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, কুলস্ত্রী বোধে তিনি যাহার বিপদে মাথা দিয়াছিলেন, সে অসচ্চরিত্রা পিশাচী— পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী। রমণী দেবেন্দ্রবিজয়ের মনোভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়া, তাই সহসা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অন্য সুরে বলিল, "আপনিও হয় ত আমার এরূপ ব্যবহারে আমাকে মনে মনে দোষারোপ করিতেছেন। আশ্চর্য্য নয়, ইহা আপনার দোষ নয়—নারী-জাতিরই হৃদয় বড় দুর্ব্বল। সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়—আপনার কর্ত্তব্য ঠিক রাখিতে পারে না। যাই হোক, আপনি আমাকে অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবিতেছেন, সন্দেহ নাই। কি করিব, আমার এইরূপ বাচালতার জন্য আমি আজন্ম কাল নিন্দাভোগ করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া আমার এ নিন্দনীয় স্বভাবের হস্ত হইতে আমি কিছুতেই মুক্তি পাইলাম না। এ জন্য আপনি আমাকে দোষী ভাবিবেন না।"

তখন সরলচিত্ত দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের উপর হইতে সহসা একখানা মেঘ কাটিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরীর আত্মপ্রকাশ।

সেই ছাদের দক্ষিণকোণে আর একটি ছোট ঘর ছিল। রমণী যুবককে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরটির চারিদিক উত্তমরূপে বন্ধ। একপার্শ্বে একটি উপযুক্ত ছোট শয্যা ছিল। অপর পার্শ্বে একটি আল্‌মারী; রমণী যুবককে বসিতে বলিয়া, সেই আল্‌মারীর ভিতর হইতে আপেল, নাসপাতি, নারাঙ্গী, আঙ্গুর প্রভৃতি সুখাদ্য পরিপূর্ণ একখানি রৌপ্যপাত্র বাহির করিয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে ধরিল। সেই সকল আহার্য্য সামগ্রীর সুমিষ্ট গন্ধে জঠরের নিভৃত প্রদেশস্থ পরিতৃপ্ত সুপ্ত ক্ষুধাও একবার অত্যন্ত ব্যাগ্রভাবে সপ্তোত্থিতবৎ চকিতে মাথা নাড়া দিয়া, স্পষ্টরূপে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে।

দেবেন্দ্রবিজয় সে সকলের কিছুই স্পর্শ করিলেন না; এবং যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে অস্বীকার করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয়ের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতঃ জানি না, কিন্তু রমণী সে অস্বীকার কিছুতেই স্বীকার করিল না; আঙ্গুরগুচ্ছ হইতে তাড়াতাড়ি একটি সুপক্ক আঙ্গুর ছিঁড়িয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল। দেবেন্দ্রবিজয় মুখ সরাইয়া লইলেন; কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সেই রমণী সহসা দীপ নিবাইয়া দিল, এবং দুই হস্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখোপরি বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল। রম-

ণীর এইরূপ অসম্ভব অযথা দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। রমণীর সেই অজস্র চুম্বন-বর্ষণে দেবেন্দ্রবিজয় বিস্ময় প্রকাশেরও এক মুহূর্ত্ত অবসর পাইলেন না। অত্যন্ত বিস্ময়ে তাঁহাকে একেবারে নিঃসংজ্ঞ করিয়া দিল; কারণ একজন অপরিচিতার নিকট এরূপ অযথা ব্যবহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাহা হইলেও, তাঁহার সে নিঃসংজ্ঞভাব অনেকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না; অকস্মাৎ আলোক-রশ্মির ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে জাগরণের ন্যায়, তাঁহার মনের সেই অন্ধকার অচেতন অবস্থার ভিতর সংজ্ঞার জাগ্রত সঞ্চার হইল। তিনি রমণীকে জোর করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তথাপি তাঁহার দুই হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন। বলুন, ক্ষমা করিলেন। নতুবা আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ হৃদয় যেমনি দুর্ব্বল, তেমনি অদম্য, কিছুতেই বশ মানিবার নয়।"

দেবেন্দ্রবিজয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না, তিনি পিশাচীর হাতে পড়িয়াছেন, সহজে মুক্তি পাইবার আশা নাই। তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের ন্যায় সচ্চরিত্র যুবকের মুখে যাহা ভাল শুনায়, তিনি তাহাই বলিলেন, "আপনি ভদ্রমহিলা, আপনি এ কি করিতেছেন? আমি অপর লোক, আত্মীয় নই, অপরিচিত, আমাকে স্পর্শ করিবেন না; তাহাতে আপনার স্ত্রী-ধর্ম্মের হানি হইবে।

রমণী দেবেন্দ্রবিজয়ের কথাগুলি মন দিয়া শুনিল; এবং তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। কিন্তু, তাহার কোনরূপ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না; না লজ্জিত, না সঙ্কুচিত, না অপ্রতিভ, না বিস্মিত—কিছুই না। ক্ষণপরে বলিলেন, "দেবেন্দ্র বাবু, আপনি যেকালে আমাকে সহসা এতগুলি কথা শুনাইয়া দিলেন, আমি সকলেরই উত্তর

রিতেছি। বলুন দেখি, দেবেন্ বাবু, আপনি যে আমাকে ভদ্রমহিলা বলিলেন, কিসে আমি ভদ্রমহিলা ? যে লোক জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া, মরিতে বসিয়া, আমার মত একজন অযোগ্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নারী-জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়া দিতে পারে, সে কিসে ভদ্রলোক ? আমার এই বয়স, এই রূপ, এই যৌবন, একি একজন মরণোন্মুখ বৃদ্ধেরই যোগ্য ? আর আপনি কিসে অপরিচিত ? যিনি একবার সাক্ষাতেই হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখানে একটা চিরস্থায়ী আসন পাতিতে পারেন, তিনি কিসে অপরিচিত ? সেই এক মুহূর্ত্তের সে পরিচয়—তেমনটি যে সহস্র বৎসরে হয় না। আর ঈশ্বরের নিকট অপরাধী কিসে আমি ? বরং ঈশ্বরই আমার নিকট অপরাধী। তিনি আমাকে এই জগজ্জয়ী রূপ দিয়া, উদ্দাম যৌবন দিয়া, তাহার ভিতর একটা চিরতৃষ্ণাতুর হৃদয় দিয়া, শেষে একটি অযোগ্য বৃদ্ধের হাতে সেই সকল সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন, সে জন্য কি তিনি আমার নিকট অপরাধী নহেন ? যখন একজন জ্ঞানবান্ বৃদ্ধের ধর্ম্ম নাই, ঈশ্বরের ধর্ম্ম নাই, তখন আমি একটা স্ত্রীলোক বই ত নয়—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—তৃণাপেক্ষাও লঘু, আমার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ?"

রমণীর এইরূপ দুরভিসন্ধিপূর্ণ, অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে করিলেন, তিনি পরের বিপদে মাথা দিতে আসিয়া নিজের বিপদটা অত্যন্ত গুরুতর করিয়া এবং কাজটা অতি-শয় অন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। বলিলেন, "আপনি যাহাই হন্ যেরূপ প্রকৃতির হন্, আমার কাছে ওসকল কথা না বলিলেই ভাল হয়। আমাকে পথ দেখাইয়া দিন্। এমন জানিলে আমি কখনই আপনার সঙ্গে আসিতাম না।"

রমণী বলিল, "না আসিলে আমারও ভাল হইত; কে জানিত

আপনি এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার হৃদয়ের এমন একটা সর্ব্বনেশে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিবেন? দেবেন্দ্র বাবু, সত্য বলিতে কি, আমি মরিতে বসিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন; আমি আপনার পদাশ্রিতা—আমাকে এরূপ কঠিনভাবে ত্যাগ করিবেন না। তাহা হইলে আমি বাঁচিব না, আপনি আমার বিপদ্-উদ্ধারের জন্য আসিয়া, এখন আমাকে সহস্রটা বিপদের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। আপনি এরূপ নির্দ্দয়, জানিতাম না।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপেক্ষিতা।

দেবেন্দ্রবিজয়ের হৃদ্পিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। তিনি একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই রমণী দ্বারবন্ধ করিয়া তদুপরি পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। এবং কটাক্ষের পর কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া মৃদুহাস্যে বলিতে লাগিল, "আমার মুখে আগুন, তাই এমন একটা নিষ্ঠুর অরসিককে দেখিয়া আপনা ভুলিয়াছি।"

দেবেন্দ্রবিজয় কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "পথ ছাড়ুন, আমাকে বিপদে ফেলিবেন না।"

রমণী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "কখনই না। যাইতে হয় আমাকে খুন করুন। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি বড় ছুরিকা বাহির করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া) এই ছুরি নিন্—আমাকে খণ্ড খণ্ড

করিয়া কাটিয়া ফেলুন। এখানে কেহ আসিবে না—কেহ কিছুই জানিবে না—কোন ভয় নাই ; তাহার পর আপনার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান, আমি বাধা দিতে আসিব না। দেবেন্দ্র বাবু, আপনি কেমন জানি না, কিন্তু, এরূপ আত্মহারা স্ত্রীলোককে প্রত্যাখান করা অপরের পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইত।" এই বলিয়া, সে আবার দেবেন্দ্রবিজয়ের হস্ত ধারণ করিয়া যতদূর সম্ভব নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে সেই ব্যাকুলা সুন্দরীর অবৈধ আবদার ও অনুচিত দাবী যত সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে লাগিল, ও দিকে তেমনি আবার দেবেন্দ্রবিজয়ের অত্যধিক ঘৃণা ও বিরক্তি ততোধিক সীমাতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল। ক্রোধভরে দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তুমি পিশাচী, দূর হও—আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।"

রমণী আবার ছুটিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিল। অবিচলিতভাবে বলিল, "ওঃ দেবেন্. তুমি কি নিষ্ঠুর, পুরুষ মানুষ এতদূর নিষ্ঠুর হইতে পারে, তা জানিতাম না।"

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্ব্বাপেক্ষা সজোরে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

তথাপি সে আবার ছুটিয়া আসিয়া সেইরূপ আগ্রহভরে দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিয়া, একটা বিদ্রূপময় সুতীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, সেই রমণী নম্রস্বরে বলিল, "তথাপি আমি তোমাকে সেইরূপ অত্যন্ত ভালবাসি।"

রমণীর বক্ষের বসন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে ; দীপালোক তাহার পীবর, যৌবনভারাবনতদেহ অনাচ্ছন্ন অবস্থায় অতিশয় সৌন্দর্য্যময় বোধ হইতে লাগিল। উন্মুক্ত কেশদাম বিশৃঙ্খলভাবে তাহার চোখ, মুখ বুক ও পিঠের কোন অংশ ঢাকিয়া ও কোন অংশ একেবারে উন্মুক্ত

রাখিয়া আর একটা অপূর্ব্ব শোভায় প্রদীপের ক্ষীণালোকপূর্ণ সেই গৃহটি এককালে প্রদ্যোতিত করিয়া তুলিল। সহনাতীত উৎকণ্ঠায় তাহার ললাটে স্বেদশ্রুতি এবং ঘনশ্বাসে তাহার অনাবৃত পীরবোন্নত বক্ষঃস্থল ঘনঘন পরিস্পন্দিত হইতে লাগিল। সেই উপেক্ষিতা রমণী নিরুপেক্ষিত, ও অনপ্রতিভভাবে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের উপর তাহার দীপ্ত কৃষ্ণতার চোখ দুটির চঞ্চল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, স্মিতমুখে বলিল, "দেবেন্দ্রবিজয়, তুমি যতই আমাকে ঘৃণা কর না কেন, আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি। কিন্তু, আশা করি নাই, আমার এই স্বার্থশূন্য ভালবাসা তোমার হাতে এইরূপ কঠোরভাবে পুরস্কৃত ও উপেক্ষিত হইবে।"

দেবেন্দ্রবিজয় ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইলেন। "কুলটা, তোমাকে স্পর্শ করিতেও পাপ আছে।" বলিয়া তিনি সেই রমণীকে দুই হাতে এরূপ সজোরে ধাক্কা দিলেন, সে এক রকম প্রহার করা; সুতরাং রমণী তাহা সামলাইতে পারিল না; ঘরের কোণে গিয়া পড়িল এবং দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া অত্যন্ত আঘাত পাইল। তখন সে লাঙ্গুলাবমৃষ্ট সর্পিণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার প্রচুরায়ত রোষারক্তচক্ষুদুটি উল্কাপিণ্ড-বৎ অতি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল এবং তন্মধ্য হইতে জ্বলন্ত বহ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। সেই বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয় স্তম্ভিত হইলেন, মুখে কথা সরিল না। রমণী তীব্রকণ্ঠে বলিল, নারকী, আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়াছ, এ অপমানের প্রতিশোধ এইরূপেই হইবে।" বলিয়া তখনই পরিত্যক্ত দীর্ঘ শাণিত ছুরিখানা ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া লইল, এবং দেবেন্দ্রবিজয়ের বুকে তাহা আমূল বিদ্ধ করিবার জন্য সবেগে উর্দ্ধে উত্তোলন করিল। তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রবিজয় দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, এবং ছুরিখানা কাড়িয়া লইয়া রমণীকে পুনরায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রমণী তখনই সবেগে উঠিয়া, ঘরের বাহিরে আসিল। বাহির হইতে বলিল, "তথাপি তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।" বাহির হইতে দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিল।

দেবেন্দ্রবিজয় দ্বার উদ্‌ঘাটনের কোন উপায় পাইলেন না। তিনি সেই নির্জ্জন গৃহের মধ্যে এইরূপে বন্দী হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণনাশের চেষ্টা।

দেবেন্দ্রবিজয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আশামাত্রও নাই। সেখানে তাঁহাকে এমন সময়ে একটু সাহায্য করে, এমনও কেহ নাই।

রমণী চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই দেবেন্দ্রবিজয় একটা কি অনাঘ্রাতপূর্ব্ব অতিতীব্র গন্ধ অনুভব করিলেন। চারিদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ গন্ধ আরও তীব্র হইতে লাগিল, এমন কি শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, সেখানে এক মুহূর্ত্ত অবস্থান করা মনুষ্যমাত্রেরই সাধ্যাতীত। শেষে দেখিলেন, কোন অদৃশ্যস্থান হইতে ধূমরাশি সেই ছোট রুদ্ধ ঘরের ভিতর অল্পে অল্পে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ঘরের ভিতর যত অধিক পরিমাণে ধূম সঞ্চিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সেই প্রাণান্তকর দুর্গন্ধও তীব্রতম হইয়া উঠিতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, কোন পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে আগুণ লাগিয়াছে, অথবা সেই উপেক্ষিতা সর্পিণী সদৃশা স্ত্রীলোকটি, সেই গৃহে অগ্নি-

সংযোগ করিয়া, সেই অপমানের প্রতিশোধ করিতে অপমানকারীর মৃত্যুর পথ সহজ ও সরল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই সে ধারণা দেবেন্দ্রবিজয়ের মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল. কারণ ঘরে আগুণ লাগিলে সে ধূম এমন উত্তাপ শূন্য, কি, এমন একটা উগ্র গন্ধযুক্ত হইত না। সে গন্ধ অত্যন্ত বিষাক্ত সন্দেহ নাই, নতুবা তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া শাণিত ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে থাকিবে কেন? দেবেন্দ্রবিজয় তখন বুঝিলেন, আর নিশ্চিন্ত হইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার এ সময় নহে। তিনি উঠিয়া দ্বারের নিকট গেলেন, এবং উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি বাহির হইতে না পারেন, নাই—নাই; তখন সেই নিবিড়তর ধূমরাশির কতকটা বাহির হইয়া গেলে, তিনি তখনকার সেই শ্বাস-রাহিত্য অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং ইহার পর অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি রুদ্ধ গবাক্ষগুলি উন্মোচন করিতে গেলেন, তাহাতেও তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন; সকলগুলিই বাহির হইতে বন্ধ; এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ কিছুতেই খুলিল না। তখন তিনি একান্ত নিরাশ ও নিরুপায় হইয়া, ছুটিয়া গিয়া, দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সেই রুদ্ধদ্বারে পদাঘাতের উপর পদাঘাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র গৃহ সেই পদাঘাতের শব্দে যেন ফাটিয়া পড়িবার মতন হইল; তথাপি সেই কঠিন কবাট জোড়াটা কঠোর ও অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া সেই দুঃসহ পদাঘাতগুলা অনায়াসে সহ্য করিয়া, পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

এমন সময় বাহির হইতে কে বলিল, "বৃথা চেষ্টা দেবেন্দ্র, বৃথা চেষ্টা; স্ত্রীলোক উপেক্ষিতা হইলে পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী হয়।

বিধির লিখন, তোমার মৃত্যু এইরূপেই হইবে। মরিতে বসিয়াছ, নিজে মর—কবাট জোড়াটার অপরাধ কি ?"

তাহার পর খল্ খল্ খল্—কি ভয়ানক অট্টহাসি !

সেই তীক্ষ্ণ শাণিত হাস্য বিদ্যুতের শিখার ন্যায় সেই ধূমময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পরক্ষণেই বাহিরের মুক্তপ্রকৃতির দূর দূরান্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে ক্ষীণ—ক্ষীণতম হইয়া মিলাইয়া গেল। তার পর সকলই নীরব।

দেবেন্দ্রবিজয় স্বর শুনিয়া বুঝিলেন "সেই তীব্র উপহাস এবং সেই উপহাসের অতি তীক্ষ্ণ ও শাণিত হাস্যকল্লোল আর কাহারও নহে—এ সেই দস্যু-রমণীর—সেই পিশাচীর।

• •

রুদ্ধশ্বাসে সেই ক্ষুদ্র কক্ষগৃহমধ্যে দেবেন্দ্রবিজয় ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এখন যে সামান্য জ্ঞান ছিল, তাহাও লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। সেই বিষাক্ত গন্ধ দেবেন্দ্র বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গ ক্রমে অবশ করিয়া আনিল। তখন সেই দুর্গন্ধ ধূম গৃহের মধ্যে এত নিবিড় হইয়াছিল, যে তন্মধ্যে সেই দীপশিখা একান্ত ম্লান ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল; এবং তাহার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি তন্মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহটি দেবেন্দ্রবিজয়ের চক্ষে আরও অন্ধকার দেখাইতেছিল। তিনি সহনাতীত যন্ত্রণায় আকুল হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, এবং বুকফাটা-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "কে আছ, শীঘ্র এস, রক্ষা কর—বাঁচাও বাঁচাও—গেলাম্—মরে গেলাম্।"

ক্রমে তাঁহার পাদদ্বয় অবসন্ন হইয়া আসিল; তিনি মাতালের

মত টলিতে টলিতে পড়িয়া গেলেন। দুই বার পড়িলেন, দুইবারই উঠিলেন, তাহার পর আর উঠিতে পারিলেন না—সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিষের হল্কা ছুটিতেছিল, তাহারই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় কক্ষতলে পড়িয়া তিনি ছটফট্ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

সেই সময় তিনি সপ্নবৎ দেখিলেন, যেন একজন দীর্ঘাকৃতি অপরিচিত যুবক একটা অত্যন্ত শব্দ করিয়া, সেই গৃহমধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইল।

সেই সময় তিনি একেবারে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্ষীণতম দৃষ্টির ও সেই অপরিস্ফুট দৃশ্যের মাঝখানে, সমস্ত ঢাকিয়া মসীময় যবনিকা-পাত হইল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রতিহিংসা—মূর্ত্তিমতী

Sacha. He catches her—
  Melissa. And now he lets her go—
Again she's in his grasp—
  Psyche. And now she is not!
He seizes her back hair—
  Blanche. And it comes off!

Gilbert—"*The Princess*" *Scene III.*

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতারিত।

যখন দেবেন্দ্রবিজয়ের জ্ঞান হইল, দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে মুক্ত পৃথিবীর চারিদিক প্রভাতরবির হিরণ্য-প্রবাহে পুলকিত এবং প্রদ্যোতিত। তিনি নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে, নৌকার উপর। দাঁড়ীরা অদূরে বসিয়া স্বশব্দে, দ্রুতহস্তে দাঁড় নিক্ষেপ করিয়া নৌকাখানাকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে একদিক হইতে অপরদিকে লইয়া যাইতেছিল। নদীর দুই পার্শ্ব নীরব, কেবল দূর পল্লিমধ্য হইতে ক্রীড়াপরায়ণ বালকদিগের হাস্যকল্লোল এবং কোন নিদ্রোত্থিত দুগ্ধপোষ্যের রোদনধ্বনি এক একবার অস্ফুট শোনা যাইতেছিল। অনতিদূরস্থ একটি দেবদারুর শীর্ষদেশ হইতে করুণকণ্ঠ বউকথাকও পাখি; আলোকস্বরা ধরণীর নগ্ন বক্ষ শব্দতরঙ্গে প্লাবিত করিয়া অভিমানমৌন প্রিয়াকে

অবিশ্রাম সপ্রেম-সম্ভাষণ করিতেছিল। তাহার সেই বেদনা-গীতি সেই শোভন, স্তব্ধ, সুন্দর, কিরণোজ্জ্বল প্রভাতের অখণ্ড প্রশান্তির মধ্যে, নিরতিশয় মধুর শুনাইতেছিল এবং তটস্থ, সঙ্গীহীন, দীর্ঘ গাছগুলার ছায়া দীর্ঘতর হইয়া নদীবক্ষে, অনেকদূর অবধি প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় মুগ্ধনেত্রে ও অতি বিস্ময়ের সহিত সেই সকল দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। কতক্ষণ পরে, কিরূপে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল, তাহা কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন কি তখন তিনি সসংজ্ঞ হইয়াছেন, সে বিষয়েও তাঁহার মনে একটা দারুণ সন্দেহ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, ইহাও একটা স্বপ্নের খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তিনি কিছুতেই তাঁহার সেই ভয়ানক বিপদের কথা আগাগোড়া মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অতি কষ্টে তিনি সেই সকল একটু একটু স্মরণ করিতেছিলেন, তথাপি তখন সেই দস্যু-রমণী ও আশ্চর্য্য রোগীর মুখ ভাল রকম তাঁহার মনে আসিতেছিল না; তাঁহার অবসন্ন দেহ যে দীর্ঘাকৃতি অপরিচিত ব্যক্তি গৃহতল হইতে আপনার বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার মুখ যদিও এক একবার মনে পড়িতেছিল; কিন্তু কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না; একটা প্রহেলিকাময় অপূর্ব্ব দৃশ্য যে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি-সম্মুখে অভিনীত হইতেছে, ইহাই তাঁহার একান্ত বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। এখনও যেন, সেই ধূম, সেই উগ্রগন্ধ তাঁহার শ্বাস রোধ করিতেছিল। তিনি অতি কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। মাথা ও বুক অত্যন্ত ভারি বোধ হওয়ায় তিনি চেষ্টা করিয়াও সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছিলেন না; একটা দুর্ব্বিসহ উন্মাদক নেশা

তাঁহার মস্তিষ্ক পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। তিনি সেই নেশার ঝোঁকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "একি ভয়ানক জটিল রহস্য! স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াই কি তাহারা দিনাতিপাত করে? সেই স্ত্রীলোকটি—কত সুন্দর দেখিতে সে। কে তাহাকে দেখিয়া বুঝিবে, তাহার হৃদয় এইরূপ কালকূটে ভরা; নিশ্চয় তাহারা দুইজনে মিলিয়া, আমাকে খুন করিয়া, আমার নিকটে যা কিছু আছে, সমস্তই কাড়িয়া লইবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! কে আমার সেই ভয়ানক মৃত্যু হইতে, আরও ভয়ানক সেই খুনেদের হাত হইতে উদ্ধার করিল? এখন আমি কোথায়? কোথায় যাইতেছি? এ নৌকার উপরই বা আমাকে কে লইয়া আসিল?"

নৌকা দ্রুততরগতিতে চলিতেছিল বলিয়া, নদীবক্ষের শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ প্রতিকূল বায়ু, দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্ব্বাঙ্গে প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্টরূপে তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের বলাধান করিতেছিল। দেবেন্দ্রবিজয় একজন দাঁড়ীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? এ নৌকার উপরেই বা কে আপনাকে লইয়া আসিল?"

নৌজীবিকের দল তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না—ঝপ্ ঝপ্ শব্দে দাঁড় বাহিয়া, সেইরূপ দ্রুততরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে পুনরাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছ?"

নৌবাহদের মধ্যে একজন বলিল, "আমরা আপনাকে ঠিক নিয়ে যাব, সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি একটু চুপ করে বসুন।"

যুবক বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন, কোথায়? যমপুরীতে নাকি?

সেই ভয়ানক মৃত্যুর পর একি যমপুরী-যাত্রা নাকি? প্রকাশ্যে বলিলেন "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ, না বলিলে, আমি কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে যাইব না। আমাকে এখানে নামাইয়া দাও।"

এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া মাঝি সেইখানে উপস্থিত হইল। এবং দেবেন্দ্রবিজয়কে মিষ্টবাক্যে বলিল, "আপনার বাড়ীতেই আপনাকে নিয়ে যাব, আমরা আপনার ঠিকানা জানি, আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না—একটু স্থির হয়ে বসুন। আপনার এখনও নেশা আছে।"

মাঝি যদিও কথাগুলি যতদূর সম্ভব মিষ্ট করিয়া বলিল। কিন্তু, দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা দেবেন্দ্রবিজয়ের নিতান্ত নীরস ও অস্থিদাহকারীবৎ বোধ হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে বলিলেন, "তোমার মাথা মূর্খ, আমি কোথায় থাকি, তুমি কি তা জান যে, আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে?" এই বলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন; চেষ্টা করিলেন মাত্র, উঠিতে পারিলেন না, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, মাঝি যে তখনও তাঁহার নেশা আছে বলিয়া ক্রোধোদ্রেক করিয়াছিল, সেটা নিতান্ত মিথ্যাপবাদ নহে; আদ্যোপান্ত সত্য। তখনও তাঁহার মাথাটা বেশ ঘুরিতেছিল এবং পা দুখানি তাঁহার দেহভার বহনে একান্ত অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত টলিতেছিল। মাঝির মূর্খতা হইতে তাঁহার মূর্খতা যে বহুপরিমাণে অধিক, বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বতোভাবে দুঃখিত হইলেন।

মাঝি, দেবেন্দ্রবিজয়ের সেইরূপ ভাব দেখিয়া, সে জন্য কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, "আপনার বাড়ী ওপার হুগলীর কামদেবপুর; আপনার নামই ত অরিন্দম বাবু?

দেবেন্দ্রবিজয় উত্তেজিতস্বরে উত্তর করিলেন, "আমার নাম অরিন্দমবাবু নয়—বাড়ীও কামদেবপুরে নয়;

মাঝি বলিল, "তবে কি সেই ভদ্রলোকটি আমাকে মিথ্যা বলিলেন?" মাঝি মনে ভাবিল; বাবুর এখনও বেশ নেশা আছে?

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "কে সে ভদ্রলোক? কে আমাকে নৌকায় তুলিয়া দিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি এখনই আমাকে সব কথা খুলিয়া বল।"

মাঝি বলিতে লাগিল, "বাবু, আপনি কাল রাত্রে বড় মাতাল হয়ে পড়ে ছিলেন, এত মদ খেয়েছিলেন যে, আপনার একটুও জ্ঞান ছিল না। একটা বটগাছের তলায় মড়ার মতন পড়েছিলেন। সে যাই হোক্; তাতে আর হয়েছে কি, আজ কাল অনেক ভদ্রলোকেরই এমন হয়ে থাকে, সেখানকার একটি ভদ্রলোক সেইরূপ অবস্থায় আপনাকে দেখ্‌তে পেয়ে, আমাকে ডাক্‌লেন। ডেকে বল্‌লেন, "মথুর, একটা কাজ কর্ দেখি, এই ভদ্রলোকটিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়, এখনি যদি পুলিসের কোন লোক দেখ্‌তে পায় তাহা হইলে এখনি ফাঁড়ীতে টেনে নিয়ে যাবে। এ লোকটি কোথায় থাকে আমি জানি, এই চিঠিখানা জামার পকেটে ছিল এই চিঠির উপরে ঠিকানা লেখা আছে।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "কে সে ভদ্রলোক, তুমি তাকে চেন?"

মাঝি উত্তর করিল, "না বাবু, আমি চিনি না।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "তবে সে কেমন করিয়া তোমার নাম ধরিয়া ডাকিল?"

মাঝি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা কি করে জান্‌বো বাবু; তার আগে সে ভদ্রলোকটিকে আর কখনও কোথায় দেখেছি, আমার ত বাবু, ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি আমাকে নিশ্চয়ই চিনেন, তা না হলে, কেমন করে আমার নাম জান্‌তে পার্‌লেন। যাই হোক, লোকটি নিতান্ত ভদ্রলোক, খুব দয়ার শরীরও বল্‌তে হবে, নইলে

আজকালকার বাজারে কে কাকে দেখে বলুন, দেখি ? আপনার বাপ ভাইকে কেউ দেখে না, তা পর। তিনি আপনার জন্য অনেক করেছেন। আপনাকে নিয়ে যাবার ভাড়াটি পর্য্যন্ত তিনি নিজের কাছ থেকে আমাদের আগে চুকিয়ে দিয়েছেন।"

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ভদ্রলোকটির বয়স কত, কি রকম দেখ্‌তে, লম্বা না বেঁটে, মোটা না রোগা, দাড়ী গোঁফ আছে, না নাই ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। মাঝি সেই সকল প্রশ্নের যেরূপ উত্তর করিল, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে গত রাত্রের সেই অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব রোগীকেই বুঝায়। দেবেন্দ্রবিজয় মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে চিঠির কথা বলিতেছিলে, সে চিঠি খানা কোথায় ? আমি সেখানা একবার দেখিতে চাই। আমায় সেখানা দাও।"

মাঝি বলিল, "সে চিঠি আপনার জামার পকেটে আছে, তিনি ঠিকানাটা আমাদের একবার পড়ে শুনিয়ে দিয়ে, তখনই আবার আপনার জামার পকেটে রেখে দিয়েছেন।

পকেটে হাত দিয়াই দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মাঝি, সর্ব্বনাশ হয়েছে; তারা চোর, তারা ডাকাত—তারা অতি ভয়ানক লোক! ঘোর বিশ্বাসঘাতক। তোমরাও সেই খুনেদের লোক দেখিতেছি; আমার হাতে কেহই নিস্তার পাবে না; এর ফল তোমরা নিশ্চয়ই পাবে।

মাঝি সে কথার কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অত্যধিক বিস্মিত এবং কতক বা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে বাবু, আমরা কিছুই জানি না।"

"সব জান তোমরা।" বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মাঝির মুখ হইতে কথাটা যেন লুফিয়া লইলেন। ক্রোধভরে বলিলেন, "আমার ঘড়ী,

চেন্, হীরার আংটি, পকেটে নগদ তিনশতের অধিক টাকা ছিল, সব চুরি করে নিয়েছে। তারা সহজ লোক নয়। এখানে কোন থানা থাকে, আমাকে সেইখানে নিয়ে চল। এখনই ইহার একটা প্রতিকার করা চাই।”

দেবেন্দ্রবিজয় এ পকেট সে পকেট করিয়া তিনখানি অদৃষ্টপূর্ব্ব পত্র বাহির করিলেন। তন্মধ্যে দুইখানি তাঁহারই নামে লিখিত এবং বিভিন্ন হস্তাক্ষরে লিখিত। আর একখানির উপরে কামদেবপুরের ঠিকানা দিয়া অরিন্দমের নাম লিখিত ছিল। দেবেন্দ্রবিজয় অটল মনোযোগের সহিত তিনখানি পত্রই পাঠ করিলেন। পাঠশেষে তিনি মাঝিকে বলিলেন, “হাঁ, আমার নাম অরিন্দম—আমার বাড়ী কামদেব পুর, যতশীঘ্র পার, সেইখানে নৌকা লইয়া চল।”

তাহাতে মাঝি কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না; কারণ, তখনও তাহার একান্ত বিশ্বাসের সহিত বেশ মনে হইতেছিল, নেশাটা এখনও বাবুর মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

নৌকা সেইরূপ সবেগে চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্রাবলী

নৌকা যথা সময়ে হুগলীর ঘোলঘাটে আসিয়া লাগিলে, দেবেন্দ্রবিজয় তন্মধ্য হইতে অবতরণ করিলেন। মাঝির মুখেই শুনিয়াছিলেন, নৌকার ভাড়া পূর্ব্বেই তাহারা পাইয়াছে, সে জন্য এক্ষণে তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইল না। নৌবাহদিগের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সেই পত্রত্রয়ের একখানির মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল; দেবেন্দ্রবিজয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

অরিন্দমের বাটীর অনুসন্ধান করিতে দেবেন্দ্রবিজয়কে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সেখানকার সকলেই অরিন্দমকে চিনিত। যখন দেবেন্দ্রবিজয় অরিন্দমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া একান্ত মনোসংযোগ পূর্ব্বক এক-খানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। সহজেই সাক্ষাৎ হইল। অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বসিতে বলিয়া, সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, নিজে ভাল হইয়া বসিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনার নাম কি অরিন্দম বাবু?"

অরিন্দম ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আপনার নামে একখানি পত্র আছে।" এই বলিয়া তিনি সেই তিনখানি পত্রের ভিতর হইতে অরিন্দমেব পত্রখানি বাছিয়া বাহির করিলেন।

অরিন্দম পত্রখানি পাঠ করিলেন, পত্রখানি এইরূপ ;—

"সুহৃদ্বরেষু—

বহুদিন হইতে তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি ; আপাততঃ আমার কুশল জানিয়া নিশ্চিন্ত হইও। তুমি অযাচিত হইয়া আমার যে কত উপকার করিয়াছ, তাহা আমি যতদিন তোমার মৃত্যু না হয়, ততদিন কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কিন্তু, যতদিন না বিস্মৃত হইতে পারিব, ততদিন আমি কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিব না ; সে জন্য যাহাতে তোমার মৃত্যুটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হয়, সে জন্য যত্নের ত্রুটি করিব না।

বুঝিয়াছি, তুমি কোন রকমে আমার সন্ধান করিতে পারিতেছ না ; সে জন্য এখনও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছ ; কিন্তু, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে

পারিতেছ না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পত্রবাহক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের নিকট আমার সন্ধান পাইবে। উক্ত ভদ্র-লোকটি আমার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিল।

ফুলসাহেব।”

পত্রখানি পড়িয়া অরিন্দম বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জন্য ফুল সাহেব কর্তৃক আবার এক অভিনব রহস্যের সুচারু আয়োজন হই-তেছে। তিনি দেবেন্দ্রবিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এ পত্র কোথায় পাইলেন?”

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, “এ পত্র আমি কোথায় পাইয়াছি, কখন পাইয়াছি, কে দিয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। আমার কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না—আপনাকে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া না বলিলে, আপনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবেন না; ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে।”

অরিন্দম বলিলেন, “কোন বাধা না থাকিলে, আপনি সে সকল কথা আমাকে বলিতে পারেন।”

দেবেন্দ্রবিজয় গত রাত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিন্দু-বিসর্গ গোপন না করিয়া অকপটে সমুদয় বলিয়া গেলেন। সে সকলের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুনিয়া অরিন্দম কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; তিনি জানিতেন, ফুলসাহেবে সকলই সম্ভব। দেবেন্দ্রবিজয় যে তাহার হাত হইতে প্রাণ সমেত ফিরিতে পারিয়াছেন, এত বড় দীর্ঘ-কাহিনীর মধ্যে ঐ টুকুই কিছু বিস্ময়জনক।

অরিন্দম বলিলেন, “আপনি যে আরও দুইখানি পত্রের কথা বলিলেন. সে দুইখানি বোধ হয় আপনি নষ্ট করেন নাই?”

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আমার কাছেই আছে, আপনি পড়িতে পারেন।"

এই বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় নিজের সেই পত্র দুইখানি অরিন্দমের হাতে দিলেন। অরিন্দম ব্যগ্রচিত্তে পড়িতে লাগিলেন;

"দেবেন্দ্রবিজয়!

তুমি আমাকে চেন না, আমি কিন্তু তোমাকে খুব চিনি। তোমার বাড়ী ভবানীপুর, এবং তুমি কি জন্য বেণীমাধবপুরে গিয়াছিলে তাহাও আমি জানি, এবং সেখানে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রেবতীর উদ্ধারের জন্য কোন একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলে, তাহাও আমি জানি। যদি বাপু, আমার পরামর্শ শুনিতে চাও, যদি গোয়েন্দার মত গোয়েন্দার হাতে কাজটি দিতে চাও, তাহা হইলে হুগলী জেলার অরিন্দম বসুকে যাহাতে ঠিক করিতে পার, আগে সে চেষ্টা দেখ। আমি জানি, তুমি রেবতীকে অত্যন্ত ভাল বাস, এবং তোমারই সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল। তোমার মামা মহাশয় সে জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল বলিয়া তোমাকে একটু কষ্ট দিলাম। বেণীমাধব পুরের যে কেশব বাবুর নাম শুনিয়াছ, আমি সেই কেশব বাবু।"

অপর পত্রখানি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা; এইরূপ;—

"দেবেন্দ্র বিজয়!

তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল বলিয়া মনে করিয়ো না, তুমি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইলে; মনে করিয়ো না, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ছিপে মাছ ধরা পড়িলে যেমন সেটাকে খেলাইয়া, শেষে উপরে তুলিতে বেশি আনন্দ হয়, তোমায় মৃত্যুতে আমার সেই

রকমের একটু আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই তোমাকে আপাততঃ ছাড়িয়া দিলাম। তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই, তুমি কাহার ক্রোধে পড়িয়াছ ; যে দিন তোমার বুকের রক্তে জুমেলিয়া তাহার করতল ধৌত করিবে, সেই দিন হইতেই সেই অপমান, সেই লাঞ্ছনা এবং সেই ঘৃণার ঠিক প্রতিশোধ হইবে এবং সেই দিন বুঝিতে পারিবে উপেক্ষিতা রমণী সর্পিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী।

সর্পিণী জুমেলিয়া।

অরিন্দম পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেশব আর ফুলসাহেব সংক্রান্ত লীলা-খেলা একজনেরই। ইহাতে নূতনত্ব কিম্বা আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। পত্রপাঠ শেষে অরিন্দম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র বাবু, আপনার পূর্ব্ব জন্মের খুব একটা সুকৃতি ছিল, তাই আপনি এমন খুনেদের হাত থেকে নিজের দেহটাকে সচেতন অবস্থায় বাহির করিয়া আনিতে পারিয়াছেন।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আপনি কি ওদের চিনেন ?"

অরিন্দম বলিলেন, "ঐ রকম দুই একজন মহাত্মকে না চিনিলে আমাদের পেশা চলে কই ? আপনি রেবতীর কাকা গোলাপবাবুর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংবাদ রাখেন কি ?"

দেবেন্দ্র। তিনি মহৎলোক ; সেখানকার সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে।

অরিন্দম। আপনি যদি আমার সহিত দুই চারি দিন থাকিয়া, আমার কিছু সহায়তা করেন, আমি রেবতীর উদ্ধারের উপায় করিয়া দিতে পারি। সম্মত আছেন ?

দেবে। আমার আপত্তি কিছু নাই, তবে আমার দ্বারা আপনার এমন কি বিশেষ সাহায্য হবে, বলিতে পারি না।

অরি। (সপরিহাসে) যে বাড়ীতে কাল আপনি শুভ নিশি যাপন করেছিলেন, সেখানে আমাকে একবার নিয়ে যেতে হবে। পথ মনে আছে কি ?

দেব। না; বনের ভিতর দিয়া রাত্রে গিয়াছিলাম; এখন সে পথ ঠিক করা কঠিন। তবে চেষ্টা করিলে, সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

অরি। বেশ, চলুন, আজ আহারাদির পর যাত্রা করা যাক্। যে রূপে হোক, আজ সেখানে পৌঁছাইতেই হবে।

তখন তাঁহাদের মধ্যে ফুলসাহেব ও রেবতীর সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। সে সকলের উল্লেখ এখানে বাহুল্য বোধ করিলাম। অরিন্দমের মুখে ফুলসাহেবের অশ্রুতপূর্ব্ব ও অলৌকিক গুণগ্রাম শ্রবণে দেবেন্দ্রবিজয় অসম্ভবরূপে বিস্মিত ও চকিত হইলেন এবং ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার মানবমূর্ত্তি তাঁহার ধারণা-পটে ভীষণ আসুরিক সৌন্দর্য্যে অবিকল চিত্রিত হইয়া গেল। অরিন্দম রেবতীর সম্বন্ধে কোন কথাই তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকট প্রকাশ করিলেন না। বরং তিনি দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকট হইতে রেবতীর অপহরণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া লইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অত্যাশ্চর্য্য অন্তর্দ্ধান।

সে দিন দেবেন্দ্রবিজয় অনুরুদ্ধ হইয়া অরিন্দমের বাসায় আহারাদি শেষ করিলেন। আহারাদির পর অনতিবিশ্রামে উভয়ে ফুলসাহেব-সন্দর্শনে বাহির হইলেন। তাঁহারা যত শীঘ্র ফুলসাহেবের সহিত দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কাজে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। দেবেন্দ্রবিজয় অনেক বার পথ ভুল করিয়া ফেলিলেন। যখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহারা ফুলসাহেবের বাগানবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। একজন কৃষক সেখান দিয়া যাইতেছিল, অরিন্দম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাগান কার?"

কৃষক বলিল, "জানকী বোসেদের।"

অরিন্দম একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "কোন্ জানকী বসু? তিনি কোথায় থাকেন?"

কৃষক বলিল, "তিনি মারা গেছেন, তেনার বাড়ী বেণীমাধবপুর, আমাদের জমীদার।" কৃষক চলিয়া গেল।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, "রেবতীর পিতার নাম জানকী-নাথ বসু না? দেবেন্দ্র বাবু, রেবতীর অপহরণ সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে বোধ করি। আপনিও এখন কিছু কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। রেবতীর কাকা গোপাল বসুকে আপনি যতদূর সদাশয় মনে করেন, সন্দেহ হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি ঠিক তেমনটি নন্। একদিন অরিন্দমের হাতে পড়্‌লে তিনি রাং কি সোণা সহজেই জানা যাবে।"

তখনই দুইজনে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অযত্নে বাগান বনের মত ভীষণ হইয়াছে, এবং বন্য আগাছায় লতাপাতায় কণ্টকাকীর্ণতায় মনুষ্যের দুরতিক্রম্য। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই, গাছের আড়াল দিয়া সেই বাগান বাড়ীর ছাদের কিয়দংশ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উভয়ে দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, বাড়ীটার পশ্চিমপার্শ্বের দ্বিতলস্থ একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে; সেখানে দাঁড়াইয়া রূপলাবণ্যময়ী, মুক্তকেশী, কোন নারীমূর্ত্তি। দূর হইতে দেখিয়াই অরিন্দম তাহাকে চিনিতে পারিলেন। এ সেই মতিবিবি—স্বামীহন্ত্রী, মানবী মূর্ত্তিতে দানবী, বিধাতার একটি অনাগত সৃষ্টি। দেবেন্দ্রবিজয়ও তাহাকে চিনিতে পারিলেন; চিনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি অরিন্দমকে বলিলেন, "মহাশয়, এই সেই ডাকিনী, আমি ইহারই কথায় ভুলিয়াছিলাম।"

অরিন্দম মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি উহাকে খুব জানি; তবে, এখন এক কাজ করুন, এখন আমরা এদিক দিয়া না গিয়া ঐ উত্তর দিকের পথ ধরিয়া যাই; তাহা হইলে জুমেলিয়া আমাদের দেখিতে পাইবে না; অথচ আমরা ঐ দিক দিয়া অলক্ষ্যে বাড়ীর ভিতর যাইতে পারিব।"

অরিন্দমের কথামত কাজ হইল। যাহাতে জুমেলিয়া তাঁহাদের দেখিতে না পায়, এরূপ ভাবে তাঁহারা অন্যদিক দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং সরাসর উপরে উঠিয়া—যে ঘরে জুমেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—সেই ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। অরিন্দম যেমন জুমেলিয়াকে ধরিতে যাইবেন, জুমেলিয়া ছুটিয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে এবং সে ঘর হইতে বাহির হইয়া বাহিরের বারন্দায় পড়িয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পলাইতে লাগিল। অরিন্দমও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগি-

লেন। অবশেষে জুমেলিয়া একটি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ভিতর হইতে দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তেই অরিন্দম এমনি জোরে সেই কবাটের উপর পদাঘাত করিলেন যে, সেই একটি আঘাতই কবাটজোড়ার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, এবং বিকটশব্দ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। একলম্ফে অরিন্দম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! সেখানে কেহই নাই—না জুমেলিয়া, না তাহার কোন চিহ্ন। সে ঘর হইতে বাহির হইবার আর কোনও দরজা ছিল না, দুই একটা যে জানালা ছিল, তাহাও লৌহের গরাদা দেওয়া; এবং গরদাগুলি যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত, নাড়িয়া ভাল রকম করিয়া পরীক্ষা করিতে হতভম্ব, বিস্মিত অরিন্দমের আর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। তন্ন তন্ন করিয়া তিনি ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন; জুমেলিয়ার সন্ধান হইল না। ঘরের ভিতর এমন কিছুই ছিল না, একপার্শ্বে একটি আল্‌মারী ও একটি ছোট খাটে ছোট বিছানা। আল্‌মারীটা খোলা ছিল, সেটাকে তিনি আরও ভাল করিয়া খুলিয়া দেখিলেন, সেখানেও জুমেলিয়ার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অভাব; সুতরাং অরিন্দম সেইখানে দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন; এবং জুমেলিয়ার মানবীত্বের উপর তাঁহার ঘন ঘন সন্দেহ হইতে লাগিল।

এদিকে যেমন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ অদ্ভুত নাটকের একটা অলৌকিক দৃশ্য অভিনীত হইয়া গেল, ঠিক এই সময়ে অপর স্থানে এই রকমের আর একটা অভিনয় চলিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাতাল-প্রবেশ।

অরিন্দম যখন জুমেলিয়াকে ধরিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন দেবেন্দ্রবিজয় একটা স্ত্রীলোককে ধরিতে তাঁহাদের মতন দুইজন বীর পুরুষের অগ্রসর হওয়া অতিশয় লজ্জাজনক ও অনাবশ্যক মনে করিয়া, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হতভাগ্য দেবেন্দ্রবিজয় সেই 'একটা স্ত্রীলোকের' নিকট তেমন উচ্চশিক্ষা পাইয়াও শিখিতে পারিলেন না, যে, সে ঠিক 'একটা স্ত্রীলোকের' মতন নহে; সে মানবী মূর্ত্তিতে রাক্ষসী—রাক্ষসী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী। দেবেন্দ্রবিজয় মনে করিলেন, অরিন্দম জুমেলিয়াকে নিশ্চয় ধরিবেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি যদি সেই ফুলসাহেবকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে একটা কাজের মতন কাজ হয় এবং অরিন্দম যেমন তাঁহার কিঞ্চিৎ সহায়তা ও কিঞ্চিৎ উপকার হইবে বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহা হইলে সেই সাহায্যপ্রার্থী অরিন্দমেরও এ সময়ে যথেষ্ট উপকার এবং সাহায্য করা হইবে; এই মনে করিয়া তিনি ফুলসাহেবের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময় নিম্নতলে কাহার পদ শব্দ হইল, তখনই অনুসন্ধিৎসু দেবেন্দ্রবিজয় অনুসন্ধেয় ফুলসাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিলেন। সেখানে দেখিলেন, তাঁহার সেই গত রাত্রের অদ্ভুত রোগী মহাশয় তাঁহার দিকে না চাহিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রবিজয় তখনই ছুটিয়া গিয়া সেই ঘরের দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইলেন।

ফুলসাহেব দেবেন্দ্রবিজয়কে সহসা সম্মুখীন দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্তে বলিল, "কিগো দেবেন্দ্র বাবু যে, কি মনে করে আবার ?"

দেবেন্দ্রবিজয় বজ্ররবে বলিলেন, "কি মনে করে, এখনই জানিতে পারিবে ; নারকি, আমার হাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবে।"

ফুলসাহেব পূর্ব্ববৎ মৃদুহাস্তের সহিত বলিল, "বটে, তুমি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আসিয়াছ ? বেশ, বেশ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আচ্ছা, শিক্ষাটা তুমি একাকী দিতে আসিয়াছ, না তোমার সঙ্গে আর কেউ আসিয়াছে ? অরিন্দম আসে নাই ?

দেবেন্দ্রবিজয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন। সেই পিস্তল তিনি অরিন্দমের নিকট পাইয়াছিলেন। সেই পিস্তলে ফুলসাহেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যদি পালাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে, এই পিস্তলের গুলিতে তোমার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব "

ফুলসাহেব কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পূর্ব্ববৎ স্মিতমুখে বলিল, "না পালাইব কেন ? তোমার ভয়ে ? না, তোমার ঐ পিস্তলের ভয়ে ? আমাকে গ্রেপ্তার করিবে মনে করিয়াছ ?"

দেবেন্দ্র। হাঁ।

ফুল। কখন ?

দেবে। এখনই।

ফুলসাহেব হাসিতে লাগিল, সেইরূপ বিদ্রূপের মৃদুহাসি। বলিল, "তুমি কি মনে করিয়াছ, তুমি আমার হাতে হাত কড়া পরাইতে থাকিবে, আর আমি এমনি ভাল মানুষটির মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকিব ?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "তাহাই তোমাকে করিতে হইবে।"

ফুল। আর তা যদি না করি?

দেবে। তোমাকে হত্যা করিব।

ফুল। না, এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আমি এখান হইতে নড়িব না, তোমার মনের অভিলাষটা পূর্ণ কর। কিন্তু দেবেন্দ্র, আমি ত নড়িব না, কিন্তু তুমি যে আমাকে এখান থেকে এক চুল নাড়াতে পার্‌বে, এমন বোধ হয় না।

দেবেন্দ্রবিজয় "সে বন্দোবস্ত আমি করিতেছি।" বলিয়া যেমন ফুলসাহেবকে ধরিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন, সহসা একটা বিকট শব্দ হইল, এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্ব্বাঙ্গ সেখান হইতে এক নিমেষে ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফুলসাহেব হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেশরী ও শার্দ্দূল।

দেবেন্দ্রবিজয়ের অকস্মাৎ পাতাল-প্রবেশের এবং নিজের বিজয়-বার্ত্তা জুমেলিয়ার শ্রুতিগোচর করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ফুলসাহেব দ্বিতলে উঠিয়া, যে কক্ষে জুমেলিয়া অরিন্দমকে একদম্ বোকা বানাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই কক্ষের দিকে চলিল। সেইটি জুমেলিয়ার শয়ন কক্ষ। যখন অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেন, তখন ফুল সাহেব বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না, অতএব তাহার পরম শত্রু অরিন্দমের আগমন এবং জুমেলিয়ার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে ফুলসাহেব কিছুই জানিতে

পারে নাই। ফুলসাহেব জুমেলিয়ার শয়ন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, সেখানে জুমেলিয়া নাই, কবাট জোড়া ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; ফুলসাহেব বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া ঘরের ভিতর যাইল। ঘরের ভিতরে সম্মুখ দিককার কোণে অরিন্দম দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুতরাং ফুলসাহেব বাহির হইতে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু ভিতরে গিয়া, সহসা অরিন্দমকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ভাব দমন করিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিল, "একি, অরিন্দম বাবু যে, হঠাৎ কি মনে করে?"

অরিন্দম সহাস্যে বলিলেন, "অনেক দিন হইতে মহাশয়ের কোন সংবাদাদি পাই নাই, একবার দেখা করিতে আসিলাম।"

ফুলসাহেব একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব নামক পদার্থটি যেরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পরের যথেষ্ট কষ্ট হইবারই কথা। আমিও তোমার অদর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম। দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকটে আমার স্নেহ-পত্র পাও নাই?"

অরিন্দম বলিলেন, "হাঁ, পাইয়াছি বৈকি।"

ফুলসাহেব। সেই পত্র পাইয়াই তুমি আসিয়াছ। খুব শীঘ্রই আসিয়াছ; এত শীঘ্র তুমি যে আসিবে, আমি এরূপ আশা করি নাই। তুমি যে কাজে নিযুক্ত, তাতে সকল বিষয়ে এরূপ তৎপর হওয়া তোমার খুবই আবশ্যক। যাই হোক, তুমি দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে আনিয়া ভাল কর নাই, তাহা হইলে আজ বেচারাকে এমন অকালে প্রাণ হারাইতে হইত না। লোকটা এবার অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তা, তাহাকে একেবারেই ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি।

ফুলসাহেবের কথা শুনিয়া অরিন্দমের ভয় হইল। বলিলেন, "তুমি কি তাহাকে খুন করিয়াছ?"

ফুল। আমি তাহাকে খুন করিতে যাইব কেন? সে নিজেকে নিজেই খুন করিয়াছে—লোকটা এমনই বুদ্ধিমান। আমি তাহাকে স্পর্শও করি নাই। সে যা হোক, অরিন্দম বাবু, তোমার নিকটে কোন অস্ত্র শস্ত্র আছে কি?

অরিন্দম। আছে, কেন?

ফুল। তা ত থাকিবারই কথা। আমি যদি এখন এখান থেকে চলে যাই, তা হইলে বোধ হয়, তন্মধ্য হইতে কোন না কোন একটির আস্বাদ আমাকে অনুভব করাইবে, মনে করিয়াছ? এমন কি আমাকে হত্যাও করিতে পার।

অরি। সে ইচ্ছা আমার নাই।

ফু। (উপহাস করিয়া) সহসা এত দয়ালু কবে হইল, অরিন্দম?

অ। আপাততঃ তোমার নিকটে কোন অস্ত্র আছে?

ফু। দুর্ভাগ্য আমার—আমি এখন নিরস্ত্র। নতুবা, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাকে কষ্ট পাইতে হইত না।

অ। (সহাস্যে) কেন?

ফু। তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে তুমি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলে, সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে এ সংসার হইতে বিদায় করিতাম।

অ। তা, আমি জানি।

ফু। আরও জান বোধ হয়, তোমার প্রাণ নিতে আমি প্রাণপণ করিয়াছি—হয় আমি মরিব, নয় তুমি মরিবে। আর তুমি কখন মনেও স্থান দিয়ো না, যে, জীবিত ফুলসাহেবকে তুমি ধরিতে পারিবে।

অ। এখন যদি আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করি, তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ ?

ফু। অরিন্দম বাবু, সকল সময়েই আমি নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারি।

অ। আমি এখনই তোমায় গ্রেপ্তার করিব।

ফু। মুখের কথা নয়, মনে করিলেই ফুলসাহেবকে ধরিতে পারা যায় না। অনেকেই সে চেষ্টা করেছে।

অ। সে অনেকের মধ্যে আমি সে চেষ্টা সফল করিতে পারিব। তুমি আমার কএকটা পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছ।

ফু। আমি তোমাকে খুব জানি, তোমার বুদ্ধি, কৌশল, খ্যাতি নৈপুণ্য, শক্তি, সাহস, ক্ষমতা কিছুই আমার অপরিচিত নহে। আমি তোমাকে যতদূর জানি, তাতে তুমি যে আমার একজন যোগ্য প্রতিযোগী, সে সম্বন্ধে আর আমার কোন সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া ফুলসাহেব কোথায় কিছুই নাই একেবারে লাফাইয়া আচম্বিতে অরিন্দমের ঘাড়ে পড়িলেন। ফুলসাহেব সহসা যে তাঁহাকে এমনভাবে আক্রমণ করিবে, এ কথা আগে অরিন্দম মনে করেন নাই। তিনি এক হাতে ফুলসাহেবের গলাটা টিপিয়া ধরিয়া, অপর হাতে তাহার ললাটে সজোরে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

তাহার পর পরস্পরে প্রতি পরস্পরের মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণটা প্রচুর পরিমাণেই হইতে লাগিল। এবং দুম্ দাম্ ঠক্ ঠকাস্ শব্দে ঘরটা ক্ষণে ক্ষণে প্রতিধ্বনিত এবং উত্থান পতনের ও পাদক্ষেপের দুপ্ দাপ্ ধপ্ ধপাস্ শব্দে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। এত চেষ্টা করিয়াও দুঃখের বিষয় কেহ কাহাকে সহজে বশে আনিতে পারিলেন না।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে কাটিল। তথাপি মল্লযুদ্ধটা সমভাবেই চলিতে লাগিল।

এমন সময় সহসা ফুলসাহেব বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা তীক্ষ্ণমুখ লৌহ-শলাকা বাহির করিল। সেটা দেখিতে অনেকটা দীর্ঘ সূচীর মতন, কেবল অগ্রভাগ একটু বাঁকা। দেখিয়াই অরিন্দমের বুঝিতে বাকি রহিল না, সেই লৌহ-শলাকা বিষাক্ত, এবং তাহার এমন একটা শক্তি আছে যে, একটু আঘাতেই দেহ হইতে প্রাণটাকে অতি সহজে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে।

ফুলসাহেব যেমন সেই বিষাক্ত শলাকা অরিন্দমের দেহে বিদ্ধ করিতে যাইবে, তখন অরিন্দম দুইহাতে ফুলসাহেবের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ফুলসাহেব অপর হস্তে অরিন্দমের মুখের উপর, নাকের উপর যেখানে সেখানে অবিশ্রাম ঘুসি চালাইতে লাগিল। সেই সকল ঘুসির মধ্যে একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘুসি নিজের সেই লৌহশলাকার উপর পড়িয়া ফুলসাহেবের এত উদ্যম, এত আগ্রহ সমুদয় নিষ্ফল করিয়া দিল—সেই বিষ-শলাকা ফুলসাহেবেরই মনিবন্ধে বিদ্ধ হইল।

যেমন বিদ্ধ হওয়া, অরিন্দমকে আর কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। ফুলসাহেব তখনই গৃহতলে পড়িয়া গেল এবং সেই মুহূর্ত্তেই ফুলসাহেবের সবল ও সচল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় ও অচল হইয়া আসিল।

বিস্মিত হইয়া, স্তম্ভিত হইয়া, শিহরিত হইয়া অরিন্দম সরিয়া দাঁড়াইলেন। এবং তাঁহার নিজের হৃষ্টপুষ্ট দেহের সমস্ত শক্তির অপেক্ষা, সুদীর্ঘ শাণিত ছুরির অপেক্ষা, অগ্নিগর্ভ, সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য রিভল্‌ভারের অপেক্ষা সেই একখণ্ড অতি ক্ষুদ্র নগণ্য লৌহশলকার কত বেশি শক্তি, মনে মনে সেই সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ফুলসাহেবের গায়ে হাত

দিয়া দেখিলেন, তাহার সেই নিস্পন্দ দেহ তখন অত্যন্ত শীতল এবং অত্যন্ত কঠিন। এবং তন্মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি একেবারে বন্ধ হইয়াগিয়াছে; তথাপি অরিন্দম ফুলসাহেবকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। হাতকড়া ও বেড়ি বাহির করিয়া ফুলসাহেবের হাতে পায়ে সুদৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিলেন, এবং খাটখানা টানিয়া আনিয়া তাহার একদিককার পায়া ফুলসাহেবের পিঠের উপর চাপাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে অরিন্দম।

ফুলসাহেবকে সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া অরিন্দম বাহিরে আসিলেন। এবং দেবেন্দ্রবিজয়ের অনুসন্ধান করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাড়ীর চারিদিকে ফিরিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্বন্ধে ফুলসাহেবের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। কারণ ভীষণপ্রকৃতি খুনী ফুলসাহেবের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।

উপরের সকল স্থান যখন তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের অথবা তাঁহার মৃতদেহের কোন সন্ধানই হইল না, তখন অরিন্দম নীচে নামিয়া আসিয়া নীচের ঘরগুলি সন্ধান করিতে লাগিলেন। যে ঘরে দেবেন্দ্রবিজয়ের পাতাল-প্রবেশ হইয়াছিল; অরিন্দম অবশেষে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ অতি মৃদুভাবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। কিন্তু, কোথা হইতে সেই শব্দটা আসিতেছে, তিনি

অনেকক্ষণ স্থিরকর্ণে থাকিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। এক একবার জলের ছপাং ছপাং শব্দও শুনা যাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, অতি দূর হইতে সেই সকল শব্দ হইতেছে। কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিলে আর কিছুই শুনা যায় না। ভীতিবিহ্বল অরিন্দম ঘরের ভিতরে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। একস্থানে দেখিলেন, গৃহতলে একটি লৌহনির্ম্মিত গুপ্তদ্বার রহিয়াছে, সেটি মাপে দুই হাতের অধিক নহে, সমচতুষ্কোণ। সেই গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য অরিন্দম শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া, কিছুতেই সেটা টানিয়া তুলিতে পারিলেন না। কিন্তু পরক্ষণে উপর হইতে একটু চাপ দিতেই নীচের দিকে একটু ফাঁক হইয়া গেল। আর কিছু বেশি জোর দিতে একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল। সেই সঙ্গে কি একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ অরিন্দমের নাসিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সেই অন্নপ্রাসনের অন্ন অবধি উঠাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। অরিন্দম অতিকষ্টে সেই দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া অবনত মস্তকে, তীব্রদৃষ্টিতে নীচের দিকে চাহিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই গোঙানি শব্দটা এখন বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অরিন্দম পকেট হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিলেন, এবং সেই আলোকশিখা অন্ধকূপমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখিলেন, নীচে—অনেক নীচে অস্পষ্ট এক মনুষ্য-মূর্ত্তি, পঙ্কিল জলে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে উপরে উঠিয়া আসিবার কোন উপায় নাই। অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "দেবেন্দ্রবাবু—দেবেন্দ্র বাবু—"

ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর হইল, "আপনি আসিয়াছেন। আমি মরিতে বসিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন—ওঃ প্রাণ যায়—উঃ! কি ভয়ানক—"

অরিন্দম বলিলেন, "ভয় নাই দেবেন্দ্র বাবু, আমার পরম সৌভাগ্য আপনি এখনও জীবিত আছেন—আমি নিজের প্রাণ দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিব।"

এই বলিয়া অরিন্দম গুপ্তদ্বার ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ করি ভিতরে স্প্রীং ছিল, তখনই ঝণাৎ করিয়া গুপ্তগৃহের কবাট আপনিই রুদ্ধ হইয়া গেল।

অরিন্দম ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। উঠানের একপার্শ্বে একখানা লম্বা মই ছিল, সেই মইখানা দুই হাতে তুলিয়া আনিলেন, এবং সেই অন্ধকূপের মধ্যে সেটা নামাইয়া দিলেন। সেটা যে তখন তাঁহার এত বড় একটা উপকারে আসিবে, অরিন্দম প্রথমে তাহা ভাবেন নাই।

অরিন্দম প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন লইয়া সেই মই অবলম্বনে নীচে নামিয়া গেলেন। মধ্যে মই থাকায় গুপ্তদ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হইয়া অর্দ্ধোন্মুক্ত রহিল।

ভিতরে নামিয়া অরিন্দম দেখিলেন, দেবেন্দ্রবিজয় ক্রমশঃই সেই কূপের গভীর পঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছেন। তাঁহার মস্তকের এক স্থানে কাটিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছে; সে আঘাত তেমন সাঙ্ঘাতিক না হইলেও অবস্থাটা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক। সেই ভয়ানক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অরিন্দম দুই হাতে দেবেন্দ্রবিজয়কে ধরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিলেন। সেই আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্য হইতে একটা লোককে টানিয়া তোলা কি সহজ কথা?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে জুমেলিয়া।

ভিতরে যেমন দেবেন্দ্রবিজয়কে লইয়া এইরূপ যমে-মানুষে টানাটানি চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একটী স্ত্রীলোক সেই গৃহমধ্যে নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, অন্ধকূপের গুপ্তদ্বার-সম্মুখে একবার ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, এবং নীরব হাস্যের সহিত ক্ষণেক সেই অপূর্ব্ব লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল—সে জুমেলিয়া।

জুমেলিয়া বাহিরে আসিয়া অতিমৃদুস্বরে একবার আপন-মনে বলিল, "আচ্ছা।" সেই 'আচ্ছা'টা স্পষ্ট ধ্বনিত না হইতে অনেকটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের মত শুনাইল।

অরিন্দম অনেক কষ্টে দেবেন্দ্রবিজয়কে টানিয়া তুলিলেন। তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের সংজ্ঞা নাই, অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়ের মৃতকল্প দেহ এক হস্তে বুকে চাপিয়া ধরিয়া যেমন উপরের দিকে এক পা উঠিতে যাইবেন, শাণিত ছুরিকার ন্যায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে কে বলিল, "আমার হাতে দুইজনকেই আজ মরিতে হইবে। অরিন্দম, চাহিয়া দেখ, আমায় চিনিতে পার কি?"

অরিন্দম চকিত হৃদয়ে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে তুমি?"

"বাঃ, তুমি আমায় চেন না?"

"না। কে তুমি?"

"আমি জুমেলিয়া।' সেই তোমার পরিচিত মতিবিবি।"

সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলেও লোকে এত চমকিত হয় না, অথবা সেই কক্ষমধ্যে সহসা বজ্রপাত হইলেও অরিন্দম বোধ করি এতদূর চমকিত হইতেন না, জুমেলিয়াকে দেখিয়া তিনি যেরূপ চমকিত হইলেন। দেখিলেন, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী শত বিভীষিকার ন্যায় জুমেলিয়া অবনত মস্তকে উপরে দাঁড়াইয়া; এবং তাহার প্রচুরায়ত কৃষ্ণনয়নে প্রদীপ্ত নরকাগ্নি জ্বলিতেছে—কি ভীষণ! অধিক, উন্মুক্ত কেশদাম কৃষ্ণ, কুঞ্চিত, প্রচুর, সুদীর্ঘ, তেমনি ভীষণভাবে মুখের চারিপাশে ঝুলিতেছে। জুমেলিয়ার একহাতে একটি লণ্ঠন এবং অপর হাতে একটা ছোট শিশি; তন্মধ্যে লোহিত বর্ণের কি একটা তরল পদার্থ টল্‌টল্‌ করিতেছে। কে জানে পিশাচীর কি সঙ্কল্প?

নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া সত্য সত্যই অরিন্দম নিরতিশয় ভীত হইলেন। যদি দেবেন্দ্রবিজয় সে সময়ে মূর্চ্ছিত না হইতেন, তাহা হইলেও সেই প্রলয়ঙ্করী পিশাচীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটু সম্ভাবনা থাকিত। এখন তিনি কি করিবেন? দেবেন্দ্রবিজয়কে সেরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি দেবেন্দ্রবিজয় মরে, তাহার সঙ্গে আমাকেও মরিতে হইবে।"

ঝটিকান্দোলিতজলোচ্ছ্বাসকল্লোলতুল্য তরঙ্গায়িত হাস্যের সহিত জুমেলিয়া বলিল, "অরিন্দম, এখন আর তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানকে বেশি করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, এখন একমাত্র আমার অনুগ্রহের উপর, করুণার উপর, ইচ্ছার উপর তোমাদের ন্যায় দুই দুইটী বীরপুরুষের জীবন নির্ভর করিতেছে।"

যেরূপ স্বরে কথাগুলি জুমেলিয়ার মুখ হইতে বাহির হইল,

তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, জুমেলিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত কথাগুলি বলিতেছিল।

অরিন্দম বলিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে।"

জুমেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "তবে অরিন্দম, আমার কাছে দয়া ভিক্ষা কর, প্রাণ ভিক্ষা কর—ক্ষমা চাও; যদি দয়া হয়, ক্ষমা করিলেও করিতে পারি।"

অরিন্দম বলিলেন, "পিশাচীর নিকট দয়া-ভিক্ষা! জুমেলিয়া, এমন নির্ব্বোধ কে?"

তীব্রস্বরে জুমেলিয়া বলিল, "তবে মজাটা দেখ।"

অরি। কি করিবে তুমি? মনের কথাটা কি?

জুমে। মনের কথাটা তোমাকে হত্যা করিব—এখনই—এই মুহূর্ত্তেই।

অ। কি রূপে?

জু। এই রূপে।

জুমেলিয়া সেই শিশিটা উপরে তুলিয়া ধরিল। তাহার পর খল্ খল্ অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, "ইহার ভিতরে কি আছে জান? না, জান না? ইহার ভিতরে যা আছে, তাই তোমার গায়ে ঢালিয়া দিব, অগ্নিশিখার ন্যায় তোমাকে পোড়াইতে থাকিবে, গলিত সীসা অপেক্ষাও ইহা ভয়ঙ্কর, তুলনায় ইহার নিকট তাহা বরফ বলিলেও চলে।"

অরিন্দম বলিলেন, "তোমার চিত্তবৃত্তিতে—তোমার কল্পনায়—তোমার নৃশংসতায় ও কুটীলতায় তুমি দানবী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; তোমার যা ইচ্ছা হয় কর, আমি মরিতে প্রস্তুত।"

জুমেলিয়া বলিল, "শোন, অরিন্দম; মরণটা মুখে বলা যত সহজ,

কাজে ঠিক তেমন সহজ হয় না। এ যে-সে মরণ নয়—জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধিয়া মরণ। মর তবে, অরিন্দম। তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ডাক্ ছাড়িয়া চীৎকার করিতে থাকিবে, আর তেমনি উচ্চকণ্ঠে আমি হাসিতে থাকিব—হো—হো—হো। কি মজা! তোমার দুই চখে দুই বিন্দু ঢালিয়া দিব, অন্ধ হইবে—চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেও সে যন্ত্রণা যাইবে না; তাহার পর মরিবে—ধীরে ধীরে ধীরে—ভয়ানক যন্ত্রণায় ভয়ানক মরণ।"

আবার জুমেলিয়া হাসিতে লাগিল। কি ভয়ানক অমঙ্গলজনক সেই তীব্র হাসি! সে হাসি শুনিয়া অতি বড় সাহসীর বুক কাঁপিয়া উঠে।

অরিন্দমও ভয় পাইলেন। বুঝিলেন, জুমেলিয়া মুখে শুধু ভয়-প্রদর্শন করিতেছে না, কাজে সে ঠিক তাহাই করিবে। এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের আর উপায় কি?

"এই দেখ, অরিন্দম।" বলিয়া জুমেলিয়া অল্পে অল্পে শিশিটা কাৎ করিতে লাগিল। শিশির মুখের কাছে সেই তরল পদার্থ টল্‌টল্ করিতে লাগিল। জুমেলিয়ার অলক্ষ্যে অরিন্দমের হাতে এক বিন্দু পতিত হইল। গলিত সীসকের ন্যায় সেই এক বিন্দু সেই স্থান দগ্ধ করিতে লাগিল। অরিন্দম নিজের অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া, নীরবে নিশ্বাস রোধ করিয়া অতি কষ্টে সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণা-সূচক একটিমাত্র শব্দও তাঁহার মুখ হইতে তখন বাহির হইল না।

জুমেলিয়া বলিল, "দেখ, অরিন্দম, আর বিলম্ব নাই, এই দেখ, ছিপি খুলিয়াছি; এখনই তোমার সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিব; এখনও সময় আছে, প্রাণ-ভিক্ষা চাও।"

অরিন্দম দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "প্রাণ থাকিতে নহে।"

জুমেলিয়া বলিল, "আমি তোমাকে মুক্তি দিলেও দিতে পারি; প্রাণ-ভিক্ষা চাও।"

অরিন্দম বলিলেন, "তুমি পিশাচী।"

জুমেলিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, "ছিঃ, অরিন্দম! চোখের মাথা একেবারে খাইয়াছ; এমন সুন্দরী আমি, এত রূপ আমার, আর আমি হলেম কি না পিশাচী?"

অরিন্দম কোন কথা কহিলেন না।

জুমেলিয়া বলিল, "এখন ও প্রাণ-ভিক্ষা চাও।"

তথাপি অরিন্দম নীরব।

জুমেলিয়া বলিল, "আর বলিব না, এই শেষ বার; এখনও প্রাণ-ভিক্ষা চাও। তোমার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টীভ্ যদি আমার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা করিয়া লয়, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইব। তাতে আমার যথেষ্ট সম্মান আছে, তাই বলিতেছি।"

তথাপি অরিন্দম নীরব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিপদ্‌কালে।

জুমেলিয়া যখন দেখিল, অরিন্দম কিছুতেই তাহার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিল না। দেখিয়া রাগিয়া যখন শিশি হইতে তরল অগ্নি বং ভিটরয়েল ঢালিবার উপক্রম করিল, এমন সময় তাহার পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি সেই শিশিটা জোর করিয়া তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। সেই সময়ে শিশি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে খানিকটা

তরলাগ্নি জুমেলিয়ার হাতে লাগিয়া গেল। যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া জুমেলিয়া ছুটিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরিন্দম কূপের ভিতর হইতে সেই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিলেন। এত বড় একটা বিপৎ যে এত শীঘ্র, এমন অল্পে অল্পে কাটিয়া যাইবে, এ কথা তিনি আগে মনেও স্থান দেন নাই। তিনি দেবেন্দ্রবিজয়ের মূর্চ্ছিত দেহ বুকে লইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলেন, এবং সেই বিপদ্-ভঞ্জন অপরিচিত লোকটির নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

সেই অপরিচিত লোকটির বয়স সাতাশ বৎসর হইবে। তাঁহার দেহ দীর্ঘ, ও প্রশস্ত। তাঁহার ভাবভঙ্গিতে, মুখাকৃতি ও সকরুণদৃষ্টিতে যে ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, তাঁহার পরিহিত সেই মলিন বস্ত্র, মাথার উপর রুক্ষ শুষ্ক অতি দীর্ঘ চুলগুলা, চখের পার্শ্ববর্ত্তী কালিমা ও হস্তপদদ্বয়ের বড় নখরে সে ভাবটুকু অনতিবিলম্বে মন হইতে মুছিয়া যায়। আরও গায়ে স্থানে স্থানে শুষ্ক ময়লা জমিয়াছে; কাণের নীচে, গলার চারিধারে এবং কপালে এত ময়লা পড়িয়াছে যে, চিম্‌টী কাটিলে খানিকটা উঠিয়া আসে। তাঁহার মুখ চখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে জাতিতে মুসলমান বলিয়া অরিন্দমের বোধ হইল। কে জানে, তবে কি ইনি ফুলসাহেবের কেহ?

যাই হোক উভয়ে মিলিয়া নিঃসংজ্ঞ দেবেন্দ্রবিজয়কে সসংজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক বিলম্বে তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইল। দেবেন্দ্রবিজয় উঠিয়া বসিলেন।

অরিন্দম সেই অপরিচিত লোকটির পরিচয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সেই লোকটাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মাথার ভিতরে

একটা ঘোরতর সন্দেহ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সন্দেহটি যদি দৈবক্রমে সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি জুমেলিয়া ও ফুলসাহেবকে ধরিবার জন্য যে কষ্টটা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কতক পরিমাণে বৃথা হয় না। তিনি আশান্বিত হৃদয়ে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে যে নামটি শুনিলেন, তাহাতে বাজীকরের ভোজদণ্ডস্পৃষ্ট এক গ্রাস মসীর, সহসা এক গ্রাস দুগ্ধমূর্ত্তি ধারণের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ চক্ষুঃ পালটিতে একেবারে অটল সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সবিস্ময় দৃষ্টিতে তিনি তাঁহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম সীরাজউদ্দীন, যাঁহার উদ্ধারের জন্য একদিন অরিন্দম কুলসমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

সীরাজউদ্দীন বলিলেন, "আমি আপনাকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু, (দেবেন্দ্রবিজয়কে নির্দ্দেশ করিয়া) এই ভদ্রলোকটিকে গত রাত্রে এখানে আর একবার দেখিয়াছিলাম। ধূমময় একটা রুদ্ধ গৃহের মধ্যে ইনি মৃত্যু-যন্ত্রণায় ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিতেছিলেন। সেই সময়ে আমি জানালা ভাঙিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করি। আমি সে দিন সেই ঘরের পাশের ঘরেই বন্দী হয়েছিলাম। নতুবা সেই দিন জুমেলিয়ার হাতে ইঁহার জীবন শেষ হইত।"

অরিন্দম সীরাজউদ্দীনকে বলিলেন, "আপনি বলিলেন, সেই সময়ে আপনি পাশের ঘরে বন্দী হইয়াছিলেন। কে আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ?"

সীরাজ। ফুলসাহেব।

অরি। কোন্ অভিপ্রায়ে ফুলসাহেব আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

সীরাজ। না, তা জানি না, তবে ফুলসাহেব যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাতে বোধ হয়, তার সেই রকমের একটা কোন ভীষণ অভিপ্রায় অবশ্যই ছিল।

অরি। আজ আপনি কিরূপে মুক্তি পাইলেন ?

সীরাজ। আজও আমি দ্বিতলের একটা রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ ছিলাম। একখানা ভাঙা খাটিয়ায় শুয়ে আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে-ছিলাম, এমন সময়ে ঘরের বাহিরের কোণে কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম ; সেই কোণে একটি ছোট দরজা ছিল, সেটা সহসা খুলিয়া গেল এবং জুমেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ; আমি সেই পিশাচীকে দেখিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। সে অনেক-ক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া আমার ঘরে বসিয়া রহিল। তাহার পর একবার সেই ছোট দ্বার দিয়া ঘরের বাহিরে গেল, আবার ফিরিয়া আসিল ; আবার গেল, আবার আসিল, তিন চারিবার এইরূপ করিয়া সে আর আসিল না। জুমেলিয়াকে এরূপ ব্যস্ত সমস্ত ভীত অবস্থায় আর কখনও দেখি নাই। মনে একটু সন্দেহ হইল, অবশ্যই আজ আবার একটু নূতন রকমের একটা না একটা কিছু ঘটিয়াছে, অথবা ঘটিবার সূচনা হইতেছে। যখন দেখিলাম, জুমেলিয়া আর ফিরিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে উঠিলাম ; দেখিলাম, জুমেলিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে ঘরের কোণের সেই ছোট দরজাটি বন্ধ করিয়া যাইতে ভুল করিয়াছে ; জুমেলিয়ার সেই ভুলে আমার অনেকটা আশা হইল, মনে হইল, এই সুযোগে যদি দুর্ম্মদ ফুলসাহেব এবং দানবী জুমেলিয়ার অসাক্ষাতে পালাইতে পারি। সেই মনে করিয়া সেই দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত অন্ধকারে পড়িলাম। সেখানে এমন অন্ধকার যে, নিজেকে নিজেই সেই

অন্ধকারের ভিতর হারাইয়া ফেলিলাম। তখন জুমেলিয়ার সেই ভুলটাকে আর ভুল মনে না করিয়া নির্ভুল কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলাম। অনুভবে ঠিক করিলাম, জুমেলিয়া আমাকে সে ঘর হইতে এই অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ করিয়া থাকিবে। তথাপি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিলাম, খুব সঙ্কীর্ণ পথ, ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুই হাত বাড়াইয়া, দুই পার্শ্বেরই দেয়াল এক সঙ্গে সহজে স্পর্শ করা যায়। মাথার উপর ছাদ কিম্বা একটা কিছু ছিদ্রশূন্য আবরণ ছিল। আমি কিছুদূরে আসিয়া সম্মুখে বাধা পাইলাম। ধীরে ধীরে তাহার উপর আঘাত করিয়া দেখিলাম, সেটা দেওয়াল নহে, একটা কাঠের কবাট; কিছুতেই ধাক্কা দিয়া, ঠেলিয়া সেটি খুলিতে পারিলাম না, কিন্তু সম্মুখের দিকে একটু জোর দিয়া টানিতেই, সেটা খুলিয়া গেল, এবং দিনশেষের ম্লান আলো আসিয়া চখে লাগিল। আমি তখন তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর একটা ঘরে পড়িলাম। তখনই সে কবাট আপনিই বন্ধ হইয়া গেল; তেমন আশ্চর্য্য ধরণের কবাট আমি আর কখনও দেখি নাই; বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দেখি, যে দরজা দিয়া বাহির হইলাম, সেটা একটি আল্‌মারীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যাই হোক্, সে ঘরে আর কেহই ছিল না। আমি তখনই নীচে নামিয়া আসিলাম। বাহির হইতে এই ঘরের সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ছুটিয়া আসিয়া জুমেলিয়ার হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইলাম।”

অরিন্দম বলিলেন, “আপনি আমাদের যে উপকার করিলেন, তাহা আজীবন স্মরণ থাকিবে। আপনি না আসিলে জুমেলিয়া নিশ্চয়ই ভিট্রিয়েল্ দিয়া আমাদের দুইজনকেই পুড়াইয়া মারিত। আপনি ফুলসমকে চিনেন?”

অরিন্দমের মুখে সহসা কুলসমের নাম শুনিয়া সীরজউদ্দীন যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। বলিলেন, "কে কুলসম ?"

অরি। কেন, তমীজউদ্দীনের কন্যা ?

সীরা। জানি। কিন্তু, এই ফুলসাহেবের হাত হইতে তাঁহাদের কেহ যে রক্ষা পাইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

অ। কুলসম রক্ষা পাইয়াছে। কুলসমের পিতা জীবিত নাই।

সীরা। একথা আমি এখানে ইহাদের মুখে কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। আরও শুনিয়াছি, অরিন্দম নামে কোন্ ডিটেক্টীভ নাকি এদের সকল ষড়যন্ত্র ভাঙিয়া দিয়াছেন। এবং তাঁহারই ভয়ে ইহারা এখানে লুকাইয়া রহিয়াছে। যাই হোক্, কুলসমের সম্বন্ধে আপনি আর কিছু জানেন ? কুলসমের সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন ? শুনিলাম, সেই ডিটেক্টীভ নাকি কুলসমকে রক্ষা করিয়াছেন। সত্য কি ?

অরি। আমারই নাম অরিন্দম। কুলসম নিরাপদে আছে, সে জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

তাহার পর কুলসম ও ফুলসাহেবের সম্বন্ধে অরিন্দম যাহা জানিতেন, সংক্ষেপে সমুদয় বলিলেন।

সীরাজউদ্দীন বলিলেন, "এখন ফুলসাহেব ও জুমেলিয়াকে গ্রেপ্তার করিবার কোন উপায় ঠিক করিয়াছেন ?"

অরিন্দম বলিলেন, "জুমেলিয়াকে যে আজ আর ধরিতে পারিব, এমন বোধ হয় না। ফুলসাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া উপরের ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি। যখন তাহাকে গ্রেপ্তার করি, সে নিজের বিষ-কাঁটা

নিজের হাতে বিদ্ধ করিয়াছিল। এতক্ষণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, বোধ করি। চলুন, তিনজনে উপরে যাই।"

* * * * * *

তিনজনে ফুলসাহেবকে দেখিতে চলিলেন। অরিন্দম ফুলসাহেবকে যে ঘরে হাতকড়া ও বেড়ি লাগাইয়া, ফেলিয়া রাঁখিয়া গিয়াছিলেন, এখন সেই ঘরেই তিনজনে প্রবেশ করিলেন।

সকলেই অতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিল, ফুলসাহেব নাই। দেখিয়া শুনিয়া বিশেষতঃ অরিন্দম যেন একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তদ্বার।

অনেকক্ষণ পরে সীরাজউদ্দীন বলিলেন, "আপনি কি এইখানে ফুল-সাহেবকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন? আমি ইতিমধ্যে এই ঘরে একবার আসিয়াছিলাম, কই তখন এ ঘরে কাহাকেও দেখি নাই।"

অরিন্দম বলিলেন, "এই ঘরটাই ঠিক, দেখিতেছেন না, কবাট ভাঙা রহিয়াছে। এই ঘরটার একটা মহৎ গুণ আছে, এই ঘরে ঢুকিয়া ছায়াবাজীর ন্যায় জুমেলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, এখন আবার এই এক অসম্ভব ব্যাপার দেখিতেছি।"

সীরাজউদ্দীন। এ ঘরের একটা গুণ আছে বৈকি। আমি সেই অন্ধকার সুঁড়ি-পথ দিয়া এই ঘরেই উঠিয়াছিলাম। এই যে আল্‌মারীটা দেখিতেছেন, উহার ভিতর দিয়া পথ আছে। আমি আপনাকে

গুপ্তদ্বার বিশিষ্ট আল্মারী।
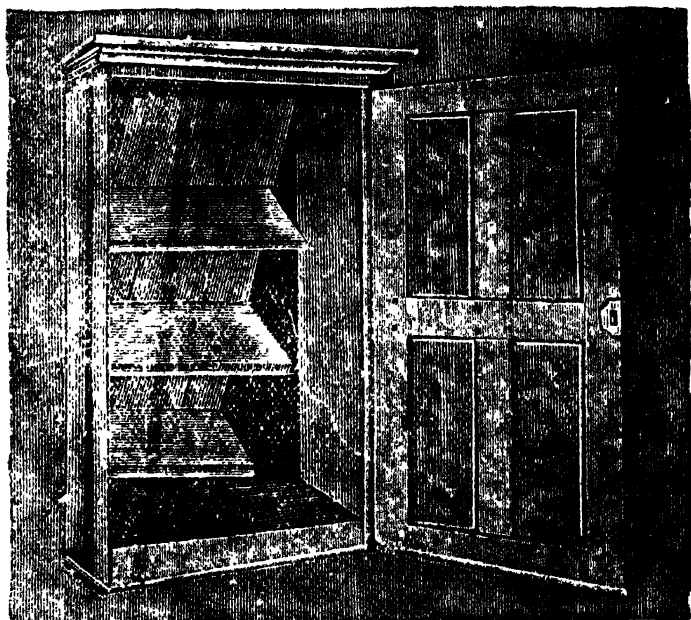
যে গুপ্তদ্বারের কথা বলিয়াছিলাম, সেই গুপ্তদ্বার এই আল্‌মারীর ভিতরে আছে। এই দেখুন।" বলিয়া, আল্মারীটা তিনি টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। এবং ভিতরকার কাঠখানায় একটু ধাক্কা দিতেই, সেটা ভিতরদিকে খানিকটা সরিয়া গেল; এবং ভিতরকার সেই অন্ধকার পথ দৃষ্টিগোচর হইল। সীরাজউদ্দীন বলিলেন, "এই পথ দিয়াই জুমেলিয়া তখন আপনার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার ঘরে গিয়া উঠিয়াছিল।"

অরিন্দম বলিলেন, "হাঁ, এখন তা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

এই বলিয়া অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয় ও সীরাজউদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া সেই আল্মারীর গুপ্তদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নিজে যে ঘরে বন্দী ছিলেন, সীরাজউদ্দীন অরিন্দমকে সেই রুদ্ধগৃহে লইয়া গেলেন। সে রুদ্ধগৃহ হইতে বাহির হইবার কোন উপায় না থাকায় সেই গুপ্তপথ অবলম্বনে সকলে বাহিরে আসিলেন।

তাহার পর তিনজনে মিলিয়া, পাতি পাতি করিয়া বাড়ীখানার সমুদয় অংশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেন, ফুলসাহেব কিম্বা জুমেলিয়াকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া সমগ্র বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এবং দূরগ্রামের কলরব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন সকলে নিরুদ্যমচিত্তে সেই বাগানবাটী ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

সেদিনকার অনুসন্ধানের সেইখানে সমাপ্তি। সকলে হুগলী যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভূগর্ভে।

এখানে ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না।

যখন-জুমেলিয়াকে বাহির করিবার জন্য অরিন্দম, দেবেন্দ্রবিজয় ও সীরাজউদ্দীন তিনজনে এঘর ওঘর করিয়া ঘুরিতেছিলেন, তখন এক পাতাল-পুরীর মধ্যে জুমেলিয়া বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া, নতনেত্রে ফুলসাহেবের মূর্চ্ছাবসন্ন অচেতন দেহ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সেই পাতাল-পুরীর একপাশে একটি ছোট দীপ তথাকার গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত নিস্তেজভাবে জ্বলিতেছিল। এবং তাহার ক্ষীণ শিখাটা প্রচুর অন্ধকারের মধ্যে সিন্দূরের ন্যায় যার আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পাতাল-পুরীর চারিদিক বদ্ধ, কোন্ পথে যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তাহা জুমেলিয়াই জানে। আমাদের সেটা জানিবার তেমন কোন আবশ্যকতা নাই।

দুই তিনবার জুমেলিয়া শিশি হইতে ঢালিয়া দুই তিন রকমের ঔষধ ফুলসাহেবের মুখে দিল। মুখের দুই পাশ দিয়া ঔষধ গড়াইয়া মাটীতে পড়িল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন জুমেলিয়া একখানি বড় আকারের শাণিত ছুরি, বাহির করিল। এবং সেই ছুরিকা দিয়া ফুলসাহেবের দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিল। প্রবলবেগে রক্তধারা বহিতে

লাগিল। ক্রমে যখন রক্তপাত বন্ধ হইয়া আসিল, তখন জুমেলিয়া সেই ক্ষতস্থানে মুখ দিয়া রক্ত শোষণ করিয়া বাহিরে ফেলিতে লাগিল অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ করিলে ফুলসাহেবের একটু জ্ঞান হইল। সে আসন্নমৃত্যু রোগীর ন্যায় উঠিবার জন্য বারম্বার ব্যর্থ বল-প্রয়োগ করিতে লাগিল। অবশেষে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া জুমেলিয়ার দিকে তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "পিশাচি, তুই কে? তুই আমাকে এ কোন্ নরকে এনেছিস্? সর্—সর্—সর্, এখান থেকে তুই দূর হয়ে যা, নরকে এসেছি, এখানেও তুই আমাকে সুখী হতে দিবিনে।"

এই বলিয়া ফুলসাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতে লাগিল।

জুমেলিয়া সেই ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া, ফুলসাহেবকে আবার একটা কি ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। তাহাতে অনতিবিলম্বে ফুলসাহেবের দুর্ব্বল দেহের, অবসন্নতা অনেকটা কটিয়া গেল। ফুলসাহেব ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

জুমেলিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ? আর কোন কষ্ট হইতেছে?"

ফুলসাহেব ক্ষীণস্বরে বলিল, "মাথার ভিতরে বড় যন্ত্রণা হইতেছে, জুমেলিয়া, তুমি আমাকে এখানে আনিয়াছ কেন?"

জুমেলিয়া বলিতে লাগিল, "অরিন্দমের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? আগে অরিন্দম আমাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন তুমি এখানে ছিলে না। এমন কি সে আমার শোবার ঘর অবধি তাড়া করিয়া আসে। আমি সেই ঘরে সেই আলমারীর গুপ্তদ্বার দিয়া সীরাজ-উদ্দীনের ঘরে পালিয়ে যাই; তখন সীরাজউদ্দীন ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার সেই গুপ্তদ্বারের পশ্চাতে থাকিয়া শুনিলাম, অরি-ন্দম আর তোমায় কি কথাবার্ত্তা হইতেছে। তখনই তোমাদের দুইজনে

"তাহাতি আরম্ভ হইল ; আমি পাশ থেকে দেখিতে লাগিলাম। শেষে তুমি নিজের বিষ-কাঁটা নিজের হাতে বিঁধে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লে। অরিন্দম তোমার হাতে পায়ে হাতকড়া ও বেড়ী লাগিয়ে দিয়ে তোমাকে ফেলে রেখে গেল। সে চলে গেলে আমি তোমাকে একা বুকে করিয়া এই ঘরে লইয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া এই ঘরের পাশেই অন্ধকূপের ভিতর একটা মানুষের গেঙানির শব্দ শুনিতে পাইলাম ; কিন্তু, এখান হইতে কিছুই দেখা যায় না ; সেই গেঙানির কারণটাও ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, এখান হইতে উপরে গিয়া দেখিলাম, ইহার উপরের ঘরটার অন্ধকূপের দ্বারের ভিতর একটা মই লাগানো রহিয়াছে। ভিতরে উঁকি মারিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে সমুদয় বুঝিতে পারিলাম। তখন সেই ভিটরয়েল দিয়া অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয়কে পুড়াইয়া মারিতে গেলাম। কিন্তু, কাজে কিছুই হইল না। সীরাজউদ্দীনের ঘর থেকে যখন বাহিরে আসি, তখন সেই গুপ্তদ্বারটা বন্ধ করিয়া আসিতে ভুল হইয়াছিল। সীরাজউদ্দীন এমন সময়ে আসিয়া শিশিটা আমার হাত থেকে ছিনাইয়া লইল। তখন প্রতিশোধ নেওয়াটা সহজ হইবে না মনে করিয়া, এখানে আসিয়া তোমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। অনেক রকম চেষ্টা করিয়া, কিছুতেই তোমার জ্ঞান হয় না দেখিয়া বড়ই ভাবনা হইল। শেষে, তোমার হাতের যে শিরায় সেই কাঁটা ফুটিয়াছিল, সেই শিরাটা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিলাম ; রক্তের সঙ্গে বিষের অনেকটা তেজ বাহির হইয়া গেলে, তোমার জ্ঞান হইল।"

ফুলসাহেব বলিল, "তবে সীরাজউদ্দীনও হাতছাড়া হইয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম, ঐ সীরাজউদ্দীনকে মাঝে ফেলিয়া কুলসমের কাছ থেকে পাঁচ সাত হাজার টাকা আদায় করিব ; সেটা আর হইল না।"

জুমেলিয়া বলিল, "অরিন্দম বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের কে আশাই সফল হইবে না।"

ফুলসাহেব বলিল, "সেটা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি ; অরিন্দমকে খুন করিতে না পারিলে আমাদের অদৃষ্ট কিছুতেই সুপ্রসন্ন হইবে না। অরিন্দম যাহাতে শীঘ্র মরে, এখন আমি প্রাণপণ করিয়া সর্ব্বাগ্রেই সেই চেষ্টা করিব।"

পঞ্চম খণ্ড

প্রতিহিংসা—রক্তে রক্তে

Alh. I look far down the pit—
My sight was bounded by a jutting fragment:
And it was stained with blood. Then first I shrieked,
My eye-balls burnt, my brain grew hot as fire,
And all the hanging drops of the wet roof
Turned into blood—I saw them turn to blood!
And I was leaping wildly down the chasm,
When on the farther brink I saw his sword,
And it said, Vengeance! curses on my tongue!

Coleridge—"*Remorse*" *Act IV Scene III.*

মোহিনী নিজের বুকে যে আঘাত করিয়াছিল, বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও তাহা সাঙ্ঘাতিক

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ আয়োজন।

তাহার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই মাসের মধ্যে এমন কোন ভীষণ লোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে কোন পাঠকের সুপ্ত বিস্ময় বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে। ইতোমধ্যে সীরাজউদ্দীনের সহিত কুলসমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহারা সুখে আছেন শুনিয়া সহৃদয় পাঠক পাঠিকা নিশ্চিন্ত হইবেন, আশা করি। এবং আরও আশা করি, শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, ফুলসাহেবের অন্বেষণে এই দীর্ঘ দীর্ঘ দুইটি মাস শ্রেষ্ঠ ডিটেক্টীভ অরিন্দমের একান্ত নিষ্ফলে কাটিয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন নাই; যত সময় যাইতেছে, ফুলসাহেবের জন্য অরিন্দম তেমনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছেন। এই দুই মাস তাঁহার না আছে আহারে ঠিক, না আছে নিদ্রার ঠিক, না আছে মনের ঠিক এবং না আছে স্বাস্থ্যের দিকে দৃক্‌পাত; অথচ এত পরিশ্রমে কাজ কিছুই হইতেছে না।

এদিকে অরিন্দম ফুলসাহেবকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ঠিক এই সময়ে লোকালয়ের বহির্ভাগে গহন বনের মধ্যে তাঁহার মরণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র হইতেছে।

যে বাড়ী হইতে অরিন্দম সীরাজউদ্দীনকে উদ্ধার করে, তাহা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোত্তর মুখে আরও অনেক দূরে যাইলে, একটা প্রকাণ্ড আম-বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। সে জায়গাটার নাম কাঁপা। কাঁপার চারিদিকে বড় বড় গাছ, ঘন জঙ্গল এবং গভীর নিস্তব্ধতা। সে নিস্তব্ধতা যেন সজীব, যেন চারিদিক ছম্ ছম্ করিতেছে।

রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে, কৃষ্ণাসপ্তমীর ম্রিয়মান চন্দ্র। তাহার আলো বনের ভিতর তেমন আসিতে পারে না, এক আধ জায়গায় একটু, আধটু; দেখিয়া একান্তই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, সেই বনের পার্শ্বে যেখানে কালুরায়ের জীর্ণ মন্দির, সেখানে অনেকটা স্থান উন্মুক্ত থাকায়, নির্ব্বিঘ্নে সেখানে চাঁদের আলো একেবারে প্লাবিত হইয়াছে, কিন্তু সে ভীষণ স্থানে চাঁদের আলোও যেন কেমন বড় ভয়ানক ভয়ানক বলিয়া মনে হয়।

এই বনমধ্যস্থ নির্জ্জন মন্দিরটি একজন ডাকাইতের স্থাপিত। অনেক দিন পূর্ব্বে এই মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য নরবলি এবং কত লোকের মাথাটা দেহ হইতে পৃথক করিবার নিভৃত মন্ত্রণা হইয়া গিয়াছে, আজও এই কৃষ্ণাসপ্তমীর মধ্যরাত্রে অনেকগুলি লোক একসঙ্গে জটলা করিয়া, কবাট বন্ধ করিয়া সেইরূপ একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এবং সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া আপাততঃ রাশি রাশি তামাক ও গাঁজা মুহুর্মুহুঃ ভস্মীভূত হইতেছিল। চারিদিক বন্ধ থাকায় অনর্গল ধূম ভিতরে জমাট বাঁধিতেছিল। একপাশে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। এবং সেই ধূমরাশি ভেদ করিয়া আলোক বিস্তার

করা দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া সেটা ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে করাঘাতের শব্দে মন্দিরের মধ্যভাগ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ভিতর হইতে একজন বলিল, "কেও?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "আমি।"

বিকৃত মুখ আরও বিকৃত করিয়া একটি তীক্ষ্ণ মেজাজের লোক সাতিশয় বিরক্তির সহিত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "আরে বাপু, আমিও ত আমি; নম্বর কত?"

"নম্বর ১"

"আমাদের নিয়ে মোটের উপর?"

"১৩।"

মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটা লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। লোকটা আমাদের অপরিচিত নহে, ফুলসাহেব।

ফুলসাহেব নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিল। কেহ কোন কথা কহিল না। কিয়ৎপরে সে ধূমাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফুলসাহেব বলিল, "আমাদের সকলেই আসিয়াছে?"

একজন গণনা করিয়া উত্তর করিল, "হাঁ।"

ফুল। আমাদের উদ্দেশ্যটা কি, তা বোধ হয় কাহারও জানিতে বাকী নাই?

সকলে। ঠিক প্রতিশোধটি লওয়া।

ফুল। আমাদের লক্ষ্য কে?

সকলে। (সমস্বরে) অরিন্দম।

আবার সকলে নীরব।

বৃহৎ মন্দিরটা যেন গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভীষণ ষড়যন্ত্র।

ফুলসাহেব বলিল, "তোমাদের সকলে সেই অরিন্দমের হাতে কোন না কোন রকমে লাঞ্ছিত হয়েছ। তোমরা যদি তাহার প্রতিশোধের কোন চেষ্টা না কর, ইহার অপেক্ষা কাপুরুষতা আর কি হতে পারে? দুই নম্বরের কে? আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও।"

দলের ভিতর হইতে তালগাছের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ন্যায় একটি লোক উঠিয়া ফুলসাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। লোকটা অসম্ভব লম্বা, তেমন দীর্ঘ দেহ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখখানা দেখিয়া আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কথা আপনা-হতেই মনে পড়ে।

ফুলসাহেব তাহাকে কর্ত্তৃত্বের স্বরে প্রশ্ন করিল, "অরিন্দম তোমার কি করেছে?"

২নং। আমার বাঁ হাত ভেঙে দিয়েছে।

ফুল। কি করে হাত ভেঙে দিলে?

২নং। অরিন্দমের সঙ্গে আমার একদিন হাতাহাতি হয়; শেষে বেটা আমার হাতটা ধরে কব্জীর কাছ্‌টায় এমনি মুচ্‌ড়ে দিলে যে, হাতটা কেটে বাদ দিতে হল।

ফুল। বটে! তবে তার উপর তোমার খুবই রাগ থাক্‌তে পারে।

২নং। সে কথা আর একবার করে বল্‌তে? বেটাকে একবার সুবিধায় পেলে মাথাটা চিবিয়ে খাই, তবে রাগ কতকটা যায়।

ফুল। আচ্ছা, তুমি বসো। এর মধ্যে তিন নম্বর কে?

"আমি।" বলিয়া একটি লোক দুই নম্বরের স্থান অধিকার করিয়া

দাঁড়াইল। দুঃখের বিষয় দুই নম্বরের সমুদয় স্থানটি অধিকার করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। অন্যান্য দিকের যাহাই হোক, ঊর্দ্ধের অনেকটা স্থান খালি রহিয়া গেল। লোকটা লম্বায় দুই নম্বরের যেন সিকি খানা, কিন্তু প্রস্থে খুব স্ফীত। ওজনে বরং চতুর্গুণিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। মুখখানি এমন বদ্‌খৎ যেন একটা অতি বিরক্তির অতি বিকৃতভঙ্গি মুখের উপর জমাট বাধিয়া চির-অবস্থিতির একটা পাকা বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়াছে।

ফুলসাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরিন্দম তোমার কি ক্ষতি করেছে?"

সে লোকটা নিজের ভগ্ন নাসিকা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল। সত্যই বেচারার নাসিকাটি একেবারে ভিতরে বসিয়া গিয়াছে।

ফু। ব্যাপার কি?

৩নং। এই নাকের শোধ তুল্‌বো—তবে ছাড়্‌বো।

ফু। তুমি নাকের বদলে তার নাকটা চাও, কেমন?

৩। আমার নাকের বদলে আমি তার প্রাণ চাই।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও—চারের নম্বর কে?

দলের ভিতর হইতে একটি বিশ্রী চেহারার লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া ফুলসাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ফু। তোমার কি হইয়াছে?

৪নং। আমার পা ভেঙে দিয়েছে। এ পায়ের শোধ আমি না নিয়ে ছাড়্‌বোনা।

ফু। পাঁচের নম্বর কে?

৫নং। আমি।

ফু। তোমার ঘটনা কি? বল।

সে লোকটা নিজের দক্ষিণ হস্ত ফুলসাহেবের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া সে হাতে আর কোন অঙ্গুলি বিদ্যমান ছিল না।

ফুলসাহেব বলিল, "কি করে অরিন্দম একেবারে তোমার চার-চারটে আঙুল ভেঙে দিলে?"

৫। পিস্তলের গুলিতে। যেমন আমি তাকে ঘুসি তুলে ছুটে মারতে যাব, সে দূর থেকে এমন একটা গুলি দাগ্‌লে যে, আমার ঘুসির আধ খানা চখের নিমেশে কোথায় উড়িয়ে দিলে, খোঁজ হল না।

ফু। নম্বর ছয় উঠে এস।

৬ নম্বরের প্রাণীটি সম্মুখীন হইলে, ফুলসাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দুঃখে আমাদের দলে মিশেছ? অরিন্দম তোমার কি অনিষ্ট করেছে?"

৬। অরিন্দম আমার একপাটি দাঁত একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে।

ফু। আর কিছু?

৬। আর আমার দাদাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

লোকটার যেরূপ বিকট চেহারা, তাহাতে তাহার যিনি দাদা, তিনি যে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কিছুই নহে।

ফু। তবে দেখ্‌ছি, তুমি অরিন্দমের রক্তদর্শন না করে কিছুতেই সুস্থ হবে না।

৬। সে কথা আর একবার করে বল্‌তে।

ফু। সাতের নম্বর কে আছ, এস।

৭। আমি সাতের নম্বর।

ফু। অরিন্দম তোমার কিছু ভেঙেছে?

৭সং। কিছুই না।

ফু। তবে তোমার কি হয়েছে?

৭। কিছুই না।

ফু। তবে যে তুমি আমাদের দলে মিশেছ? কারণ কি?

৭। কারণ, আমি অরিন্দমকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

ফু। কেন ঘৃণা কর?

৭। সে আমাকে একবার বোকা বানিয়ে নিজের একটা বড় কাজ হাঁসিল করে নিয়েছিল।

ফু। কি রকম শুনি।

৭। লখে নামে আমার একটা স্যাঙাৎ একবার একটা লোককে খুন করেছিল। আমরা যে যেখানে খুনটা আস্‌টা কর্‌তুম্, কেউ কারও কাছে কোন কথা লুকুতো না। যা করা যেত তা দুজনে পরামর্শ করেই হোত। লখে সেই খুনটা কর্‌বার পর, একদিন সন্ধ্যার সময়ে বেটা অরিন্দম ঠিক লখের মত সেজে এসে আমার কাছ থেকে এ কথা সে কথার পর সেই খুনটার সব কথা বার্ করে নিয়ে লখেকে একেবারে বার বৎসরের দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিলে। আমার জন্যই তাকে দ্বীপান্তর যেতে হল বলে, যাবার সময় শাসিয়ে গেছে যে, ফিরে এসে সে আমাকে খুন করে ফাঁসী যাবে। তা সে যে রকম ভয়ানক লোক, বেঁচে যদি ফিরে আসে, নিশ্চয় সে যেটি বলে গেছে ঠিক কর্‌বেই কর্‌বে। এর মধ্যে যদি আমি অরিন্দমের একটা কিনারা কর্‌তে পারি, তার রাগটা আমার উপর থেকে অনেকটা কমে যেতে পারে।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও—আট নম্বরের লোক উঠে এস।

সাতের স্থানে আট আসিয়া দাঁড়াইল।

ফু। তোমার কি ব্যাপার?

৮নং। বিষম ব্যাপার।

ফু। বটে। কি?

৮। আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না—ঘুমুতে গেলেই একটা না একটা স্বপ্ন লেগেই আছে; সকল স্বপ্নেই অরিন্দমের যোগাযোগ; কখন স্বপ্ন দেখি, অরিন্দম আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিচ্ছে, কখন অরিন্দম আমাকে পচাপুকুরের পাঁকে চুবিয়ে ধর্‌ছে, কখনবা আমাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলন্ত চিতার উপর তুলে ধর্‌ছে। তা ছাড়া, কাণমলাটা, চড়্‌চাপড়টা, লাথীটা আস্‌টা যেন লেগেই আছে; সেগুলো যেন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। অরিন্দম না মর্‌লে বোধ হয় এ স্বপ্ন-রোগ থেকে আমার কিছুতেই মুক্তি নাই।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও। নয় নম্বরের কে?

৯নং। আমি।

ফু। তোমার ঘটনা কি?

৯। তিন বৎসর ছয় মাস।

ফু। বটে।

৯। কঠিন পরিশ্রমের সহিত।

ফু। দশের নম্বর কে?

১০নং। আমি।

ফু। তোমার ব্যাপার কি?

১০। নয়ের চেয়ে আরও দেড় বৎসর বেশি। কিন্তু, ভোগটা বেশি দিন হয় নাই। একমাসের পরেই জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছি।

ফু। তবে ত তুমি খুব কাজের লোক। এগারো নম্বরের কে?

এগারো নম্বরে একটি বালক উঠিয়া অসিল। তাহার বয়স এখনও কুড়ির মধ্যেই আছে। তাহার মুখাকৃতি ও দৃষ্টি বড় ভয়ানক। কেউটে সাপের ছানা দেখিয়া ভয়ে বুকটা যেমন চম্‌কে উঠে, তেমনি হঠাৎ

যদি এর মুখখানি চোখের সাম্‌নে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবের একটা ভীতি স্পষ্ট অনুভূত হয়। তাহার হাতে একখানা খুব ধারাল খুব বড় ছুরি ছিল। তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, সে নিজেই ছুরিখানা নাড়িয়া নাড়িয়া আরম্ভ করিয়া দিল, "আমি অরিন্দমকে সহজে ছাড়্‌বো না, আমার বাবা একটি লোককে ছুরি মেরে খুন করেছিল বলে, অরিন্দম আমার বাবাকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে, আজ তিন বৎসর হল, বাবা মরেছে। যে দিন বাবা মরে, সেই দিন থেকে আমি এই ছুরির সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব করেছি, যে একবারও ছুরিখানা ছেড়ে থাকি না। অরিন্দমের বুকে না বসিয়ে এ ছুরি ত্যাগ কর্‌বো না।"

এমন পুত্রের যিনি জনয়িতা, তাহার অন্তিমে যে ফাঁসিকাষ্ঠ অপরিহার্য্য, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

তাহার পর বার নম্বরের লোক উঠিয়া আসিল। সে বয়সে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হইলেও এখনও যে তিন চারি জন সবল যুবককে আছাড় দিয়া ফেলিবার ক্ষমতা তাহার বেশ আছে, তাহার চেহারাখানার বিপুল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সেটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। এবং তাহার আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির যে খুব সৌসাদৃশ্য আছে তাহার কালিমালেপিত কোটরবিবিক্ষু চক্ষুর তীব্রদৃষ্টি, এবং প্রকটগণ্ডাস্থি মুখের ভীষণ ভঙ্গিতে সে সম্বন্ধে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। সে বলিল, "অরিন্দমের উপর আমার রাগের কোন কারণ আছে কি না, তা আমি বল্‌তে চাই না। তোমাদের সকলের চেয়ে তাকে যে আমি অনেক বেশি ঘৃণা করি, সেইটুকু জেনে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পার, ভাল—বিশ্বাস কর্‌তে পার, ভাল—থেকে যাই; না হয় বল আমি আমার নিজের পথ দেখি। অরিন্দমের যমের বাড়ী যাত্রার পথটা সহজ করে দেবার ক্ষমতা আমার একারই যথেষ্ট আছে।"

তাহার পর ৩ের নম্বরের লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। ফুলসাহেব তাহাকে দেখিয়া, হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা জানি।"

লোকটা সেই গোরাচাঁদ। নামটা শুনিলে কাহারই লোকটাকে মনে করিতে বিলম্ব হইবে না।

গোরাচাঁদ বসিলে ফুলসাহেব নিজে গত্রোত্থান করিয়া বলিল, বেশ হাসিমুখে মিষ্টকথায় শ্রোতাদের কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিয়া বলিল, "আমি অরিন্দমকে কেন ঘৃণা করি, তোমরা কেহই জান না। একমাত্র কারণ হচ্ছে, সে ঠিক আমারই মত বলবান্ আমারই মত চতুর, আমারই মত তুখোড় এবং আমারই মত সকল কাজে তৎপর। আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার মত আর একটা লোক যে পৃথিবীতে থাকে, সে ইচ্ছা আমার একেবারে নাই। সেটা আমার একান্তই অসহ্য বোধ হয়ে আস্‌ছে। হয় সে এ পৃথিবী ত্যাগ করুক্ আমি নিরাপদ হই, নয় আমি যাই, সে সুখী হোক। এ দুটার একটা আমি না কয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পার্‌বো না। দেখি, কতদূরের জল কোথায় দাঁড়ায়? যাক্, এখন তোমাদের মধ্যে এমন কেহ এখানে আছ যে, জীবনের মধ্যে কখনও সে একটা না একটা খুন করে নাই? কে আছ বল?"

কেহই কোন উত্তর করিল না—সকলেই খুনে দস্যু।

ফুলসাহেব বলিল, "ভালই হয়েছে, এসব কাজে এই রকমই লোক দরকার। অরিন্দম-হত্যার জন্য এখন সকলকে শপথ কর্‌তে হবে।"

তখন সেই সকল খুনে-লোক একমাত্র অরিন্দমের জীবন লক্ষ্য করিয়া শপথ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলসাহেবের নিকট হইতে এক একখানা তীক্ষ্ণধার কীরিচ উপহার পাইল।

সে দিন এই পর্য্যন্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহিনীর শেষ উদ্যম।

দেবেন্দ্রবিজয় আশ্বাসিত ও অনুরুদ্ধ হইয়া এখনও অরিন্দমের বাসায় অপেক্ষা করিতেছেন। যত দিন যাইতেছে রেবতীর জন্য দেবেন্দ্রবিজয় ততই ব্যাগ্র হইয়া উঠিতেছেন। রেবতীর সন্ধানের জন্য অরিন্দমকে কোন কথা বলিলে, অরিন্দম মুখে খুবই আশ্বাস দেন, কিন্তু কাজে তাহার কিছুই হয় না দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এমন কি অরিন্দমের সংসর্গ তাঁহার এক একবার বড় তিক্ত বোধ হইত। সেই সময়ে মনুষ্যোচিত বিরক্তি এবং রেবতীর উদ্ধারের জন্য অন্য ডিটেক্টীভ নির্ব্বাচনের কল্পনাটা তাহার মনের ভিতর নিরতিশয় প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠিত; মুখে কিছুই প্রকাশ করিতেন না। মুখে প্রকাশ না করিলেও মুখের ভাবটায় সে কথাটা যখন তখন অরিন্দমের নিকট প্রকাশ করিয়া দিত। দুই একটা কাজেও অরিন্দম তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন; ফুলসাহেবের অনুসন্ধান সম্বন্ধে কোন কাজ করিতে হইলে দেবেন্দ্রবিজয় পাঁচ সাতবার 'হাঁ' 'না' করিয়া কখন কোন কাজে 'হাঁ' দিতেন, কখন কোন কাজে 'না' দিতেন। একএক সময়ে অরিন্দমের মিথ্যা (?) আশ্বাস বাক্যে তাঁহার বিরক্তি ও ধৈর্য্য একেবারে সীমা অতিক্রম করিয়া এতদূর উঠিত যে, তাহা একটা নীরব ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া যাইত এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয়

গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতেন। অসহ্য বিরক্তি দারুণ উৎকণ্ঠা, দুঃসহ উদ্বেগ এবং লুপ্তপ্রায় ধৈর্য্যের মধ্য দিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি দীর্ঘতম হইয়া অতিবাহিত হইতেছে।

*　*　*　*　*

এক দিন দেবেন্দ্রবিজয় কোন কাজে বাহির হইয়াছেন, অরিন্দম মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সঙ্ক্ষিপ্ত মধ্যাহ্ন বিশ্রামে আয়োজন মাত্র করিয়াছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

অরিন্দম সেই স্ত্রীলোককে সেইখানেই লইয়া আসিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

•　•　•　•　•　•　•

অনতিবিলম্বে মুখের উপর অনেকটা ঘোমটা টানিয়া একটি স্ত্রীমূর্ত্তি অরিন্দমের সম্মুখীন হইল। গৃহমধ্যে প্রবেশ না করিয়া দ্বারসম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার বেশ ভূষা মলিন, এবং বড় অপরিষ্কার। দুই এক গুচ্ছ চুল—অতি রুক্ষ, কাণের পাশ দিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল—সে গৌরবর্ণা হইলেও, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সে বর্ণে কিছুমাত্র ঔজ্জ্বল্য ছিল না, সে দেহ দাবাগ্নিদগ্ধকিশলয় সদৃশ কেমন যে বিশুষ্ক ও শ্রীহীন, ঠিক বর্ণনা হয় না।

অরিন্দম তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ঘরের ভিতরে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিয়া, একটি তাকিয়া টানিয়া তদুপরে দেহভার বিনস্ত করিয়া বলিলেন, "কে তুমি ?"

ঘোম্‌টার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "আমি ফুলসাহেবের স্ত্রী।"

ফুলসাহেবের স্ত্রী! শুনিয়া বিস্মিত অরিন্দম আরও বিস্মিত হইলেন। কতকটা যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল। একবার মনে হইল, ছদ্মবেশে জুমেলিয়া, নহে ত? কিন্তু, তার কণ্ঠস্বর ত এমন নহে, জুমেলিয়ার কণ্ঠস্বরে এমন একটা তীব্রতা মিশ্রিত আছে, একবার শুনিলে চেষ্টা করিয়াও কেহ সহজে ভুলিতে পারে না। এ কে? সন্দিগ্ধ অরিন্দম কি উত্তর করিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া অবাঙ্মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অরিন্দমকে নীরব দেখিয়া সেই কৃতাবগুণ্ঠনা রমণী বলিল, "ফুলসাহেবকে তুমি কি জান না?"

অরিন্দম। জানি।

রমণী। আমি তাহার স্ত্রী। আমার নাম মোহিনী।

অরিন্দম। ইহা এখন জানিলাম।

মোহিনী। ফুলসাহেব জেলখানা থেকে পালায়, সে কথা তোমার মনে আছে?

অরি। আছে।

মোহি। সে তোমাকে খুন কর্‌বার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছে, সেটা এখনও তোমার মনে আছে কি?

অ। বেশ মনে আছে।

মো। তবে যে তুমি বড় ভালমানুষটির মত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?

অ। চিন্তিত হইয়াই বা করিব কি? এই দুইমাস ধরিয়া কিছুতেই তাহার সন্ধান হইল না।

মো। তা না হলেও তোমার মত একজন বড় গোয়েন্দার চুপ করে বসে থাকা কি ভাল দেখায়? দুইমাসে যা হয় নাই—দুই দিনে তা হতে পারে।

অ। সে যেন হল। তুমি ফুলসাহেবের স্ত্রী ; তাতে তোমার লাভ কি ?

মো। লাভ ? অনেক। সে অনেক কথা—সে কথা থাক্। আদত কথাটা আগে শুনে যাও। ফুলসাহেব এখন তোমাকে খুন কর্‌বার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইবার সে যা'হক একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়্‌বে না। তাই আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। খুব সাবধান। ফুলসাহেব বড় ভয়ানক লোক। সে শুধু মানুষ না— সে অনেক রকম ; সে মানুষও বটে, সে পিশাচও বটে, সে দানবও বটে, সে ডাকাতও বটে, সে খুনেও বটে, সে সাপও বটে, সে বাঘও বটে, একটু অসাবধান, হলেই হয় সে সাপ হয়ে দংশন কর্‌বে—না হয় বাঘ হয়ে গিলে খাবে—না হয় পিশাচ হয়ে ঘাড়্ মট্‌কাবে। না হয়—

অ। (বাধা দিয়া) আদত কথা কি বল্‌বে বল্‌ছিলে না ?

মো। হঁ্যা, মনে আছে। ফুলসাহেব তোমাকে খুন কর্‌বার জন্য একদল দস্যু সংগ্রহ করেছে। তারা সকলেই তোমাকে খুন কর্‌বার জন্য ফুলসাহেবের কাছে শপথ করেছে। একটু অসাবধান হলে কখন কে এসে তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে, তুমি কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। খুব সাবধান। সারা দিনরাত সাবধান—বড় ভয়ানক লোক তারা—সকলেই খুনে, খুন জখম কর্‌তে তাদের একটুও সঙ্কোচ হয় না।

অ। তারা কে জান ?

মো। না। তারা দুচার জন নয়, সর্ব্বসুদ্ধ তের জন। সকলেই যেন যমের দূত।

অ। তাদের আড্ডা কোথায় বল্‌তে পার ?

মো। আড্ডার কোন ঠিক্-ঠিকানা নাই। যেখানে যখন তারা

যে দিন একসঙ্গে জুটে, সেই দিনই সেইখানে তাদের আড্ডা। তারা সকলেই দিনরাত যে যার নিজের নিজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অ। সে চেষ্টার লক্ষ্য আমার মৃত্যু, কেমন ?

মো। তাতে আর সন্দেহ আছে ?

অ। তাদের ভিতরকার আর কোন কথা তুমি জান ?

মো। তাদের একটি পরামর্শের কথা আমি নিজের কাণে শুনেছি; বড় ভয়ানক লোক তারা—বড় ভয়ানক কথা।

অ। কথাটা কি ?

মো। আজ রাত্রে তোমাকে তারা এখানে খুন করতে আসবে।

অ। (বাধা দিয়া) এখানে ! আমার বাড়ীতে ?

মো। কেন ? বিশ্বাস হয় না ?

অ। সকলেই আসবে ?

মো। সকলেই—সকলেই শপথ করেছে।

অ। কখন আসবে।

মো। আজ রাত্রে।

অ। তা, জানি। কত রাত্রে ?

মো। রাত দুটার পর।

অ। বটে।

মো। শুধু নিজেকে রক্ষা করলে হবে না,—দেখবো তাদের ধরতে; তবে জানবো, গোয়েন্দার মত গোয়েন্দা বটে। এখন থেকে পুলিসের লোকজন এনে বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে রেখে দাও—আমার পরামর্শ শোন।

অ। তা হলে ফুলসাহেবও ধরা পড়বে—ফুলসাহেব যে তোমার স্বামী।

মো। ফুলসাহেব যে আমার স্বামী, সে কথা আর আমাকে এত করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমি ফুলসাহেবের স্ত্রী—আমি কি জানি না ফুলসাহেব আমার স্বামী? এমন নির্ব্বোধের মত কথা কও কেন?

অ। তবে যে তুমি ফুলসাহেবের অমঙ্গল চেষ্টা করছো? কারণ কি?

মো। কারণ, সে আমার পরম শত্রু। মানুষে মানুষের এতদূর শত্রু হতে পারে, এ কথা আগে জান্‌তেম্ না। ফুলসাহেবের তুমি যেমন শত্রু, তার চেয়ে ফুলসাহেব আমার বেশি শত্রু। যখন সে জেলে গিয়েছিল, তখন একবার আমি সুখী হয়েছিলেম্; এখন আবার যন্ত্রণায় বুকটা জ্বলেপুড়ে খাঁক্ হয়ে যাচ্ছে।

অ। ফুলসাহেবকে গ্রেপ্তার কর্‌লে তুমি সুখী হবে?

মো। খুন কর্‌লে সুখী হব।

অ। স্বামীর উপর এত রাগের কারণ কি?

মো। সে কথায় তোমার কোন দরকার নাই। তবে এখন আমি যাই। যা বল্‌লেম, সব যেন বেশ মনে থাকে।

মোহিনী চকিতে উঠিয়া, অতি দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অরিন্দম পথের দিককার একটা জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, মোহিনী তখন ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিয়াছে—এমন কি অর্দ্ধোলঙ্গভাবে সে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই একজন পথিক পথের ধারে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অরিন্দমের আয়োজন।

এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনাটা অরিন্দমের নিরতিশয় অদ্ভুতরসাত্মক বলিয়া অনুভূত হইল। কথায়-বার্ত্তায় পূর্ব্বেই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, মোহিনীর পাগলের ছিট আছে। এখন তাহাকে পথের উপর দিয়া সেরূপ ভাবে ছুটিতে দেখিয়া, সে ধারণাটা কিছুমাত্র অমূলক নহে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাহা হইলেও অরিন্দম তাহার কথাগুলি উন্মাদের খেয়াল মনে না করিয়া, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। যদিও তাঁহার ন্যায় সাহসী, সুচতুর, ও সদ্বিবেচক ব্যক্তির পুরুষকার অপেক্ষা দৈবের উপর নির্ভর করা একান্ত নিন্দার কথা; তাহা হইলেও তিনি অনেক স্থলে দৈবের উপরই সমধিক নির্ভরতা প্রকাশ করিতেন। তিনি জানিতেন, এবং এমন অনেক হইতেও দেখিয়াছেন, যে প্রথমে দৈবাৎ এমন একএকটি ছোট ঘটনা ঘটে, যে এক সময়ে তাহার পরিণাম অদৃষ্টপূর্ব্ব গুরুতর হইয়া উঠে।

তিনি সেই অপরিচিতা উন্মাদিনীর কথায় একান্ত আস্থাস্থাপনপূর্ব্বক দস্যুদল-দলনের অচিন্তিতপূর্ব্ব এক বৃহৎ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আয়োজনটা নূতন রকমের, তাহাতে প্রচুর আমোদ আছে, এবং ভয়, পরিশ্রম খুব কম আছে।

তিনি ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে থানায় উপস্থিত হইলেন। যোগেন্দ্রনাথ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যোগেন্দ্রনাথকে ফুলসাহেবের সেই নূতন কল্পনার কথা বলিলেন বটে; কিন্তু নিজে তাহাকে ধরিবার জন্য যে উপায় স্থির করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,"ব্যাপার ত বড় সহজ নহে, তোমার বাড়ীতে ডাকাতি। এইবার তোমার বিদ্যাবুদ্ধি বাহির হইয়া পড়িবে।"

অরিন্দম বলিলেন, "তেরজন ডাকাতকে ভয় করিতে অরিন্দমের এখনও শিক্ষা হয় নাই। কথাটা যদি ঠিক হয়, তা হলে কাল দেখ্‌বে অরিন্দম তেরজনকেই অয়স্কঙ্কণ-ভূষিত করে এখানে চালান দিয়াছে।"

যোগে। অরিন্দমবাবু, একি তুমি যে-সে তেরজন মনে করেছ। ফুলসাহেব ত তার মধ্যে আছেই ; তা ছাড়া ফুলসাহেবের পছন্দ করা বার জন। মনে থাকে যেন তাদের এক একজন দ্বিতীয় ফুলসাহেব।

অরি। নিঃসন্দেহ।

যোগে। তবে ?

অরি। তবে আবার কি ?

যো। এখন কি উপায় স্থির করেছ ?

অ। আত্মরক্ষার ? না তাদের বন্দী কর্‌বার ?

যো। দুই বিষয়েরই।

অ। এখনও অনেক সময় আছে। একটা না একটা উপায় স্থির কর্‌তে পার্‌বো।

যো। সময় আর কোথায় ? আজ রাত্রেই ত তারা আস্‌বে। এখন কতগুলি লোক আমাকে দিতে হবে বল দেখি ?

অ। একজনও না।

যো। (সবিস্ময়ে) সে কি !

অ। লোক নিয়ে আমি কি কর্‌বো ?

যো। একাই বা কি কর্‌বে ?

অ। যতদূর সাধ্য।

যো। কি পাগলের মত কথা বল, মানে হয় না। ভেবে ভেবে ভেবে

আর ঘুরে ঘুরে ঘুরে তোমার মাথাটা একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে দেখ্‌ছি।

অ। (সহাস্যে) তা হবে।

যো। তোমার সকল কথায় পরিহাস। কাজের কথায় পরিহাস করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। তুমি একা সেই তেরজনের কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।

অ। দেবেন্দ্রবিজয় আছে।

যো। সেদিনকার ঘটনায় তার বলবুদ্ধির অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; সেদিনকার মত আজ আবার সে তোমার সাহায্য কর্‌তে গিয়ে, তোমার বিপদ্ আর একদিকে না বাড়িয়ে দিলে হয়।

অ। নূতন লোক। তা যাই হোক, দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখ চোখের ভাব আর কথাবার্ত্তা শুনে তার মাথাটা যে পরিষ্কার আছে, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। আমার সঙ্গে এই দুই মাস ধরে ঘুরে ঘুরে গোয়েন্দাগিরি শিখ্‌তে তার একটু ইচ্ছা হয়েছে। মাথা পরিষ্কার না থাক্‌লে এ জঘন্য কাজে সহজে কাহারই ইচ্ছা হয় না। যে একটু বুদ্ধিমান, যে একটু চতুর, যে একটু বলবান, এসব কাজে সে একটু আনন্দ বোধ করেই থাকে।

যো। না হয় তোমার দেবেন্দ্রবিজয় চতুর বুদ্ধিমান্ বলবান্ সবই। তা হলেও দুইজনে কি সেই তেরজনের সমকক্ষ হতে পার্‌বে? বিশেষতঃ সেই তেরজনের মধ্যে আবার স্বয়ং ফুলসাহেবের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব রয়েছে।

অ। এক দিন আমি একা একুশ জনের যে দুর্দ্দশা করেছিলেম, তা বুঝি তোমার মনে নাই?

যো। তা জানি, তোমার বুদ্ধি বল অলৌকিক। কিন্তু, ফুলসাহেব বড় সহজ লোক নয়, তাই বলিতেছি।

অ। একটা বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য চাই। কতকগুলি ইলেক্ট্রীক ব্যাটারী আমার আবশ্যক। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সংগ্রহ করতে পারবে?

যো। ইলেক্ট্রীক ব্যাটারী নিয়ে কি হবে?

অ। (সহাস্যে) একটু বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা যাবে।

যো। তোমার অন্ত পাওয়া ভার? তুমি লোকটি একান্ত দুজ্ঞেয়।

অ। তোমার কাছেও?

যো। তা বইকি। ইলেক্ট্রীক্ ব্যাটারী ছাড়া আর কিছু চাই?

অ। আর চোদ্দ জোড়া হাতকড়া ও বেড়ী। যেন সকলগুলি বেশ মজবুত হয়।

যো। একটা বেশি কেন?

অ। যদি সেই তেরজনের সঙ্গে আমার বাড়ীতে জুমেলিয়ার শুভ পদার্পণ হয়। তা না হলেও ফুলসাহেবের জন্য জোড়াদুই হাতকড়া আবশ্যক করে।

যো। অরিন্দম বাবু, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তোমার কথাগুলো আমার বড় ভাল ঠেক্‌ছে না। বেশি না হয়—আমি থানা-থেকে বার জন লোক দিচ্ছি, আজ রাত্রের জন্য তোমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে দাও, এরূপ সময়ে অনেক কাজে লাগ্‌বে।

অ। একজনও না। আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

যো। তোমার যা খুসি, তাই কর, আমি আর কোন কথা বল্‌বো না।

অ। আমি উঠ্‌লেম; আর সময় নষ্ট কর্‌বো না। ইলেক্ট্রীক্ ব্যাটারী আর হাতকড়ি ও বেড়ীগুলো যতশীঘ্র পার, পাঠিয়ে দিয়ো।

যো। আধঘণ্টার মধ্যে পাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

* * * * *

যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, অরিন্দম বাসায় আসিয়া দেখিলেন, তখনও দেবেন্দ্রবিজয় ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি বৈঠক-খানা ঘরে বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে একটা চুরুট টানিতে ও প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

যথা সময়ে মুটের মাথায় বোঝাই হইয়া যোগেন্দ্রনাথের প্রেরিত অনেকগুলি ইলেক্ট্রীক ব্যাটারী ও অনেকগুলি হাতকড়া ও বেড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। অরিন্দম প্রত্যেক জিনিষটি উল্টাইয়া পাল্টা-ইয়া দেখিয়া ঘরে তুলিলেন। হাতকড়া ও বেড়িগুলি দ্বিতলের উপর এমন একটা স্থানে রাখিলেন যে, দরকারের সময়ে সহজে পাওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইলেক্ট্রীক্ ব্যাটারীগুলি দ্বিতলে উঠিবার সোপা-নের নীচে বসাইলেন। এবং সেই ব্যাটারীগুলির সঙ্গে তার যোগ করিয়া সোপানের চারিদিকে এবং রেলিএর গায়ে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। নিজের শয়ন কক্ষের কবাটের কড়া দুটির সহিতও একটি তার লাগাইয়া ইলেক্ট্রীক্ ব্যাটারির সহিত সংযোগ করিয়া দিলেন।

সমুদয় ঠিকঠাক করিতে অরিন্দমের রাত নটা বাজিয়া গেল। রাত নটার পর দেবেন্দ্রবিজয় ফিরিয়া আসিবেন।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, "ফুলসাহেবের আজ এখানে শুভাগমন হবে।"

দেবেন্দ্রবিজয় সদ্যঃ-আকাশ-বিচ্যুতের ন্যায় বলিলেন, "ফুলসাহেব! এখানে কোথায় আস্‌বে?"

"এখানে—আমার বাড়ীতে।"

"এখন সে কোথায়?"

"যেখানেই থাক্, আজ আমার বাড়ীতে আস্‌বে।

"আপনার বাড়ীতে?"

"হাঁ, আমার বাড়ীতে।"

"ধরা দিতে নাকি?"

"অনেকটা সেই রকমেরই বটে।"

"আপনার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

(সহাস্যে) "এস বুঝিয়ে দিই।"

* * * * * *

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া, দ্বিতলে উঠিবার সোপানের সম্মুখে লইয়া আসিলেন; এবং ইলেক্ট্রীক ব্যাটারীর সাহায্যে সিঁড়ির উপরকার তারগুলিতে সামান্যমাত্র বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঞ্চার করিয়া দিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, "একবার তুমি সিঁড়ির উপরে উঠে দাঁড়াও দেখি।"

দেবেন্দ্রবিজয়ের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় বলিয়া এবং এই দুই মাসের ঘনিষ্ঠতায় অরিন্দম তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে "আপনি, আপনার" ইত্যাদি সম্ভ্রমসূচক শব্দের পরিবর্ত্তে "তুমি" "তোমার" শব্দ ব্যবহার করিতেন। অরিন্দমের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় তাড়াতাড়ি পাশের রেলিং ধরিয়া সদর্পে সিঁড়িতে উঠিলেন; তখনই যন্ত্রণার তীব্রতর

।ৎকারে সমস্ত বাড়ীটা আর্ত্তনাদপ্রতিধ্বনিত করিয়া সিঁড়ি হইতে পাঁচ হাত দূরে লাফাইয়া পড়িলেন।

অরিন্দম তখন দেবেন্দ্রবিজয়কে সমস্তই বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বিস্মিত হইলেন। অরিন্দম বলিলেন, "তুমি একটা ব্যাটা-রীর তেজ দেখিলে; সময়ে দশটা ব্যাটারী এক সঙ্গে কাজ কর্‌বে। তখন একবার পা দিলে আর এক পা নড়্‌তে হবে না। ফুলসাহেব যখন ধরা পড়্‌বে, তখন যতক্ষণ না রেবতীর সম্বন্ধে সব কথা সে বলে, ততক্ষণ তাকে এরূপ যন্ত্রণাময় অবস্থায় সিঁড়ির উপর ধরিয়া রাখিব। দারুণ যন্ত্রণায় তখনই তাকে তার সমুদয় গুপ্তকথা আমাদের কাছে প্রকাশ কর্‌তেই হবে।"

শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে মনে সুখী হইলেন। মুখের ভাব দেখিয়া অরিন্দমও যে তাহা না বুঝিলেন, তাহা নহে। বলিলেন, "যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে রেবতীর উদ্ধারটা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে বলেই বোধ হয়।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আপনার কল্পনার ভিতর আমি এখনও প্রবেশ কর্‌তে পারি নাই; আপনি যা বল্‌ছেন, তা না বুঝ্‌বার মতন, এক রকম বুঝে যাচ্ছি। ফুলসাহেব এখানে কি কর্‌তে আস্‌বে?"

অ। আমাকে খুন কর্‌তে।

দে। এত সাহস তার?

অ। ফুলসাহেবের পক্ষে এটা বড় বেশি সাহসের কথা নয়।

দে। কত রাত্রে?

অ। রাত দুটার পর।

দে। কি রকম ভাবে আস্‌বে?

অ। চোরের মত চুপি চুপি আস্‌বে না—ডাকাতেরা যেমন দল-

বল নিয়ে ডাকাতি কর্‌তে আসে, ফুলসাহেব তেমনি সদলবলে আস্‌বে

দে। সে আবার দলবল পেলে কোথায় ?

অ। এই দুই মাস কি সে নিশ্চেষ্ট হয়ে-চুপ করে বসেছিল ? ভিতরে ভিতরে এই সব করেছে।

দে। তবে ত বড় ভয়ানক কথা! আপনি এ সংবাদ কোথায় পেলেন ?

অরিন্দম তখন মোহিনীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। মোহিনী নাম্নী একটা উন্মাদিনীর কথায় অরিন্দমের এতটা বিশ্বাস স্থাপন করা অনেকেই মনে করিবেন, কাজটা ঠিক হয় নাই। কিন্তু অনেক দিনের ডিটেক্টীভ অরিন্দমের এমন একটা অসাধারণ নৈপুণ্য এবং অনন্য সুলভ অনুমান শক্তি ছিল যে, একটা কথা পড়িলে ভবিষ্যতে সেটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা তিনি ঠিক অনুভব করিতে পারিতেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিনী কোন কথা না খুলিয়া বলিলেও তাহার কথা বার্ত্তার ভাবে তিনি আরও বুঝিয়া ছিলেন, মোহিনী ফুলসাহেবের নিকটে কোন বিষয়ে প্রতারিত হইয়াছে—এরূপ স্থলে অবশ্যই সে বিষয়টা আদিরসাত্মক; এবং কিছু মর্ম্মভেদী!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তদ্বার।

রাত এগারটার পূর্ব্বেই অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় আহারাদি শেষ করিলেন। এবং সমুখ দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া, দ্বিতলের একটা ঘরে বসিয়া উভয়ে দাবা-খেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় খেলিতে খেলিতে বারম্বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। এক একবার মনটা খেলা হইতে সরিয়া গিয়া ফুলসাহেবের পদধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছিল, এবং ফুলসাহেবের দলবলের লোকগুলির ভীষণ চেহারা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অরিন্দম অত্যন্ত মনোযোগের সহিত খেলিতেছিলেন সুতরাং জিতিতেছিলেন। মাথার উপর যে এতবড় একটা বিপদ, জীবন ও মৃত্যুর এবং ছুরি ও রক্তের একটা সংগ্রামাভিনয় যে আসন্ন, তথাপি সেজন্য তাঁহার মুখে উদ্বেগ, আশঙ্কা অথবা চিন্তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

রাত দুইটার সময়ে খেলা বন্ধ হইল। অরিন্দম বলিলেন, "তাদের আস্‌বার সময় হয়েছে, একঘন্টার মধ্যেই তাদের শুভাগমন হবে, আমরা এখন থেকে তাদের অভ্যর্থনা কর্‌বার বন্দোবস্ত করি এস।"

দেবে। আমি কোথায় থাক্‌বো বলুন দেখি?

অরি। নীচে, সিঁড়ির পাশের ঘরটায় এখন তোমাকে থাক্‌তে হবে। যাবার সময়ে এই রবারের জুতো আর দস্তানা, পরে যাবে। এগুলি এত মোটা রবারে তৈয়ারি, যে ইলেক্‌টিক তারে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।

এই বলিয়া অরিন্দম দুই জোড়া রবারের জুতা ও দস্তানা লইয়া আসিলেন। উভয়ে সেইগুলি লইয়া হাতে পায়ে পরিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "নীচের ঘরে গিয়ে আমায় কি কর্‌তে হবে ?"

অরিন্দম বলিলেন, "সেই ঘরের দখিণ কোণে দেখ্‌বে একটি দড়ী ঝুল্‌ছে, যখন দেখ্‌বে যে তেরজন লোক সিঁড়ির উপর উঠেছে, তখন সেই দড়ীটা টেনে ধর্‌বে। তারপর যা কর্‌তে হয়, আমি কর্‌বো।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "হয় ত তেরজনের একজন বাহিরে পাহারা দিতে পারে।"

অ। তাদের পাহারা দিবার আরও লোক আছে, সে কাজ জুমেলিয়া বেশ পার্‌বে। জুমেলিয়ার উপর ফুলসাহেব যথেষ্ট নির্ভর করে থাকে।

দে। তা হলেও তেরজনই কি একসঙ্গে উপরে উঠ্‌বে ?

অ। তেরজনই উঠ্‌বে। ফুলসাহেব যে প্রকৃতির লোক, তাতে যে সে চোরের মত চুপি চুপি, ভয়ে ভয়ে কোন কাজ কর্‌বে, বোধ হয় না; এমন বীরত্বের অভিনয়টা সে কখনই একেবারে মাটি করে ফেল্‌বে না। একেবারে সকলকে সঙ্গে নিয়ে, আমার শয়ন-গৃহে গিয়া বিছানার চারিদিক থেকে তেরখানা ছুরি একমুহূর্ত্তে আমার বুকে বসিয়ে যাতে এ বীরত্বের অভিনয়টা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, বরং সে সেই চেষ্টা কর্‌বে। আমার ত এইরূপ অনুমান; তার পর তার মনে আর কি আছে, সেই

জানে। তা সে যাহাই মনে করে আসুক, একবার এলে আর ফিরে যেতে হবে না। এই গোয়েন্দাগিরি কাজ বড় শক্ত, দেবেন্দ্রবাবু। যেখানে একটু সন্দেহের ছায়া আছে, সেই সন্দেহকে সত্যের আসনে বসিয়ে, সেখানে আমাদের এক প্রকাণ্ড আয়োজন ঠিক করে রাখ্‌তে হয়। তোমার যেরূপ উৎসাহ দেখ্‌ছি, কিছুদিন আমার সঙ্গে থাক্‌লে তুমিও একজন বড় ডিটেক্‌টিভ হতে পারবে। তোমার কিছু কিছু ডাক্তারী জানা আছে, এ কাজে ডাক্তারী শিক্ষাটাও সময়ে সময়ে উপকারে আসে।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "কিন্তু, ডাক্তারির মত এ কাজটা তেমন মান্য নহে। বিশেষতঃ ডাক্তারিগিরি অনেক লোকের অনেক উপকারে আসে—এমন কি কত লোককে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করাও হয়।

অরিন্দম বলিলেন, "তোমার এ কথার উত্তরে আমাকে অনেক কথা বল্‌তে হয়। গোয়েন্দাগিরিতে ডাক্তারি অপেক্ষা সহস্রগুণে লোকের উপকার করা হয়। এই গোয়েন্দাগিরি কত ধনে-প্রাণে-মরণাপন্ন ব্যক্তির ধন ও প্রাণ ফিরিয়ে এনে, তার অবসন্ন দেহে নূতন জীবন সঞ্চার করে। গোয়েন্দাগিরি অপহৃত স্নেহের নিধি সন্তানের শোকাতুর পিতা মাতার শূন্য ক্রোড় পরিপূর্ণ করে। এই গোয়েন্দাগিরি দস্যুর হাত থেকে, খুনের হাত থেকে কত নিরবলম্বন শিশুর পিতা ও কত অভাগিনী স্ত্রীর স্বামীকে উদ্ধার করে থাকে; তাতে কি পরোপকারের কিছুই নাই?—কেবল পণ্ডশ্রম? বোধ করি কোন ডাক্তারকে পরোপকারের জন্য গোয়েন্দাদিগের মত শ্রমস্বীকার করতে হলে ডাক্তারী বিদ্যাটি মস্তিষ্ক হতে শীঘ্র বহিষ্কৃত করে ফেল্‌বার জন্য স্মৃতিনাশক কোন আশুফলপ্রদ নূতন ঔষধের আবিষ্কার কর্‌তে সচেষ্ট হয়ে উঠ্‌তো।

কতক বা কৌতূহল, কতক বা দয়া, কতক বা রোষ পরবশ হয়ে ডিটেক্-টীভরা শরণাপন্নের যে সকল ভয়ানক ভয়ানক বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে নিজের অসহায় প্রাণটাকে খুনেদের ছুরির নীচে সচ্ছন্দে যেমন ছেড়ে দেয়, আর কে তেমন পারে বল দেখি? তথাপি এ দেশের লোকেরা ডিটেক্টীভদের সম্মান করে না—এতা তাদের দোষ নয়, আমাদেরই অদৃষ্টের দোষ। নতুবা লণ্ডন, ফ্রান্স ও আমেরিকার ডিটেক্টীভরা যেরূপ সম্মানিত হয়ে থাকে, এবং আবালবৃদ্ধবনিতার এমন একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যে, সেখানকার বিচারপতিদিগের অদৃষ্টেও তেমনটি ঘটে না! যদিও আমার মুখে এ সকল কথাগুলা ভাল শোনায় না—সম্পূর্ণ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন অবসরে এক একবার নিজেদের কথাগুলি ভাবি, তখন মনে যেমন দুঃখ হয়, তেমনি নিজেদের জীবনের প্রতি একটা ঘৃণাও জন্মে। আমরা পরের জন্য দেহপাত ও প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত, কিন্তু পরে সেটা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত এবং একটু সম্মান দেখাইতে একেবারে অপ্রস্তুত। আমরা যদি তাহাদের দুইচক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিই, আমরা পরের জন্য জন্মিয়াছি এবং পরের জন্য বাঁচিয়া আছি এবং যখন মরিতে হইবে পরের জন্যই মরিব, তথাপি তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না। বোধ করি বাঙ্গালাদেশের ডিটেক্টীভশ্রেণীর উপর বিধাতার একটা অমোঘ অভিসম্পাৎ আছে। যাক্, সে সকল কথা এখন থাক্, তুমি নীচে যাও। ফুলসাহেবের আসিবার সময় হয়ে এসেছে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন প্রক্রিয়া।

দেবেন্দ্রবিজয় নীচে নামিয়া গেলেন। এবং সোপানের পার্শ্ববর্ত্তী একটি অন্ধকারময় ঘরে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে একটা কি শব্দ হইল। দেবেন্দ্রবিজয় সেই ঘরের কবাটের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা ঘরের রাস্তার দিককার একটা জানালা দিয়া এক একজন বিকটাকার দস্যু প্রবেশ করিতেছে; এবং একজন দুইহস্তে গবাক্ষের লোহার গরাদা দুইটি ফাঁক করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাহারা যে ফুলসাহেবের দলবল, তাহাতে আর দেবেন্দ্রবিজয়ের তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, নিঃশব্দে অনেকগুলি লোক উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে তাহাদের ভিতর হইতে একজন লোক একবার একটা দেশলাই জ্বালিয়া, সকলে আসিয়াছে কি না গণনা করিয়া দেখিল। সে গণনাকারী স্বয়ং ফুলসাহেব। সেই অবসরে দেবেন্দ্রবিজয়ও একবার তাহাদের গণনা করিয়া লইল। মোটের উপর তাহারা তের-জন। সকলের হাতে এক একখানা তীক্ষ্ণধার কীরিচ।

তাহার পর তাহারা অন্ধকারে অন্ধকারে ধীরে ধীরে সোপানারোহণ আরম্ভ করিল। নিঃশব্দে—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। দেবেন্দ্র-বিজয় দেখিয়া ভীত হইলেন, যদি ইলেক্ট্রীক ব্যাটারী এ সময়ে কোন কাজ না করে, তাহা হইলে এখনই যে ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে, তাহা

ভাবিতেও ভয় হয়। এ সময়ে তাহারা সকলেই মরিয়া—প্রাণের ভয় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগের সকলেই যখন সিঁড়ির উপর উঠিয়াছে, তখন দেবেন্দ্রবিজয় সেই ইলেক্ট্রীক ব্যাটারীর দড়ী সজোরে টানিয়া ধরিলেন।

তখনই চক্ষের নিমেষে কি ভয়ানক!

তখনই দস্যুদলের আর্ত্তনাদে, চীৎকারে, তর্জ্জন গর্জ্জনে, গালাগালিতে সমস্ত বাড়ীখানা যেন ভাঙিয়া পড়িবার মত হইল। তখনকার ব্যাপার বর্ণনায় পাঠকের ঠিক হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। পাঠক, পারেন যদি অশ্বশালায় অগ্নিসংযোগের কল্পনা করিতে একবার চেষ্টা করুন, অনেকটা সেই রকমের। অবশ্যই সেই দহ্যমান অশ্বশালায় অনেকগুলি অশ্ব আছে।

এমন সময়ে অরিন্দম একটা লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিলেন। এবং সেই সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। আর নীচে দেবেন্দ্রবিজয় ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া হাসিয়া হতজ্ঞান হইতেছেন।

কি সুন্দর দৃশ্য—সিঁড়ির উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত তেরজন সারি-সারি দাঁড়াইয়া। তর্জ্জন গর্জ্জনের ত কথাই নাই—তাহার উপর তাহাদের কি চমৎকার মুখভঙ্গি! যন্ত্রণায় কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ সেই উদ্যোগে আছে, এবং কেহ রেলিং হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য মুখ বিকৃত করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। যাহার যেখানে সেই ইলেক্ট্রীক ব্যাটারীর সংস্পর্শ হইয়াছে, দেহ হইতে সেই অঙ্গটা যেন ছিঁড়িয়া উঠিয়া যাইতেছে।

ডাক্তার ফুলসাহেব সিঁড়ির উপরের শেষ সীমায় অরিন্দমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া; যদিও তাহার মুখে চীৎকার, গ্যাঙানি কি কোন যন্ত্রণাসূচক

ধ্বনি ছিল না—তথাপি তাহার মুখের ভাব এবং দেহের সুদৃঢ় মাংস-পেশিগুলি যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহার ভীষণ যন্ত্রণা বেশ অনুভব করা যায়।

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, ভাল আছেন ত? অনেক দিনের পর একেবারে সবান্ধবে শুভাগমন করেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। বোধ হয় আপনাদের অভ্যর্থনার আয়োজনটা ঠিকই করা হয়েছে—কোন ত্রুটী হয় নাই? কি বলেন?"

ফুলসাহেব কোন উত্তর করিল না; অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অরিন্দম বলিলেন, "আগে আপনার বন্ধুদের মুক্তি দিই, তার পর সকলের শেষে আপনার মুক্তিলাভ হবে।" এই বলিয়া অরিন্দম রাশীকৃত হাতকড়া লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন। হাতে রবারের দস্তানা ও পায়ে রবারের জুতা থাকায় ব্যাটারীতে তাঁহার কিছুই হইল না।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে কতকগুলি হাতকড়া দিলেন; এবং দুইজনে মিলিয়া দস্যুদের হাতে হাতকড়া লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বার জন এইরূপে বন্দী হইল—বাকী ফুলসাহেব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

খুনীর আত্মকাহিনী।

ফুলসাহেবের যন্ত্রণাটা এই দীর্ঘকালে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি সে নীরব, এবং তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া গিয়াছিল।

অরিন্দম বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব, তোমার মুক্তির বিলম্ব আছে। আমি যে কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিব, যদি তুমি সত্য কথা না বল, তা হইলে তোমাকে এইরূপ অবস্থায় সারারাত এখানে কাটাইতে হইবে। সিন্দুকের ভিতর যে বালিকার লাস পাঠাইয়াছিলে, সে কে?

ফুলসাহেব হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যন্ত্রণায় তাহা একটা ক্ষণ-স্থায়ী বিকৃত মুখভঙ্গিতে পরিণত হইল মাত্র।

ফুলসাহেব বলিল, "তুমি যে রেবতীকে আমার হাত থেকে বাহির করে নিয়েছ, সেই রেবতীর ছোট বোন—রোহিণী।"

"কে তাহাকে খুন করিয়াছে?"

"আমি—স্বহস্তে।"

"কেন খুন করিলে?"

"খুন করা আমার একটা নেশা।"

"নেশাটা এখন ছুটেছে কি?"

"যতক্ষণ না ফাঁসীর দড়ীতে আমি ঝুল্‌ছি, ততক্ষণ নয়?"

"রেবতীর কাকা কেমন লোক?"

"আমার চেয়ে ভয়ানক লোক।"

"কেন?"

"যে বিষয়ের লোভে নিজের ভ্রাতষ্পুত্রীকে হত্যা করিতে চায়, সে কি আমার চেয়ে ভয়ানক লোক নয়? আমি ত অপর লোক—আমার তাতে কষ্ট কি?"

"তুমি রেবতীর কাকার নিকট এই কাজের জন্য কতটাকা পারি-শ্রমিক ঠিক করিয়াছিলে?"

"বিশ হাজার।"

"কত আদায় হইয়াছে?"

"কিছুই না।"

"কেন?"

"রেবতীকে খুন করিতে পারি নাই বলিয়া।"

"রেবতীকে খুন করিতে পার নাই কেন?"

"তুমি আমার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছ।"

"এত দিন খুন কর নাই কেন ?"

"রেবতীর রূপ দেখিয়া ভুলিয়া ছিলাম—আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; মনে করিয়াছিলাম রেবতীকে হস্তগত ও মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে রেবতীর কাকা ফাঁকে পড়িবে—সমস্ত বিষয়টা আমারই ভোগদখলে আসিবে।"

"রেবতী ও তাঁহার কাকার কাছে তুমি কেশব বাবু নামেই পরিচিত ?"

"হাঁ—আমি একটা লোক—কিন্তু কাজের খাতিরে আমার অনেকগুলি নাম আছে।"

"মোহিনী তোমার কে হয় ?"

"তুমি এত খবর কোথায় পাইলে ?"

"মোহিনী তোমার স্ত্রী ?"

"মোহিনী আমার যম।"

"কেন এ কথা বলিতেছ ?"

"নতুবা আমার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন ?"

"মোহিনী কিসে তোমার এ দুর্দ্দশার কারণ হইল ?"

ফুলসাহেব উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "অরিন্দম, আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিয়ো না—তোমার মুখে মোহিনীর নাম শুনিয়া এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, রাক্ষসী মোহিনীই স্বহস্তে আমার এ মৃত্যুর আয়োজন করিয়াছে। নতুবা এতক্ষণে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত—তুমি যেমন আমাকে এই দুরবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে উপরে দাঁড়াইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতেছ; তোমাকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখে তুলিয়া ধরিয়া এখন আমিও তোমার উপর এমনই

কর্তৃত্ব করিতে পারিতাম। সর্ব্বনাশী মোহিনী আমার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। নিশ্চয়ই সে এখানে আসিয়া আমাদের গুপ্তমন্ত্রণার কথা তোমার নিকটে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অরিন্দম, আর না—তুমি আমাকে আপাততঃ এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও—প্রাণ বায় বড় কষ্ট—"

অরি। আর একটু অপেক্ষা কর। তুমি রেবতীর কাকার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলে সকলই সত্য?

ফুল। এক বর্ণও মিথ্যা নহে। মরিতে বসিয়া মিথ্যা বলিয়া লাভ কি?

অরি। আরও একটি কথা সত্য বলিবে?

ফু। কেন বলিব না?

অ। তুমি সিন্দুকে রেবতীর ভগ্নীর লাস পাঠাইবার সময়ে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলে যে, সর্ব্বসুদ্ধ তুমি তখন আঠারোজনকে খুন করিয়াছ, তাহার একটা তালিকা দাও দেখি।

ফু। ইহা ত আমার গৌরবের কথা। কেন মিথ্যা বলিব? যখন দেখিতেছি আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তখন আর এ গৌরবের কথাটা অপ্রকাশিত না রাখাই ভাল। আঠারো খুনের জন্য আমাকে ত আঠারো বার ফাঁসী যাইতে হইবে না। আমার বাড়ী এলাহাবাদ আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। নাম, বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। বোধ হয় খুনী বিনোদ চাটুর্য্যের কথা তুমি শুনিয়াছ। যে বিনোদ চাটুর্য্যেকে ধরিবার জন্য কত পুলিস কর্ম্মচারী, কত সুদক্ষ গোয়েন্দা এ পৃথীবি হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে—আমি সেই লোক। যে মোহিনীর কথা তুমি বলিতেছিলে, ঐ মোহিনীর বাপ, কাকা, মামা ভাই একমাত্রে আমার হাতে খুন হয়। সে আজ দশ বৎসরের কথা।

বিধবা মোহিনীকে আমি কুলের বাহির করিয়া আনি—অবশ্যই অর্থ-লোভে। কারণ আমার মনের ভিতর প্রেম, ভালবাসা স্নেহ মমতা এ সকল বড় একটা স্থায়ী হতে পারে না। মোহিনীদের বাড়ী আমাদের পাড়ায় ভিতরেই ছিল। মোহিনীকে বাহির করিয়া আনিলে মোহিনীর বাপ রাগে আমাদের ঘর জ্বালাইয়া দেয়। আমি সেই প্রতিশোধে মোহিনীর বাপ, কাকা, মামা, আর ভাইকে এক রাত্রে খুন করি। সেই রাত্রেই আমি মোহিনীকে নিয়ে সেথায় থেকে সরে যাই। তাহার পর নয়জন পুলিসের লোককে খুন করি—অবশ্যই যাহারা আমার সন্ধানে দুঃসাহসিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর এক মুসলমানের মেয়েকে অর্থলোভে বিবাহ করিয়া, তাহার বাপকে খুন করি—তাহাকে খুন করি। কুলসমের মাকে, ভাইকে খুন করি। রেবতীর ভগ্নীকে খুন করি। এইত গেল আঠারজন; এ ছাড়া পরে তমীজউদ্দীনকে খুন করিয়াছি, জেলখানার প্রহরীকে খুন করিয়াছি, আরও যদি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম,—আরও অনেক খুন করিতে পারিতাম। বিশেষতঃ তোমাকে আর যোগেন্দ্রনাথকে খুন করিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে আমার মরণে সুখ হইবে না। উঃ! বড় যন্ত্রণা—অরিন্দম, প্রাণ যায়—আমার শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে—কি ভয়ানক!

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে ইঙ্গিত করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ফুল-সাহেবের হাতে ডবল হাতকড়া ও পায়ে ডবল বেড়ী লাগাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ প্রতিহিংসা।

অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে এ শুভসংবাদ দিবার জন্য দেবেন্দ্রবিজয়কে থানায় পাঠাইলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ পাঁচসাতজন পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন ; দেখিয়া শুনিয়া তিনি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত অরিন্দমের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সকলকে থানায় লইয়া চলিলেন। অরিন্দম ও দেবেন্দ্র বিজয় সঙ্গে চলিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ও যে পাঁচ সাত জন পাহারা-ওয়ালা যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা ফুলসাহেব ছাড়া অপর দস্যুদিগকে লইয়া আগে চলিয়া গেল। তাহাদিগের পশ্চাতে ফুলসাহেবকে লইয়া অরিন্দম, ও যোগেন্দ্রনাথ থানার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দূরবর্ত্তী আম গাছের ঘন পল্লবের ভিতর হইতে ছুটো একটা কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এবং বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া শেষরাত্রের স্নিগ্ধ বাতাস সর্ সর্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে ; এবং অন্ধকারস্তূপবৎ গাছের ভিতরে বাহিরে অসংখ্য খদ্যোৎ জ্বলিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই। এমন সময়ে কে ওই পিশাচী নিকটবর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া, চক্ষের নিমেষে একখানা দীর্ঘছুরিকা ফুলসাহেবের বক্ষে অমূল বিদ্ধ করিয়া দিল ? অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথ যেমন্ সেই নরহন্ত্রীকে ধরিতে যাইবে,

সে তেমনি ক্ষিপ্রহস্তে সেই ছুরিখানা নিজের বুকে বসাইয়া দিল। এবং একটা খিল্ খিল্ খিল্ কলহাস্য সুপ্তনিশিথিনীর অন্ধকার নিস্তব্ধ বুক দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া যেন তেমনি একখানা শাণিত ক্ষিপ্র ছুরির ন্যায় তীব্রবেগে খেলিয়া গেল। আমগাছে কোকিল থামিয়া গেল এবং বাতাস যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং আকাশের সমস্ত নক্ষত্র নিদ্রাহীন নির্ণিমেষ নতনেত্রে রাক্ষসী নিশির এই একটা ক্ষুদ্র অভিনয়ের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। প্রলয়ঙ্করী নিশির শোণিতাক্ত মূর্ত্তির সমক্ষে, এবং তাহার শব্দহীন গাম্ভীর্য্যের মধ্যে পড়িয়া এবং তাহার এই দুর্নি-রীক্ষ্য বিভীষিকার মধ্যে পড়িয়া শাসনভীত অপরাধী ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সমগ্র প্রকৃতি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চারিদিক ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

ফুলসাহেবের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল—তখন সেখানে সে লুটাইয়া পড়িল। যাহার ছুরির আঘাত জীবনের সহিত ফুলসাহেবের বন্দীত্ব মোচন করিয়া দিতেছে, অরিন্দম তাহার ভাবভঙ্গীতে চিনিতে পারিলেন, সে সেই মোহিনী।

— মোহিনী নিজের বুকে যে আঘাত করিয়াছিল, বাধাপ্রাপ্ত হই-য়াও তাহা সাঙ্ঘাতিক হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দম তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার হাত হইতে সেই রক্তাক্ত ছুরিখানা কাড়িয়া লইলেন। ফুলসাহেবের রক্তস্রাব কিছুতেই বন্ধ হইল না। সে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আবদ্ধ হস্তে তালি দিতে দিতে, হাসিতে হাসিতে মোহিনী ফুলসাহেবকে বলিল, "কেমন, বিনোদ! আমি কি মিথ্যা কথা বলি? দেখ দেখি, কেমন সুখ। এই না হলে মজা!"

মোহিনী খুব হাসিতে লাগিল।

ফুলসাহেব বলিল, "মোহিনি, তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিলে। অরিন্দমের ফাঁসী-কাঠের অপেক্ষা তোমার ছুরি অনেক ভাল।" তাহার পর অরিন্দমকে ডাকিয়া বলিল, "অরিন্দম, আমি ত এখনই মরিব—তা বলিয়া মনে করিয়ো না, তুমি নিরাপদ হইতে পারিলে। জুমেলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে, সুবিধা পাইলে সে একদিন তোমাকে হত্যা করিবে। সে কোথায় লুকাইয়া আছে, আমি জানি না। জুমেলিয়াকে সাবধান—এখন হইতে তাহার সন্ধান কর—বিশেষতঃ তোমাদের উপর তার বড় রাগ আছে—সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তোমাদের রক্ত দর্শন করিয়া ছাড়িবে*। আমি ত মরিতে বসিয়াছি—এখন বুঝিতে পারিয়াছি,—এত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি—অধর্ম্মের জয় কিছুতেই হইবার নয়।"

অজস্র রক্তস্রাবে ফুলসাহেবের সর্ব্বাঙ্গ শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া আসিল। চক্ষের দীপ্তি ম্লান হইয়া গেল এবং গলায় ঘড়ঘড়ি উঠিল। ফুলসাহেব মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেকক্ষণ অরিন্দমের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; সে দৃষ্টিতে এরূপ বুঝাইল, যেন অরিন্দমকে তাহার আরও কি বলিবার ছিল; বলা হইল না—ফুলসাহেব তখন বাক্‌শক্তি রহিত এবং কণ্ঠাগতপ্রাণ। দুই একবার কথা কহিবার জন্য মুখ খুলিল—কোন কথা বাহির হইল না; একটি অব্যক্ত শব্দ হইল মাত্র; তাহার অনতিবিলম্বে দুর্দ্দান্ত ফুলসাহেব এ সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার সেই সকল ভীষণ কীর্ত্তি-কাহিনী অনেকেরই মনে চিরজাগরূক থাকিবে।

* দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি নারী-পিশাচী জুমেলিয়ার তীব্র প্রতিহিংসার ভীষণ কাহিনী গ্রন্থকারের "মনোরমা" ও "মায়াবিনী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকাশক।

যথেষ্ট রক্তপাতে মোহিনীর মৃত্যুকালও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। রক্ত কিছুতেই বন্ধ হইল না। ফুলসাহেবের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে মোহিনীরও মৃত্যু হইল।

তাহার পর অরিন্দম ফুলসাহেবের জামার পকেট হইতে দুইটি বিষ-কাঁটা ও কয়েকখানি পত্র বাহির করিলেন। পত্রগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়। অরিন্দম পত্রগুলি পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। যোগেন্দ্রনাথও পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করিলেন, "পত্রগুলি প্রয়োজনীয় বটে। এতদিনের পর এ গভীর রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইল।"

ফুলসাহেব ও মোহিনীর মৃতদেহ থানায় চালান দেওয়া হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

* * * * * *

ফুলসাহেব ধরা পড়িল—মরিল। দস্যুরা ধরা পড়িল, এবং তাহাদের সকলেই যথোপযুক্ত দণ্ড পাইল। যখন সকলই হইল, অথচ রেবতীর সন্ধানের কোন বন্দোবস্ত হইল না, তখন অরিন্দমের আশ্বাস বাক্য-গুলিকে দেবেন্দ্রবিজয়ের একান্ত নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় একদিন স্পষ্টই অরিন্দমকে বলিলেন, "সকলই ত হইল, তবে এখন আমি বাড়ি যাই। আর আমাকে আবশ্যক কি?"

রাগের ভাবটা মুখে চোখে খুব শীঘ্র ফুটিয়া উঠে। অরিন্দম মুখ দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "সেকি আরও দিনকতক তোমাকে থাকিতে হইবে। রেবতীর উদ্ধার এখনও হয় নাই।"

দে। সে জন্য কষ্টস্বীকার করা আপনার অনাবশ্যক।

অ। তুমি রাগ করিয়াছ, দেখিতেছি। রাগের কথা নয়, দেবেন বাবু! কেবল রেবতীর উদ্ধার করিলে হইবে না—যাহাতে তাহাকে তাহার বিষয়ৈশ্বর্য্যের সহিত উদ্ধার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। রেবতীর কাকা কি রকম প্রকৃতির লোক, ফুলসাহেবের মুখে শুনিলে ত। তিনিও বড় সহজ নহেন—তিনিও একটি ডিক্সএডিসনের ছোট খাট ফুল সাহেব।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "এখন কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?"

অরি। একবার রেবতীর কাকার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে। রেবতীর সন্ধান করিতে তিনি তোমাকে ডিটেক্টীভের জন্য বলিয়াছিলেন. তুমি এখন আমাকেই সেই ভাল ডিটেক্টীভ বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে। তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহার পর অগোণে আমি নিজের পরিচয় তাহাকে ভাল করিয়াই দিব।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "ওঃ! রেবতীর কাকা কি ভয়ানক লোক, বিষয়ের লোভে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অনায়াসে খুনেদের হাতে তুলে দিলে! পাছে, তার উপর লোকের সন্দেহ হয়, এজন্য আবার ডিটেক্টীভ নিযুক্ত করছে।"

অ। এ সংসারে কত রকমের লোক আছে, দেবেন্দ্রবিজয়। মানুষ চেনা বড় শক্ত কাজ। যে যতটা পরিমাণে মানুষ চিনিতে পারে, সে

ঠিক ততটা পরিমাণে নিরাপদ। তোমার বয়স অল্প, এখনও এ পৃথিবীর সকল সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছায় নাই।

দে। রেবতীর কাকার কথায় বার্ত্তায়, ভাবভঙ্গীতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা আসে বুঝিতে পারি, ফুলসাহেবের মুখে যেমন শুনিলাম, তিনি তেমন ভয়াবহ লোক নহেন। তিনি লোকের সহিত যেরূপ ভাবে কথা কন, যেরূপ ব্যবহার করেন, তাতে পরম শত্রু যে, সেও তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে না।

অ। তাই ত বলছি, তোমার বয়স এখন অনেক কম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার তার কাছে চল, লোকটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, খাদ বাদ দিয়ে তোমার চোখের সাম্‌নে যখন ধর্‌বো, তখন তুমিও জান্‌তে পার্‌বে লোকটি কি দরের লোক। তখন আমাকে বেশি বাক্যব্যয় কর্‌তে হবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধুতার ভাণ।

সেই দিনেই দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া অরিন্দম রেবতীর কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেণীমাধবপুর যাত্রা করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় গোপালচন্দ্রের বাড়ী চিনিতেন। উভয়ে তাঁহার বহির্ব্বাটিতে গিয়া বসিলেন, এবং একজন ভৃত্যকে দিয়া গোপালচন্দ্রের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। গোপালচন্দ্র অন্তঃপুরে ছিলেন; সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন। এবং উভয়কেই মিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে তাঁহার কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

গোপালচন্দ্রের বয়স হইয়াছে—বয়স আটচল্লিশের কম নহে। বর্ণ গৌর। দেহ স্থূল। উদরটি অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপেক্ষা দশগুণ স্থূল; যেন, সকলের সহিত সেটি ঠিক খাপ্ খায় না। মাথার চুল খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, শ্মশ্রুগুম্ফ একেবারে নাই। নাই থাকুক, মাথায় টাক আছে, তাহার পাশেই দীর্ঘ আর্কফলা আছে, গলায় হরিনামের মালা আছে, প্রকাণ্ড ভূঁড়ি আছে, এবং তাহার সেই বিপুল দেহের চারিভিতে ছোট বড় অনেক রকমের হরিনামের ছাপ আছে।

গোপালচন্দ্র অরিন্দমকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি দেবেন্দ্র বাবুর মুখে আমার দুরদৃষ্টের কথা বোধ হয় শুনিয়াছেন। আহা! রেবতী মা আমার, কাকা বলতে অজ্ঞান হইত! আর রোহিণী—সে ত আমার ঘাড়ে পিঠে মানুষ হয়েছে—এক দণ্ড আমার কাছ ছাড়া হইত না। হায় হায়, মানুষের এমন সর্ব্বনাশ হয়! না জানি পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাতকই করেছিলেম, হরি হে রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ।"

অরিন্দম বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার ন্যায় মহাত্ম লোকের এমন বিপদও হয়। দেখি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে যদি আমি মহাশয়ের কোন উপকারে আসিতে পারি। এখন মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একাজে নিযুক্ত করেন।"

গোপালচন্দ্র বলিলেন, "আবার নিযুক্ত কি? আপনাকে সেই জন্যই ত আহ্বান করা হয়েছে।"

অরিন্দম বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনার কার্য্যোদ্ধার করিলে কিরূপ পারিশ্রমিক পাইব, তাহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া একখানি স্বীকার-পত্র লিখিয়া দেন।"

গোপা। ইহার জন্য আবার স্বীকার-পত্র কি; আপনি যাহা চাহি-বেন, আমি আনন্দের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহা দিব। যাতে আপনি সুখী

হন, তা আমি করিব, সে আমার কর্ত্তব্য। জানেন না, মহাশয়, আপনি। যদি সর্ব্বস্ব ক্ষয়াইয়া তাদের দুটিকে পাই, তাতেও আমার বুক দশ হাত হইবে।

অরিন্দম বলিলেন, অবশ্যই মনে মনে, আর তাদের দুটিকে না পেলে উদরটি যে জ্বরেও স্ফীত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন, "একটা লেখাপড়া না থাকিলে কি করিয়া চলিবে? সে জন্য আপনি কিন্তু হইতেছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

গোপা। না—না, কিন্তু হইব কেন, আমি এখনই লিখিয়া দিতেছি, কি লিখিতে হইবে, আর কত টাকা হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, বলুন?

অরি। একশত হইলেই ঠিক হয় না?

গোপা। একশত? আমি আপনাকে পাঁচশত টাকা দিব।

অরিন্দম মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন, "মহাশয়ের হৃদয় যথেষ্ট উদার। যাই হোক, আমি আপনার জন্য আরও উৎসাহের সহিত কাজ করিব।"

গোপা। কি লিখিতে হইবে।

অরি। বেশি কিছু লিখিতে হইবে না। লিখিয়া দিন, আপনার কার্য্যোদ্ধার হইলে আমাকে পাচশত টাকা দিবেন। আর আপনার নামটি সহি করিয়া দিন।

গোপালচন্দ্র সেই মর্ম্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া, নিজের নাম সাক্ষর করিলেন। এবং সেখানি অরিন্দমের হাতে দিলেন।

অরিন্দম "ইহাই যথেষ্ট।" বলিয়া সেখানি অবিলম্বে পকেটস্থ করিলেন। "তবে এখন হইতেই কাজ আরম্ভ করা যাক্। মহাশয়, প্রথমে আপনার বাড়ীখানা আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাই।"

গোপাল চন্দ্র হো হো হো করিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ মন্দীভূত হইতে বলিলেন; "তবেই হয়েছে, আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের দ্বারা আমার যে উপকার হবে, তা আমি দিব্যচক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ বাড়ী অনুসন্ধান করে কি হবে? এ বাড়ী অনুসন্ধান করে তাদের কোন সন্ধানই পাবেন না। তারা কি এতদিন বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে বসে আছে?"

অরিন্দম বলিলেন, "তাদের সন্ধান না পাই, তাদের যাতে সন্ধান কর্‌তে পারি এমন কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সেই জন্য বল্‌ছি; এতে আপনার আপত্তি কি?"

গোপালচন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি আর কি—কিছুই না। তবে বাজে কাজে অনর্থক একটা হ্যাঙ্গাম করা।"

অরিন্দম বলিলেন, "হ্যাঙ্গাম কিছুই নয়। আমি আপনার বাড়ীর সকল ঘর অনুসন্ধান কর্‌তে চাই না, বাড়ীর মেয়েদের না সরালেও চলে, আমি একবার কেবল বাড়ীর চারিদিকটা দেখ্‌তে চাই। এতে আর হ্যাঙ্গাম কি?"

গোপালচন্দ্র বলিলেন, "না এতে আর হ্যাঙ্গাম কি, তবে এ দেখায় যে কি ফল হবে, বুঝ্‌লেম না।"

অরিন্দম বলিলেন, "না, সেটা এখন আপনার বোঝ্‌বার কোন দরকার নাই।"

"তবে আমি একবার বাড়ীর ভিতর হয়ে আসি।" বলিয়া গোপাল চন্দ্র নিজের স্থূল দেহভার বহন করিয়া মন্থরগতিতে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া অরিন্দমকে বলিলেন, "আসুন, মহাশয়।"

সকলে উঠিয়া ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সাধুতার ভাণ।

অন্তঃপুরের পশ্চাদ্ভাগে একটি অনতি বৃহৎ পুষ্করিণী, এবং তাহার চারিধারে নানাবিধ ফলের গাছ। বাহিরের লোকের দৃষ্টি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, এইরূপে সেই স্থানটা চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই পুষ্করিণীটি অন্তপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্যই ব্যবহৃত হইত।

গোপালচন্দ্র ও দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া অরিন্দম এই ছোট খাট বাগানটি বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া অরিন্দম স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে অনেক-গুলি মানকচুর গাছ সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত পত্রে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল। তন্মধ্যে দুই তিনটি গাছ, অন্যান্য গাছগুলিকে ছাড়াইয়া অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। অরিন্দম গোপালচন্দ্রকে বলিলেন, "অন্যান্য গাছগুলির অপেক্ষা এই দুই তিনটি গাছ অধিক তেজাল দেখিতেছি।"

গোপালচন্দ্র বলিলেন. "হাঁ; ঐ গাছগুলির আলাদা জাতের। রাম-সনাতন নামে আমারই একজন প্রজা তার মামার বাড়ী থেকে আমাকে এনে দিয়েছে। চলুন, ঐ দিকটা আপনাকে দেখাইয়া আনি।"

অরিন্দম বলিলেন, "না আমাকে আর কোথায় যাইতে হইবে না। এইখানেই আমার কাজ মিটিবে। একটা কথা হইতেছে, মহাশয়,

আপনার এ মানকচুর গাছগুলি আমাকে বাধ্য হইয়া নষ্ট করিতে হইতেছে ; আপনার কোন আপত্তি আছে ?"

গোপালচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, আপনি বড় মজার লোক।"

বলিতে না বলিতে অরিন্দম দুই তিনটি গাছ টানিয়া তুলিয়া ফেলি-লেন। তেমন বেশি বল-প্রয়োগ করিতে হইল না। গোপালচন্দ্র "করেন কি" "করেন কি" বলিয়া সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন।

অরিন্দম গোপালচন্দ্রের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং একবার "চুপ করুন" বলিয়া তাহার ধৈর্য্যবিধান করিলেন। তাহার পর কটিদেশ হইতে একখানি দীর্ঘফলক ছুরিকা বাহির করিয়া সেইখানটা খনন করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া গোপালচন্দ্রের মুখ শুখাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। এবং তাঁহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। এক পা এক পা করিয়া পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। সেদিকে অরিন্দমের দৃষ্টি ছিল, তিনি বলিলেন, "মহাশয়, পালাবেন না—স্থির হয়ে দাঁড়ান, নতুবা এই দেখিতেছেন, (পিস্তল প্রদর্শন) এক পা সরিলে, গুলি করিয়া পা ভাঙ্গিয়া দিব।"

গোপালচন্দ্র বলিলেন, "না পালাবো, কেন, ভয় এত কিসের ? আপনি পুলিসের লোক হলেও, আপনি আমাদেরই উপকারী বন্ধু।"

অরিন্দম হাসিয়া বলিলেন, "তাত বটেই। (দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি) এই পিস্তলটা তুমি ঠিক করিয়া ধরিয়া থাক, সাবধান, এক পা সরিলে, তৎক্ষণাৎ গুলি করিবে।"

দেবেন্দ্রবিজয় এ অদ্ভুত রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া অরিন্দমের নিকট হইতে পিস্তল গ্রহণ করিলেন।

অরিন্দম ক্রতহস্তে ছুরিকার দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দুই তিনটি মানকচুর গাছ টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে সেই স্থানটা পূর্ব্বেই অনেকটা গভীর হইয়াছিল ; এক্ষণে অল্প পরিশ্রমে অরিন্দম স্বকার্য্য উদ্ধার করিলেন। অনতিবিলম্বে সেখান হইতে তিনি একটি মনুষ্যের বাহুর সম্পূর্ণ কঙ্কাল বাহির করিলেন। অঙ্গুলি হইতে স্কন্ধদেশের সন্ধিস্থল অবধি সেই কঙ্কালে ছিল।

সেই কঙ্কাল দেখিয়া অরিন্দম আনন্দিত হইলেন ; দেবেন্দ্রবিজয় শিহরিয়া উঠিলেন ; এবং গোপালচন্দ্র—তাহার চক্ষে সমুদয় পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া, কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "একি ব্যাপার! এ হাড় এখানে কে আনিল? রাধা মাধব!"

অরিন্দম বলিলেন, "আর কে আনিবে—আপনি আনিয়াছেন। এ কাজ আপনারই। মনে পড়ে না, ফুলসাহেব প্রদত্ত রোহিণীর মৃত্যুর প্রমাণ।"

গোপালচন্দ্র বলিলেন, "সে কি কথা! আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন।"

অরিন্দম বলিলেন, "হাঁ, আমাদের দুজনার মধ্যে একজনা যে খুব মিথ্যাবাদী, তা আপনি যেমন বুঝিতে পারিতেছেন, আমিও তেমনি বুঝিতে পারিতেছি। এখন বাধ্য হইয়া আপনার হাতে আমাকে হাতকড়ি লাগাইতে হইল।"

হাতকড়ির নাম শুনিয়া গোপালচন্দ্র তাহার সুবৃহৎ ভুঁড়ি নাচাইয়া লাফাইয়া উঠিল। অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে ইঙ্গিত করিলেন, দেবেন্দ্রবিজয় গোপালচন্দ্রের হস্তদ্বয় দৃঢ় করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, এবং অরিন্দম হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ-পত্র।

গোপালচন্দ্র অরিন্দমকে বলিল, "আপনি আমারই লোক হইয়া আমারই হাতে হাতকড়ি দিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, "আমি আপনার নহি—তাহার, নহি—আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। যিনি দোষী, তাহার সহিত বাধ্য হইয়া আমাকে এইরূপ অভদ্র ব্যবহার করিতে হয়।"

গোপালচন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "কি প্রমাণে আপনি আমাকে দোষী স্থির করিলেন?"

অরিন্দম, "প্রমাণ আমার নিকটেই আছে!" বলিয়া একখানি পত্র বাহির করিলেন। সেই পত্রখানি গোপালচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া বলি-লেন, "মহাশয়, এ পত্রখানি কার? চিনিতে পারেন কি?"

এই পত্রখানি তিনি ফুলসাহেবের নিকটে পাইয়াছিলেন। সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলে পথিক যেরূপ ভীতিব্যঞ্জক ভঙ্গি করিয়া পশ্চাতে হটিয়া যায়, পত্রখানি দেখিয়া গোপালচন্দ্রের অবস্থা অনেকটা সেই রকমেরই হইল। গোপালচন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল; এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "কখনই না—এ পত্র আমার নয়?"

অরিন্দম বলিলেন, "চুপ করুন, বেশি গোলমাল করিবেন না। এ পত্রখানি কি আপনার হাতের লেখা নয়? আর নীচে যে সহিটি রহিয়াছে, দেখুন দেখি, এই সহিটী আপনার কি না?"

গোপালচন্দ্র বলিল, "না, এ লেখা আমার হাতের নয়—এ সহিও আমার নয়।"

গোপালচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে যে চুক্তিনামা অরিন্দমকে লিখিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তখন সেই চুক্তিনামাখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "এ লেখা ত আপনারি? না, ইহাও আপনার লেখা নয়? দেখুন দেখি, আপনার হাতের লেখার সঙ্গে সহির সঙ্গে বেশ করে সব মিলাইয়া দেখুন দেখি।"

তথাপি গোপালচন্দ্র সেইরূপ ভাবে বলিল, "জাল—জাল—এ পত্র জাল—আপনারা বড় ভয়ানক লোক।"

অরিন্দম মৃদুহাস্তে বলিলেন, "আপনার অপেক্ষা নয়।" তাহার পর বলিলেন, "যে বিষয়ের লোভে পড়িয়া নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হত করিতে পারে, সে মনুষ্য-মূর্ত্তিতে দানব।"

* * * * * * *

যে পত্র অবলম্বন করিয়া অরিন্দম গোপালচন্দ্রকে বন্দী করিলেন, সেই পত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। পত্রখানি এইরূপ ;—

"কেশববাবু,

আজ দুইদিন গত হইল, তোমার কোন সংবাদ পাই নাই। সেজন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি, খুব সাবধান! যত শীঘ্র পার, রেবতী ও রোহিণীকে খুন করিবে। আমাকে খুনের কোন নিদর্শন পাঠাইলেই, আমি তখনই তোমার প্রাপ্য মিটাইয়া দিব। ইতি।

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু

আরও দুই খানি ;—

কেশববাবু,

গোরাচাঁদের মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ। এখন আমি তোমাকে একটি পয়সা দিতে পারিব না—দিতে পারিব না কেন—দিব না—আগে কাজ শেষ হওয়া চাই। আমাকে তুমি সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তোমাকে যে টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপে দিতে স্বীকৃত আছি, তাহা ত তৎক্ষণাৎ দিব; তা ছাড়া তোমাকে আরও কিছু পুরস্কার দিব। তুমি শীঘ্রই রেবতী ও রোহিণীকে খুন করিয়া যত শীঘ্র পার গোরাচাঁদ মারফৎ প্রমাণ পাঠাইবে। তোমার এই অযথা বিলম্বে আমাকে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছে। তুমি একজন পাকা কাজের লোক হয়ে, কাজের কিছুই করিতে পারিতেছ না—বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা করি, তুমি আগামী সপ্তাহের মধ্যে তোমার প্রাপ্য আমার নিকট হইতে অদায় লইবে। ইতি।

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু

কেশববাবু,

তুমি অদ্যাবধি রেবতীর কিছুই করিলে না। পত্রপাঠ মাত্র রেবতীকে খুন করিবে এবং তাহার খুনের একটা প্রমাণ শীঘ্র পাঠাইবে। রোহিণীর লাস থানায় পাঠাইয়া যেমন বাহাদুরী দেখাইতে গিয়াছিলে, রেবতীর লাস লইয়া যেন সে রকমের কোন একটি বাহাদুরী দেখাইতে যাইও না। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। বরং বিপদের সম্ভাবনা। রেবতীর লাস একেবারে গোপন করিয়া ফেলিবে। তুমি রোহিণীকে খুন করিয়া চুক্তির অর্দ্ধেক টাকা পাঠাইতে বলিয়াছ। রোহিণীকে খুন

করায় আমার যদি কাজের অর্দ্ধেক সুবিধা হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে অর্দ্ধেক টাকা পাঠাইতে পারিতাম। রোহিণীকে খুন করিয়া তুমি আমার কিছুই সুবিধা করিতে পার নাই, সুতরাং আমি তোমাকে এখন কিছুই দিব না। রোহিণীর অ্ভাবমানে রেবতীই সমস্ত বিষয়ের মালিক হইবে, ইহাতে রেবতীরই বরং সুবিধা হইয়াছে। আমার তাহাতে লাভ কি? রোহিণীর মৃত্যু সপ্রমাণ করিতে তুমি যে তাহার একখানা হস্ত পাঠাইয়া ছিলে, সেটা আমি আমাদের ভিতর বাটীর বাগানে পুঁতিয়া ফেলিয়াছি। রোহিণীর ন্যায় রেবতীর একখানা হাত পাঠাইলে চলিবে না। রেহিণীর হাতের একস্থানে একটা দগ্ধচিহ্ন ছিল বলিয়া সহজে চিনিতে পারিয়াছিলাম, রেবতীর ছিন্ন মস্তক পাঠাইবে। ইতি।

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।

একান্ত যত্ন সমাদর ও আগ্রহের সহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্রকে আপাততঃ স্থানীয় থানায় চলান দেওয়া হইল।

অধর্ম্মের পরিণাম এইরূপই শোচনীয় হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তুমি কি সেই?

বেণিমাধবপুরের গোলযোগ মিটাইয়া, অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে লইয়া রঘুনাথপুরে যাইলেন। রঘুনাথপুর অরিন্দমের স্বদেশ। বেণিমাধবপুর হইতে হুগ্‌লীজেলায় ফিরিতে হইলে রঘুনাথপুরের নিকট দিয়াই আসিতে হয়। রঘুনাথপুরের মধ্যে অরিন্দম সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তিও আছে। তা ছাড়া তাঁহার বসত-বাটীখানিও প্রকাণ্ড। তেমন প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা সে গ্রামের মধ্যে আর একখানিও নাই। বাটীর পশ্চাদ্ভাগে লতাকুঞ্জবিশোভিত সুরম্য উদ্যান। উদ্যানে মৎস্যসঙ্কুল স্বচ্ছবারিপূর্ণ সুবৃহৎ সরোবর। মোট কথা, একজন সমৃদ্ধি-সম্পন্নের যাহা আবশ্যক, অরিন্দমের তাহা সকলই ছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় সেইখানে দুই দিন কাটাইলেন। খাওয়া-দাওয়ার ধুমটা রীতিমতই চলিল। চোর ডাকাত ধরার ন্যায় অরিন্দমের মাছ-ধরা-সখ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছিপ্ লইয়া বসিয়া মৎস্যকুলধ্বংশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন পূর্ব্বাহ্নে নয়—অপরাহ্নে অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, "তুমি যে কালে দুই দিনেই বাড়ী যাইবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছ, তখন কাল প্রত্যূষেই রহণা করা যাইবে। তাহা হইলে আজ রাত্রের ভোজনের বন্দোবস্তটা পরিপাটী রকমের হওয়াই আবশ্যক।

যেমন করিয়াই হোক আজ খুব কম করিয়া চার পাঁচটি বড় মাছ ধরা চাই। ছিপ লইয়া তুমি বাগানে যাও, চার্ ফেলিয়া ঠিক্ ঠাক্ হইয়া বসো। আমি এখনই যাইতেছি।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আজ আর থাক্ না।"

অরিন্দম বলিলেন, "সে কি হয়, কাল যখন প্রাতে একান্তই রহণা করিতে হইবে, তখন আর না বলিলে চলিবে কেন? তুমি যাও, আমি এখনই যাইতেছি।"

দেবেন্দ্রবিজয় মৎস্য ধরিবার উপকরণাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতে অরিন্দমের একটা উদ্দেশ্য আছে।

* * * * * *

উদ্যানের ছায়াস্নিগ্ধ দীর্ঘ সরোবর পত্রান্তরালচ্যুত সূর্য্যরশ্মিপাতে তক্ তক্ করিতেছে। বায়ুহিল্লোল-বিচলিত বীচিমালা হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে রবিকিরণ সহস্রখণ্ডে প্রতিফলিত হইতেছে। এবং সদ্যোপ্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে সমুদয় উদ্যান ভরিয়া গিয়াছে।

দেবেন্দ্রবিজয় ধীরপাদবিক্ষেপে ঘাটের নিকটে গিয়া দেখিলেন, স্বচ্ছ, কম্পিত জলে পা দুইখানি ডুবাইয়া নিম্নের মগ্নপ্রায় সোপানের উপর বসিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী নবীনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল; অদূরস্থিত এক আমগাছের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত শাখায় বসিয়া একটা সুকণ্ঠ পাপিয়া তাহার বিরহাকুল অশ্রান্ত বেদনা-গীতিতে উদ্যান প্লাবিত করিতেছিল, তাহার নিরলস দৃষ্টি সেই ঝঙ্কৃত পাপিয়ার প্রতি সংস্থাপিত ছিল। সুতরাং সে দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিতে পায় নাই।

দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, সেই মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যরাণীর মেঘের মত নিবিড়, শৈবালের ন্যায় তরঙ্গায়িত, এবং ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ, বিমুক্ত কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া, লুণ্ঠিত এবং

জলসিক্ত হইতেছে। সেরূপভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একান্ত গর্হিত মনে করিয়া দেবেন্দ্রবিজয় যেমন পশ্চাতে ফিরিবেন, একখণ্ড শুষ্ক পত্রের উপর তাঁহার পদক্ষেপ হওয়ায় একটা শব্দ হইল। নবীনা তাড়াতাড়ি সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল—দেখিয়া মুখদিয়া তাহার কথা সরিল না। তাহার ভাব দেখিয়া এমন বোধ হইল, সে উঠিবে—ডুবিবে—কি পলাইবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না।

দেবেন্দ্রবিজয়ও সেই নিরুপমার মুখের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত বিহ্বল এবং স্তম্ভিত। বিস্ময়াকুল দেবেন্দ্রবিজয় ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে বলিলেন, "তুমি—তুমি এখানে!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

ঠিক সেই সময়ে সেখানে অরিন্দম আসিয়া উপস্থিত—বোধ হয় তিনি অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নবীনা দ্রুতপদে সোপানারোহণ করিয়া সলজ্জভাবে চলিয়া গেল, এবং দেবেন্দ্রবিজয় একাকী অপার্থিবের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। অরিন্দম বলিলেন, "চল, এখন আর মাছ ধরা হইবে না—এখনই পাড়ার মেয়েরা এঘাটে আসিবে—সন্ধ্যার পর যাহা হয় হইবে।"

দেবেন্দ্রবিজয়ের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা। তিনি অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে এখন চলিয়া গেল, উহাকে আপনি জানেন কি?"

অরিন্দম বলিলেন, "কেন বল দেখি?"

দেবেন্দ্রবিজয় চুপ করিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, "ঘাটে পাড়ায় কত মেয়ে আসে, আমি তাহাদের কেমন করিয়া চিনিব? তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কাহাকে কাহাকে চিনিতে পারে।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আমি আজ যাহাকে এখানে দেখিলাম সে ঠিক রেবতীর মত দেখিতে। সে রেবতী।"

অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটে? তাহা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন. "নাম জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি ঠিক চিনিয়াছি—সে রেবতী। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ভাব, সেই সব—আমার কখনও ভুল হয় নাই।"

অরিন্দম সহাস্যে বলিলেন, "নিজের ভুল নিজে কেহই দেখিতে পায় না। বিশেষতঃ এসব বিষয়ে ভুল হওয়া বড়ই দোষের কথা। যাই হোক, তোমাকে কোথায় মাছ ধরিতে এখানে পাঠাইলাম, আর তুমি কিনা একেবারে আস্ত মেয়েমানুষ একটা গাঁথিয়া ফেলিয়াছ। বাহাদুরী আছে বটে।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "আপনি সকলই জানেন, আপনি আমার নিকট গোপন করিতেছেন। আমি এখন যাহাকে দেখিলাম, বলুন, সে রেবতী কি না?"

অরিন্দম বলিলেন. "রেবতী। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, যেমন করিয়া পারি রেবতীকে সন্ধান করিয়া দিব। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বেই আমি রেবতীর উদ্ধার করিয়াছিলাম। একজন পুলিসের লোককে রেবতীর মাতামহ সাজাইয়া রেবতীকে অর্থপিশাচ যদুনাথের হাত হইতে বাহির করিয়া আনি। তাহার পর রেবতীকে আমি এখানে পাঠাইয়া দিই। সেই অবধি রেবতী এখানে আমাদের বাড়ীতেই আছে। প্রত্যহ রেবতী এই সময়ে বাগানে একা আসিয়া থাকে। তাহার সহিত দেখা হইবে বলিয়াই আমি তোমাকে মাছ ধরিবার ছলে বাগানে পাঠাইয়া দিই। তুমি এখন রেবতীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ—আর ত সন্দেহের কোন কারণ নাই?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "যে দিন ফুলসাহেব ধরা পড়ে, সেই দিন আপনি রেবতীকে না খুন করিবার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়. ফুলসাহেব আপনাকে বলিয়াছি। 'তুমি আমার মুখের অন্ন কাড়িয়া

লইয়াছ।' তখনই একবার আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, রেবতীকে আপনি কোন নিরাপদস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

অরিন্দম ব[illegible], [illegible] হোক, রেবতীর নিকটে এখন তাহার ভগ্নীর খুনের কথা [illegible]শ করিবার আবশ্যকতা নাই। যতদিন গোপন থা[illegible] ভাল। রেবতীর মনের অবস্থা এখন ভাল নহে, বড় ভয়ানক এবং দুশ্চিন্তায় [illegible]রীরও একান্ত দুর্ব্বল। এ সময়ে কোন একটা শোকের আঘাত লাগিলে হয় ত তাহার ফল পরে শোচনীয় হইতে পারে। বিশেষতঃ রেবত রোহিণী-গত প্রাণ। তাহার কাকার সম্বন্ধেও এখন তাহাকে কোন কথা [illegible] ভাল। আরও একটা কথা হইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু! আ[illegible] [illegible]নজের মেয়ের ন্যায় স্নেহ করি, রেবতীর বিবাহে আমিই কন্যা[illegible] হইবার আশা রাখি।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "সেটা আপনার অনুগ্রহ।"

উপসংহার।

একটা শুভদিন স্থির করিয়া, অরিন্দম কোমর বাঁধিয়া রেবতীর বিবাহে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ভবানীপুর হইতে দেবেন্দ্রবিজয়ের পিতাকে আনাইলেন।

দেবেন্দ্রবিজয়ের মাতুল মহাশয় বেণিমাধবপুরেই ছিলেন। বেণিমাধবপুরেই দেবেন্দ্রবিজয়ের সহিত রেবতীর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

দেবেন্দ্রবিজয়ের বিবাহ এবং নিজে অরিন্দম সে . . . . গী। নিমন্ত্রিত সীরাজউদ্দীন দেবেন্দ্রবিজয়কে এবং কুলসম রেবতীকে এক একটি মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী যৌতুক দিয়াছিলেন।

গোপালচন্দ্র এবং ধৃত গোরাচাঁদ ও দস্যুরা আইনানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ড পাইল।

আপাততঃ জুমেলিয়ার কোন সন্ধান হইল না।

সমাপ্ত।